الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল

মাসিক আলকাউসার-এ 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে প্রকাশিত
[মহররম '২৬হি.-মহররম '৩৩হি.= ফেব্রু. '০৫-ডিসে. '১১ঈ.]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

www.eelm.weebly.com

পেশ লফয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، أَمَّا بَعْدُ

কুরআন হাকীমে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝

'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না। জেনে রেখো, কান চোখ ও অন্তর–এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞাসা করা হবে।' –সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, সে যা-ই শোনে তাই বর্ণনা করে।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩০

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে এই মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন যে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত-দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন হয় ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' –মুআত্তা মালেক, হাদীস ৩৪৩৪, সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৮, ৬০১৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৭

এখন আমাদের মসিবত হল, আমাদের অনেকে বলা ও লেখাকে তো মনে হয় 'ফরয' মনে করেন, কিন্তু কী বলবেন, কী লিখবেন, কী বলা উচিত নয় বা কী বলা সঙ্গত নয়–এর তাহকীককে যেন 'খেলাফে আওলা' বা অনুত্তম মনে করেন। এই অবহেলার দরুণ সমাজে এখন বিভিন্ন মুনকার ও ভিত্তিহীন কথা

www.eelm.weebly.com

প্রচলিত হয়ে গেছে। এসব কথা যদি হয় দ্বীনের বিষয়ে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা হলে তো তা অনেক বড় গোনাহের কারণ।

সাধারণ মানুষ যেন এ ধরনের বিষয়ে আরও জড়িয়ে না পড়েন, সমাজে এ ধরনের ভুলের আরও প্রচলন যেন না ঘটে, যাদের মাঝে এসব ভুলের প্রচলন হয়ে গেছে, তারা যেন নিজেদের জানা বিষয়গুলো শুধরে নিতে পারে–এ উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরাম নিজেদের যুগের প্রচলিত অথচ প্রমাণিত নয় এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করে আসছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন শিরোনামে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. (৭৯৪হি.) এ বিষয়ে তাজুদ্দীন ফাযারী রহ.এর 'ফিকহুল আওয়াম ওয়া-ইনকারু উমূরিন ইশ্‌তাহারাত বাইনাল আনাম' (فِقْهُ الْعَوَامِّ وَإِنْكَارُ أُمُوْرٍ اشْتَهَرَتْ بَيْنَ الأَنَامِ) কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের যুগে হযরত থানভী রহ.-এর 'আগলাতুল আওয়াম' (أَغْلَاطُ الْعَوَامِّ) তো বেশ প্রসিদ্ধ ও সহজলভ্য, যা নিম্নোক্ত প্রবাদের প্রতিচ্ছবি–

بقامت کمتر بقیمت بہتر

কলেবরে ক্ষুদ্র, কিন্তু মূল্যের বিচারে অমূল্য।[১]

মশোয়ারা মোতাবেক মাসিক আলকাউসারে এ বিষয়ে একটি বিভাগ খোলা হয় এবং প্রতি মাসেই সাধ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অল্পবিস্তর কিছু লেখার চেষ্টা করা হয়। আলকাউসারের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১১ঈ. পর্যন্ত এ বিভাগে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে পাঠকবর্গের অনুরোধে আজ থেকে তিন বছর আগে তা কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৫ঈ. থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ঈ. পর্যন্ত আযীযে মুকাররম বেরাদরম মাওলানা যুবায়ের হোসাইনের এবং মার্চ ২০১০ঈ. থেকে সেপ্টেম্বর ২০১১ঈ. পর্যন্ত বেরাদারে

---

[১] وَأَخْطَرُ مِنْ أَغْلَاطِ الْعَوَامِّ أَغْلَاطُ الْخَوَاصِّ، فَإِنَّ الْخَوَاصَّ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَلِذَا كَانَ الْاِحْتِيَاطُ عَلَيْهِمْ أَوْجَبَ، وَالتَّثَبُّتُ فِي أُمُوْرِ الدِّيْنِ يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلٰكِنَّ التَّسَاهُلَ قَدْ سَرٰى إِلٰى كَثِيْرٍ مِنْهُمْ، فَلَيْتَهُمْ اتَّرَجُرُوْا، وَلَعَلَّ بَعْضَ الْأَفَاضِلِ الْأَكَابِرِ يُصَنِّفُ فِيْ أَغْلَاطِ خَوَاصِّ هٰذِهِ الْبِلَادِ وَهٰذِهِ الدِّيَارِ، كَمَا صَنَّفَ مَنْ سَبَقَنَا فِيْ ذٰلِكَ أَيْضًا، وَاللهُ تَعَالٰى هُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

www.eelm.weebly.com

আযীয মাওলানা ত্বহা হোসাইন দানেশের লেখা। বাকি অংশ আল্লাহর ফযল ও করমে এই অধমের। আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাদের দু'জনের লেখাগুলোও আমার নযরে সানির পর প্রকাশিত হত। সংকলনটি প্রথমবার প্রকাশের আগে মাওলানা ফযলুল বারী এতে নযরে সানি করেন। এরপর মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ যীদা মাজদুহুমও দেখে দেন। এখন নতুন মুদ্রণের আগে মাওলানা মুতীউর রহমান যীদা মাজদুহুম ও মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ তা আবার দেখেন। এ সংস্করণে কিছু জায়গায় প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জনও করা হয়েছে। আল্লাহ এ কিতাবের উপকারিতা ও মকবুলিয়াত আগের চেয়ে আরও বাড়িয়ে দিন, আমীন!

সফর ১৪৩৩ হিজরী থেকে এ বিভাগে যে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তা এ পুস্তিকায় শামিল করা হয়নি। এ ধারার দ্বিতীয় কিতাবটিতে তা শামিল করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ, যাতে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বিষয়গুলো জানার জন্য পাঠকদেরকে একই কিতাব দ্বিতীয়বার সংগ্রহ করতে না হয়।

পাঠকবর্গের নিকট দুআর দরখাস্ত, আল্লাহ তাআলা যেন সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও মারকাযুদ দাওয়াহকে কবুল করেন। মারকাযুদ দাওয়াহর সকল বিভাগ বিশেষভাবে রচনা বিভাগ ও প্রকাশনা বিভাগকে কবুল ও মকবুল করেন। আমাদের সকল কাজ ইখলাসের শক্তিতে শক্তিশালী করেন এবং সুন্নতের আলোয় আলোকিত করেন। আমীন!

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুত তাসনীফ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
১ রবিউস সানি ১৪৩৭হি. মঙ্গলবার

www.eelm.weebly.com

সংখ্যাভিত্তিক সূচি

ভুল বিশ্বাস : দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি
বাকিতে না করা, ফেরতও না নেওয়া/৩১
হাদীস নয় : দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর/৩২
ভুল উচ্চারণ : 'আকামত' 'মুসওয়াদ্দা' 'আল-বিসমিল্লাহ'/৩৩
ভুল ঘটনা : জাবের রা.এর দুই শিশু ছেলের
বকরি জবাই খেলা/৩৩
ভুল বিশ্বাস : বিনা ওযুতে আব্দুল কাদের
জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নেওয়া/৩৪
হাদীস নয় : যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান/৩৫
ভুল ঘটনা : হযরত হাসান-হোসাইন রা.-এর
ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি/৩৫
ভুল উচ্চারণ : আহমেদ/আহাম্মদ/৩৬
খাইরুল/শফীকুল/৩৭
ভুল নাম : নবীউল্লাহ/৩৭
রাসূল মিয়া/৩৭
সালামের কয়েকটি ভুল/৩৭
বলার ভুল : মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া/৩৯
ভুল প্রবাদ : মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?/৩৯
বোরাকুন নবী : একটি কাল্পনিক ছবি/৩৯
একটা মারাত্মক জাল হাদীস : আমি 'মীম' বিহীন আহমাদ
এবং 'আইন'বিহীন আরব/৪০
নামের ভুল : মুরসালীন/মুত্তাকীন/৪১
একটি নামের ভুল ব্যবহার : আব্দুল/৪১
সালাম দেওয়ার একটা ভুল পদ্ধতি/৪১
ভুল ঘটনা : হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর
বাঘের আকৃতি ধারণ/৪২
ভুল প্রচলন : জানাযার নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি

www.eelm.weebly.com

'ভালো ছিলেন' এ কথার স্বীকৃতি নেওয়া/৪২
সুন্নত : আযানের পর দরূদ ও দুআ পাঠ করা/৪৩
বিদআত : আযান শুরুর আগে 'আস্‌সালাতু ...' ইত্যাদি পড়া/৪৩
হাদীস নয় : ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে/৪৩
ইন্‌শা আল্লাহ/আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌/৪৪
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা/৪৪
গাড়িতে আরোহণের দুআ/৪৫
সুন্নত : দরূদ পড়া/৪৫
বিদআত : অঙ্গুলি চুমু খেয়ে চোখে মোছা/৪৫
একটি ঈমান বিধ্বংসী বাতিল আকীদা :
মেরাজের নব্বই হাজার কালাম/৪৬
ভুল বিশ্বাস : রাতের বেলায় ঝুটা পানি
বাইরে ফেলা কি অলক্ষুণে?/৪৭
অসত্য ঘটনা : 'ফাতেমার জারি'/৪৮
ভুল কথা : তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে/৪৯
ভুল আমল : ইমামকে রুকুতে পেলে তাকবীর বলে
হাত বেঁধে কি দাঁড়াতে হয়?/৪৯
সুন্নত : সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা/৫০
বিদআত : সাক্ষাতে কদমবুসি করা বা সালামের ইশারা করা/৫০
হাদীস নয় : প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী/৫০
ভুল ঘটনা : আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর
রূহ ফিরিয়ে দেওয়া/৫১
ভুল আমল : ইমামকে সেজদায় পেলে
নিজে নিজে রুকু-সেজদা করা/৫১
একটি অবহেলা : জুমার নামাযের পর চার রাকাত
সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় না করা/৫২
সুন্নত : সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা/৫২
বিদআত : জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা/৫২
একটি অমার্জিত আচরণ : ... /৫৩
হাদীস নয় : আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সওয়াব/৫৩
ভুল বিশ্বাস : পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরিক হওয়া/৫৪
ভুল ঘটনা : রাবেয়া বসরীর জাহান্নামের আগুন নেভানো/৫৪
ভুল কথা : আল্লাহর সহ্য হবে না/৫৫
সুন্নত : বিয়ের পর ওলীমা করা/৫৫

www.eelm.weebly.com

বিদআত : মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক
মেহমানদারিতে বাধ্য করা/৫৫
হাদীস নয় : মসজিদে (দুনিয়াবি) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে
খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে/৫৬
ভুল বিশ্বাস : পৃথিবী ষাঁড়ের শিংয়ের ওপর বিদ্যমান/৫৬
ভুল প্রচলন : কবরের প্রথম কোপের মাটিকে
কবরের নিশানা হিসাবে ব্যবহার করা/৫৭
নামের উচ্চারণের ভুল : হেল্লাল/বেল্লাল/৫৭
হাদীস নয় : আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে/৫৭
ভুল আমল : গোসল শেষে ওযু করা/৫৯
ভুল প্রথা : স্বামী মারা গেলে স্বামীর গোসলের সঙ্গে
স্ত্রীকে গোসল করানো/৫৯
একটি অমার্জনীয় আচরণ : বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা/৫৯
সুন্নত : মৃত ব্যক্তির গোনাহমাফি, কবরে শান্তি
ইত্যাদির জন্য দুআ করা/৬০
বিদআত : কবরের পাশে লোক দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করানো/৬০
ভুল কথা : সব ধরনের দ্বীনি শিক্ষাকে হাফেযি পড়া বলা/৬০
হাদীস নয় : আযানের সময় কথা বললে
ঈমান যাওয়ার আশংকা/৬১
ভুল প্রচলন : ওকিল বাবা/৬১
জুমার নামাযের নিয়ত/৬২
ভুল মাসআলা : নামাযে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি
নড়লে কি নামায ভেঙে যায়?/৬৩
ভুল বিশ্বাস : কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির
মুরগি/হাঁস কুরবানী দেওয়া/৬৩
ভুল ধারণা : পশু জবাইয়ের সময় কুরবানীদাতাদের
নাম পড়া কি জরুরি?/৬৪
হাদীস নয় : প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ পালন/৬৪
ধর্মের বাপ/ভাই/৬৪
সুন্নত : মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে
অতিক্রমের সময় সালাম দেওয়া/৬৫
বিদআত : কবর অতিক্রম করার সময়
হাতে চুমু খাওয়া ইত্যাদি/৬৫
হাদীস নয় : আহারের শুরু ও শেষ লবন দিয়ে করা।
কারণ লবন সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা পাগলামি, কুষ্ঠ, শ্বেত.../৬৬

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা : ইসলামের ফরয কি সর্বমোট ১৩০টি?/৬৬
ভুল মাসআলা : হাঁটুর কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙে যাবে/৬৭
ভুল প্রচলন : দস্তরখান 'লাল রঙ' হওয়া কি সুন্নত?/৬৭
সুন্নত : পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া/৬৮
হাদীস নয় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন/৬৮
ভুল রীতি : সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা/৬৮
ভুল ধারণা : রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া বা আয়না দেখা কি অশুভ?/৬৯
ভুল নিয়ম : পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করা/৬৯
একটা প্রচলিত মারাত্মক গোনাহ : মামি, চাচি ও
সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে পর্দা না করা/৬৯
হাদীস নয় : উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন.../৭০
ভুল ধারণা : একসঙ্গে মুনাজাত শুরু এবং শেষ করা/৭১
ভুল প্রথা : অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া/৭২
সালামে 'ভিআইপি নিয়ম' চালু না হওয়া উচিত/৭৩
ভুল পদ্ধতি : সালাম দেওয়ার সময় মাথা ও সিনা ঝুঁকিয়ে দেওয়া/৭৩
হাদীস নয় : মদীনা মক্কা থেকে উত্তম/৭৩
ছাতায় অমঙ্গলের বিশ্বাস একটা ভিত্তিহীন কল্পনা/৭৩
একটা শিরকি আমল : ভারী বস্তু ওঠাতে ইয়া আলী বলা/৭৪
আরেকটা শিরকি আমল : ইয়া গাউসুল আযম!/৭৫
হাদীস নয় : সমস্যায় পড়লে কবরবাসীর সাহায্য প্রার্থনা কর/৭৬
উচ্চারণের ভুল : মুনকার-নাকীর/৭৭
ভুল ধারণা : কিরামান-কাতিবীন/৭৭
ভুল পন্থা : নামাযে যেখান থেকে ইচ্ছা কাতার করা/৭৭
আরও একটা ভুল : সামনের কাতার খালি রেখে দাঁড়ানো/৭৮
একটা বাহানা বা একটা ভুল ধারণা : নামাযে মিলেমিলে দাঁড়ানো/৭৮
হাদীস নয় : দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়, যদিও সে কাফের হয়/৭৯
ভুল বিশ্বাস : মৃত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়ায় ঘুরে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়/৭৯
ভুল মাসআলা : মাসবুক মুসল্লির ইমামের সঙ্গে
স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া/৮০
ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত ও ভুল উদ্ধৃতি : শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির
নামায সম্পর্কে মকসুদুল মুমিনীন-এর ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসমূহ /৮১
ভুল ভাবনা : রোযা কি অনাহার যাপন?/৮২
আরেকটা ভুল ভাবনা : ঈদ বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের
মতোই কি রেওয়াজি অনুষ্ঠান?/৮৩

www.eelm.weebly.com

ভুল আমল : জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়া/৮৩
ভুল ধারণা : তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না/৮৪
হাদীস নয় : প্রতিদিনের তারাবীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত/৮৪
শবে কদরের নামায পড়ার নিয়ম/৮৫
কথা বলার একটা ভয়ানক ভুল, যা আকীদা-বিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে
'এখন বাচ্চা নেব না' 'কয়েক বছর পর বাচ্চা নেব'/৮৫
২৯ দিনে মাস হলে কি এক রোযা কম হয়?/৮৭
প্রসিদ্ধ নামসমূহে প্রচলিত কিছু ভুল : হোসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজ
মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব.../৮৭
ভুল বিশ্বাস : বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটা
কি আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল?/৮৮
ভুল ধারণা : আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'এর জবাবে কী বলবে?/৮৯
হাদীস নয় : আল্লাহ্র নিকট বেলালের 'সীন' উচ্চারণ 'শীন' ধর্তব্য/৯০
একটা ভয়াবহ ভুল : কুরবানীর ঈদ কি জবাইয়ের উৎসব?/৯০
ভুল কাজ : দুআর মধ্যেও কি মুকাব্বিরের প্রয়োজন?/৯৩
ভুল ধারণা : ইজতেমার দিনগুলোতে কি রোযা রাখা মুস্তাহাব?/৯৪
ভুল ধারণা : মনগড়াভাবে কোন মসজিদকে বিশেষ
ফযীলতের মসজিদ মনে করা/৯৫
একটা ভুল কর্মপদ্ধতি : হিসনে হাসীন কি খতম বা
ওযীফা আকারে পড়ার কিতাব?/৯৬
ভুল নাম : 'আলহাজ্জুল আকবার' কি জুমার দিনের হজের নাম?/৯৭
হাদীস নয় : কবরকে সম্বোধন এবং কবরের উত্তর/৯৭
ভুল ধারণা : মৃতের বাড়িতে কি আগুন জ্বালানো নিষেধ?/৯৮
একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা : হাজী ও আলহাজ/৯৯
ভুল মাসআলা : জুমার নামায কি খোলা ময়দানে সহীহ হয় না?/১০০
হাদীস নয় : দ্বীন ও সিয়াসত দুই সহোদর/১০০
একটা ভয়াবহ চিন্তাগত ভুল : সংস্কৃতি সম্পর্কে কি
ইসলামের কোন নির্দেশনা নেই?/১০১
একটা ভিত্তিহীন ধারণা : চাশতের নামায ছুটে গেলে কি
মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?/১০৩
ভুল মাসআলা : বিনা ওযুতে দরূদ পড়া কি জায়েয নয়?/১০৪
চিন্তাগত ভুল : আদব ও নফল বিষয়াদির জ্ঞানচর্চাও কি নফল?/১০৪
ভুল আমল : জায়নামাযের দুআ/১০৫
ইতিহাসের ভুল : হাসান বসরী রহ. কি সাহাবী ছিলেন?/১০৬

www.eelm.weebly.com

ভুল মাসআলা : মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা/১০৭
ভুল বিশ্বাস : মেরাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?/১০৭
কুসংস্কার : রাতে সুই বিক্রি করা কি অশুভ?/১০৭
একটা অবিশ্বাস্য ভুল মাসআলা : স্বামীর নাম মুখে নিলে কি
স্ত্রী তালাক হয়ে যায়?/১০৮
হাদীস নয় : ওযুতে কি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআ রয়েছে?/১০৯
ভুল ধারণা : সন্তান মারা গেলে মা আসরের পর খেতে পারেন না/১০৯
ভুল মাসআলা : রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি সাহরি খাওয়া অপরিহার্য?/১১০
ভুল ধারণা : ২৭-এর রাতই কি শবে কদর?/১১০
ইতিহাসবিষয়ক একটা ভুল : ফেরাউন কোথায় নিমজ্জিত হয়েছিল?/১১১
ভুল চিন্তা : হজ কি একটি বৈশ্বিক সম্মেলন মাত্র?/১১২
ভুল মাসআলা : খুতবার শুরুতে কি
আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/১১৩
ভুল ধারণা : ইফতারের ওয়াক্ত কি আযান শুরু হওয়ার পর হয়?/১১৪
হাদীস নয় : চল্লিশ বছরের আমল বিনষ্ট হবে/১১৪
ভুল ধারণা : মিনার তিনটি 'জামরা' কি তিন শয়তান?/১১৫
ভুল প্রচলন : তওয়াফের সাত চক্করের জন্য কি
আলাদা আলাদা দুআ রয়েছে?/১১৭
একটা ভিত্তিহীন রসম : আখেরি চাহার শোম্বা কি উদযাপনের দিবস?/১১৮
ভুল মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় কি চাদর বা লেপ দ্বারা
পা আবৃত করা যায় না?/১২২
ভুল ধারণা : মায়ের মীরাসে কন্যা কি পুত্রের সমান বা দ্বিগুণ পাবে?/১২৩
একটা জাহেলি রসম : বোন তার অংশ গ্রহণ করলে
পিত্রালয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ/১২৩
একটা ঘৃণ্য মানসিকতা : পুত্র হলে মিঠাই বিতরণ, কন্যা হলে.../১২৪
ভুল চিন্তা : ইসলামে কি কোন সংস্কৃতি নেই?/১২৫
ভুল রসম : ফাতেহায়ে ইয়াযদহম-এর কোন শরয়ী ভিত্তি আছে কি?/১২৬
এটা কি হাদীস ? সালাম দিলে নব্বই নেকি আর জবাব দিলে দশ নেকি/১২৮
একটা চরম ভ্রান্তি : সুফীবাদই কি প্রকৃত ইসলাম?/১২৮
এটা কি হাদীস? 'আসসালাতু মিরাজুল মুমিনীন'/১৩০
ওভাবে নয় এভাবে বলুন/১৩০
ভুল ধারণা : ঈদের জন্য কি সবকিছুই নতুন হওয়া মাসনুন?/১৩১
এটা কি হাদীস? দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার.../১৩২
ভুল চিন্তা : ওযরের হালতে কি মাসআলা নেই?/১৩৩
ভুল মাসআলা : সফরের হালতে কি রোযা ভাঙার

www.eelm.weebly.com

অনুমতি আছে, না না-রাখার?/১৩৪
ভুল ধারণা : খতম কি ইমাম সাহেবের মাধ্যমে বখশানো জরুরি?/১৩৪
হাদীস নয় : মৃতকে কেন্দ্র করে যে খাবার খাওয়ানো
হয় তা অন্তর মেরে ফেলে/১৩৫
মিনার জামারাগুলো কি স্মারক বা ভাস্কর্য?/১৩৬
ভুল মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় কি মীকাতের
সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়?/১৩৭
হাদীস নয় : আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক নওশেরওঁয়ার যুগে/১৩৭
ভুল ধারণা : হজে কি মহিলাদের পর্দা করতে হয় না?/১৩৮
ভুল কাজ : মাঝে অনেক ফাঁকা রেখে ইক্তেদা করা/১৩৮
ভুল ধারণা : হারাম শরীফে একটি গোনাহও কি লক্ষ গোনাহের সমান?/১৩৯
হাদীস নয় : আশুরার দিন কেয়ামত হওয়া প্রসঙ্গে/১৪০
ভ্রান্ত বিশ্বাস : শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বা মুঈনুদ্দীন
চিশতী রহ.-এরও কি আসমায়ে হুসনা রয়েছে?/১৪০
ভুল মাসআলা : দাড়ি লম্বা করার শরয়ী বিধান/১৪১
ভুল ধারণা : ৭৮৬ কি বিসমিল্লাহ-এর বিকল্প?/১৪২
ভুল ধারণা : ফাতেহা কি কিরাত নয়?/১৪২
ভুল ধারণা : দুআয়ে কুনূত কি শুধু আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা...?/১৪৪
হাদীস নয় : শায়েখের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই
যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে/১৪৪
ইতিহাসবিষয়ক ভুল : আবু জাহেল কি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল?/১৪৫
ভুল ধারণা : খাজা আবদুল্লাহ কি ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন?/১৪৬
ভুল মাসআলা : মাকরূহ ওয়াক্তে কি যিকির-তেলাওয়াত মাকরূহ?/১৪৬
ভুল নিয়ম : চার রাকাতের সময় না থাকলে দুই রাকাতও না-পড়া/১৪৬
হাদীস নয় : আবু বকর সিদ্দীক রা. কি মিলাদ দিতেন?/১৪৭
আরবী ব্যাকরণগত ভুল/১৪৮
তাফসীরবিষয়ক একটা ভুল : 'আবাবীল' কি কোন বিশেষ পাখির নাম?/১৪৯
নামের ভুল উচ্চারণ : চান্দ্র পঞ্চম মাসের নামের সঠিক উচ্চারণ কী?/১৪৯
এটা হাদীস নয়, কোন হাদীসের বক্তব্যও নয় : হাদীসে কি ফুল
কেনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে?/১৪৯
অবচেতনে ভুল চিন্তা : দেশের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে
আপনজনকে পর মনে করা/১৫০
তরজমার ভুল : إن أولياؤه إلا المتقون এর অর্থ কী?/১৫১
একটা ভিত্তিহীন রসম বা ভিত্তিহীন বর্ণনা : আসরের পর কিছু

www.eelm.weebly.com

খাওয়া কি অনুত্তম?/১৫২
ভুল প্রচলন : বিয়ের ইজাব-কবুলের পর সালাম-মুসাফাহা কি সুন্নত?/১৫২
ভুল মাসআলা : বিধবার অন্যত্র বিয়ে হলে সে কি আগের
স্বামীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়?/১৫৩
এটা হাদীসের দুআ নয় : মুনাজাতে মকবুলে উদ্ধৃত
'দুআয়ে ইবরাহীম' হাদীসের দুআ নয়/১৫৪
মেরাজবিষয়ক আলোচনা : কিছু অসতর্কতা/১৫৪
একটা অন্যায় কাজ : 'বিসমিল্লাহ্' ও 'দরূদ' অশুদ্ধ বা
অসম্পূর্ণ বলা ও লেখা/১৫৫
একটা অলীক 'কাহিনী' : 'দুআয়ে কদ্‌হ' সম্পর্কিত
বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই/১৫৭
ভুল কাজ : জানাযার প্রতি তাকবীরে আকাশের দিকে চোখ ওঠানো/১৫৭
একটা চিন্তাগত দুর্বলতা : রমযানুল মুবারকের সমাপ্তিতে
আনন্দিত হওয়ার কারণ/১৫৮
হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুলের সাত মনযিল/১৫৮
হরম ও মসজিদে হরম কি এক?/১৬০
ইহরামের চাদরকেই ইহরাম মনে করা/১৬১
হিযবুল বাহ্‌র মা'সূর দুআ নয়/১৬৩
একটা উদাসীনতা : হিজরী বর্ষ ও চান্দ্রমাসের
তারিখ ব্যবহারে উদাসীনতা/১৬৩
ভুল মাসআলা : শিশুর জন্য কি তার বোনের দুধ পান করা নিষেধ?/১৬৪
ভুল ধারণা : মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জরুরি মনে করা/১৬৫
হাদীস নয় : জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও/১৬৬
ভুল ধারণা : শাহজালাল রহ. ও শাহজালালের মাযার কি এক বিষয়?/১৬৭
ভুল চিন্তা : ইসলাহে নফস এবং যিকির ও ওযীফা কি
শুধু বাইয়াত হওয়া মুরীদের কাজ?/১৬৮
একটা আশ্চর্য অপবাদ : কাফের মারা গেলে কি
'ফী নারি জাহান্নামা' বলতে হয়?/১৬৯
একটা কুসংস্কার : বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে/১৬৯
ভুল ধারণা : চাশতের নামায কি আট রাকাতই পড়তে হবে?/১৭০
হাদীস নয় : যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর
আর যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও.../১৭১
একটা নতুন রসম : প্রবল বৃষ্টি বন্ধের জন্য আযান/১৭২
হাদীস নয় : মকতবে ঈসা আ.-এর আলিফ, বা...

www.eelm.weebly.com

ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া/১৭৩
ভুল শব্দ : অকাল মৃত্যু/১৭৪
একটা ভুল শ্লোগান : ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার/১৭৫
ভুল ধারণা : ইস্তেখারার জন্য কি ঘুমাতে হয়?/১৭৬
হাদীস নয় : আঠারো হাজার মাখলুকাত/১৭৭
ভুল মাসআলা : রিকশা বা যানবাহনে বসে কুরআন
তেলাওয়াত করা কি নিষেধ?/১৭৮
দুটো বিদআত : লাইলাতুর রাগাইব ও শবে ইস্তেফ্তাহ পালন/১৭৯
একটা বদ রসম : প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন/১৮০
ভুল মাসআলা : বছরের শুরু-শেষের মধ্যে
সম্পদের সর্বনিম্ন পরিমাণের যাকাত দেওয়া/১৮১
ভুল ধারণা : বিধর্মীদের 'ইয়াদাত' ও তাদের
সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে কি না?/১৮২
ভুল বিশ্বাস : আলোচনা চলাকালে উপস্থিত হলে কি হায়াত দীর্ঘ হয়/১৮২
হাদীস নয় : মাদরাসা রাসূলের ঘর/১৮৩
একটা রসম : দিনের প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানানো/১৮৩
একটি শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ : 'রূহ' বা 'বিদেহী আত্মা'র
মাগফেরাত কামনা/১৮৫
ভুল কথা : বিয়েতে 'কালেমা' পড়ানো/১৮৫
নামাযের কয়েকটি ভুল : নামাযে মনে মনে কুরআন পড়া/১৮৬
তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা/১৮৭
আমীন মনে মনে বলা/১৮৭
ভুল কথা : কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম/১৮৮
ভুল চিন্তা : তাওবা করলে বা করালে কি মওত এসে যায়?/১৮৯
ভুল কথা : হাঁচি এল মানে কেউ স্মরণ করছে/১৯০
ঈমানবিধ্বংসী বানোয়াট কিসসা : আল্লাহ তাআলার নাকি
একবার মানুষের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হল.../১৯০
হাদীস নয় : নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হয়/১৯১
ভুল মাসআলা : দাফনের আগে ঈসালে সওয়াব ও
দুআ-ইস্তেগফার নিষেধ/১৯১
ভুল কথা : হাত চুলকালে টাকা আসে/১৯২
ভুল ঘটনা : হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের দিন
কা'বা শরীফে আযান শুরু/১৯২
হাদীস নয় : যে ব্যক্তি ইল্ম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তাআলা

www.eelm.weebly.com

তাকে না জানা বিষয়ের ইল্‌ম দান করেন/১৯৩
একটা রসম : ফাতেহায়ে ইয়াযদহম পালন/১৯৪
ভুল পদ্ধতি : নামাযে তাকবীরে তাহরীমা না বলে
রুকুতে চলে যাওয়া/১৯৫
হাদীস নয় : আযানের জবাবে পুরুষ পাবে এক লক্ষ নেকি
মহিলা দুই লক্ষ নেকি/১৯৬
একটা কু-রসম : শ্বশুরবাড়ি প্রবেশের আগে নববধূর পা ধোয়ানো/১৯৬
দুটো ভুল ধারণা : (ক) খাওয়ার পর বরতন ধুয়ে খাওয়া কি সুন্নত?/১৯৭
(খ) খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা কি সুন্নত?/১৯৭
খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে
হাত মোছা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর/১৯৮
তওবার জন্য কি ওযু জরুরি?/২০৩
হাদীস নয় : মেরাজে নবীজির সাতাশ বছর লেগেছিল/২০৫
হাদীস নয় : একটি জনপদের ওপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার
করে উড়ে যায়, আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে/২০৬
ভুল চিন্তা : কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা কি নিষেধ?/২০৭
ভুল তথ্য : সুরমা কি তুর-এর তাজাল্লি থেকে সৃষ্টি?/২০৭
ভুল ধারণা : কষ্টের সংবাদ দিয়ে না গেলে কবরে বৃক্ষ জন্মায় না/২০৭
ভুল ধারণা : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
যমানায় কি দর্জি ছিল না?/২০৮
ভুল তথ্য : মুনাজাতে মকবুল-এ যা কিছু ছাপা হচ্ছে
সবই কি থানভী রহ.-এর সংকলন?/২০৮
ভুল ধারণা : যফর আহমদ উসমানী রহ. কি শাব্বীর আহমদ
উসমানী রহ.-এর ভাই?/২০৯
হাদীস নয় : লেনদেন কর অপরিচিতের মতো আর তোমাদের
পারস্পরিক আচরণ যেন হয় ভাইয়ের মতো/২১০
ভুল মাসআলা : আত্‌তাহিয়্যাতুর শুরুতে কি
আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/২১০
ভুল মাসআলা: প্রত্যেক মুসল্লির কি সানার পর
আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/২১০
একটা ভিত্তিহীন ঘটনা : হে নূহ! কিশতি ভেঙে ফেল/২১১
নাম সঠিকভাবে বলা ও লেখা/২১২
ভুল মাসআলা : কুরবানীর শরিক সংখ্যা কি বেজোড় হওয়া জরুরি/২১৩
একটা অবাস্তব দাবি : বাস্তবেই কি তাঁরা শিয়াদের ইমাম/২১৩#

www.eelm.weebly.com

বিষয়ভিত্তিক সূচি

ভুল বিশ্বাস

দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকিতে না করা
ফেরতও না নেওয়া/৩১
বিনা ওযুতে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নেওয়া/৩৪
ঈমান বিধ্বংসী বাতিল আকীদা : মেরাজের নব্বই হাজার কালাম/৪৬
রাতের বেলায় ঝুটা পানি বাইরে ফেলা কি অলক্ষুণে?/৪৭
পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরিক হওয়া/৫৩
পৃথিবী ষাঁড়ের শিংয়ের ওপর বিদ্যমান/৫৬
কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির মুরগি/হাঁস কুরবানী দেওয়া/৬৩
ছাতায় অমঙ্গলের বিশ্বাস একটা ভিত্তিহীন কল্পনা/৭৩
মৃত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়ায় ঘুরে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়/৭৯
বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটি কি আসল
তাওরাত ও ইঞ্জিল?/৮৮
মেরাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?/১০৭
ভ্রান্ত বিশ্বাস : শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বা
মুঈনুদ্দীন চিশতি রহ.-এরও কি আসমায়ে হুসনা রয়েছে?/১৪০
আলোচনা চলাকালে উপস্থিত হলে কি হায়াত দীর্ঘ হয়?/১৮২

হাদীস নয়

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর/৩২
مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ
যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান/৩৫
أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِيْمٍ، وَأَنَا الْعَرَبُ بِلَا عَيْنٍ
আমি 'মীম'বিহীন আহমাদ এবং 'আইন'বিহীন আরব/৪০
لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ

www.eelm.weebly.com

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে/৪৩
مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيهِمْ وَلِيُّ اللهِ،
لَا هُمْ يَدْرُوْنَ بِهِ، وَلَا هُوَ يَدْرِيْ بِنَفْسِهِ
প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী/৫০
نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا
আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সওয়াব/৫৩
اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে/৫৬
اَلْأَذَانُ جَزْمٌ، وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ، وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ
আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে/৫৭
مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيْمَانِ
আযানের সময় কথা বললে ঈমান যাওয়ার আশংকা/৬১
প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ পালন/৬৪
আহারের শুরু ও শেষ লবন দিয়ে করা। কারণ লবন সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা– পাগলামি, কুষ্ঠ, শ্বেত .../৬৬
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন/৬৮
উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন.../৭০
মদীনা মক্কা থেকে উত্তম/৭৩
إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَصْحَابِ الْقُبُوْرِ
সমস্যায় পড়লে কবরবাসীর সাহায্য প্রার্থনা কর/৭৬
اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا
দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় যদিও সে কাফের হয়/৭৯
ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত এবং ভুল উদ্ধৃতি/৮০
প্রতিদিনের তারাবীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত/৮৪
আল্লাহর নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য/৯০
কবরকে সম্বোধন ও কবরের উত্তর/৯৭
اَلدِّيْنُ وَالسِّيَاسَةُ تَوْأَمَانِ
দ্বীন ও সিয়াসাত দুই সহোদর/১০০
ওযুতে কি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআ রয়েছে?/১০৯

www.eelm.weebly.com

চল্লিশ বছরের আমল বিনষ্ট হবে/১১৪
সালাম দিলে নব্বই নেকি আর জবাব দিলে দশ নেকি/১২৮
'আসসালাতু মিরাজুল মুমিনীন'/১৩০
দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার?/১৩২
طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقُلُوْبَ
মৃতদের কেন্দ্র করে যে খাবার খাওয়ানো হয় তা অন্তর মেরে ফেলে/১৩৫
وُلِدْتُ فِيْ زَمَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ نُوْشِيْرْوَانَ
আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক নওশেরওঁয়ার যুগে/১৩৭
আশুরার দিন কেয়ামত হওয়া প্রসঙ্গে/১৪০
اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ
শায়েখের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই
যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে/১৪৪
আবু বকর সিদ্দীক রা. কি মিলাদ দিতেন?/১৪৭
হাদীসে কি ফুল কেনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে?/১৪৯
أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ
জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও/১৬৬
أَوْحَى اللهُ إِلَى الدُّنْيَا، أُخْدُمِيْ مَنْ خَدَمَنِيْ، وَأَتْعِبِيْ مَنْ خَدَمَكِ
যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর আর
যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও.../১৭১
মকতবে ঈসা আ.-এর আলিফ, বা... ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া/১৭৩
আঠারো হাজার মাখলুকাত/১৭৭
اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ، وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ
মাদরাসা রাসূলের ঘর/১৮৩
عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ
নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হয়/১৯১
مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্ তাকে
না জানা বিষয়ের ইলম দান করেন/১৯৩
আযানের জবাবে পুরুষ পাবে এক লক্ষ নেকি
মহিলা দুই লক্ষ নেকি/১৯৬
মেরাজে নবীজির সাতাশ বছর লেগেছিল/২০৫

www.eelm.weebly.com

একটি জনপদের ওপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার করে উড়ে যায়, আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে/২০৬
تَعَامَلُوْا كَالأَجَانِبِ، وَتَعَاشَرُوْا كَالإِخْوَانِ
লেনদেন কর অপরিচিতের মতো আর তোমাদের পারস্পরিক আচরণ যেন হয় ভাইয়ের মতো/২১০

ভুল উচ্চারণ

'আকামত' 'মুসওয়াদ্দা' 'আল-বিসমিল্লাহ'/৩৩
আহমেদ/আহাম্মদ/৩৬
খাইরুল/শফীকুল/৩৭
হেল্লাল/বেল্লাল/৫৭
মুনকার-নাকীর/৭৭
চান্দ্র পঞ্চম মাসের নামের সঠিক উচ্চারণ কী?/১৪৯

ভুল নাম

নবীউল্লাহ/৩৭
রাসূল মিয়া/৩৭
মুরসালীন/মুত্তাকীন/৪১
একটি নামের ভুল ব্যবহার : আব্দুল/৪১
প্রসিদ্ধ নামসমূহে প্রচলিত কিছু ভুল : হোসাইন বিন মনসূর হাল্লাজ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব.../৮৭
'আলহাজ্জুল আকবার' কি জুমার দিনের হজের নাম?/৯৭
নাম সঠিকভাবে বলা ও লেখা/২১২

ভুল কথা/বলার ভুল

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া/৩৯
মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?/৩৯
ইন্‌শা আল্লাহ/আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ/৪৪
তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে/৪৯
আল্লাহর সহ্য হবে না/৫৫
সব ধরনের দ্বীনি শিক্ষাকে হাফেযি পড়া বলা/৬০
ভারী বস্তু ওঠাতে ইয়া আলী বলা/৭৪
ইয়া গাউসুল আযম/৭৫
কথা বলার একটা ভয়ানক ভুল যা

www.eelm.weebly.com

আকীদা-বিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে : 'এখন বাচ্চা নেব না'.../৮৫
ওভাবে নয় এভাবে বলুন/১৩০
'রূহ' বা 'বিদেহী আত্মা'র মাগফেরাত কামনা/১৮৫
বিয়েতে 'কালেমা' পড়ানো/১৮৫
কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম/১৮৮
হাঁচি এল মানে কেউ স্মরণ করছে/১৯০
হাত চুলকালে টাকা আসে/১৯২

ভুল কাজ

দুআর মধ্যেও কি মুকাব্বিরের প্রয়োজন?/৯৩
হিসনে হাসীন কি খতম বা ওযীফা আকারে পড়ার কিতাব?/৯৬
মাঝে অনেক ফাঁকা রেখে ইকতেদা করা/১৩৮
জানাযার প্রতি তাকবীরে আকাশের দিকে চোখ ওঠানো/১৫৭

ভুল ঘটনা

জাবের রা.-এর দুই শিশু ছেলের বকরি জবাই খেলা/৩৩
হযরত হাসান-হোসাইন রা.-এর ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি/৩৫
হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর বাঘের আকৃতি ধারণ/৪২
'ফাতেমার জারি'/৪৮
আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর রূহ ফিরিয়ে দেওয়া/৫১
রাবেয়া বসরীর জাহান্নামের আগুন নেভানো/৫৪
ঈমানবিধ্বংসী বানোয়াট কিসসা : আল্লাহ তাআলার নাকি একবার মানুষের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হল.../১৯০
হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের দিন কা'বা শরীফে আযান শুরু/১৯২
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : হে নূহ! কিশতি ভেঙে ফেল/২১১

ভুল প্রচলন

জানাযার নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি 'ভালো ছিল' এ কথার স্বীকৃতি নেওয়া/৪২
গাড়িতে আরোহণের দুআ/৪৫
কবরের প্রথম কোপের মাটিকে
কবরের নিশানা হিসাবে ব্যবহার করা/৫৭
ওকিল বাবা/৬১
জুমার নামাযের নিয়ত/৬২
ধর্মের বাপ/ভাই/৬৪
দস্তরখান 'লাল রঙ' হওয়া কি সুন্নত?/৬৭

www.eelm.weebly.com

তাওয়াফের সাত চক্করের জন্য কি আলাদা আলাদা দুআ রয়েছে/১১৭
বিয়ের ইজাব-কবুলের পর সালাম-মুসাফাহা কি সুন্নত?/১৫২

বিদআত

আযান শুরুর আগে 'আসসালাতু ...' ইত্যাদি পড়া/৪৩
অঙ্গুলি চুমু খেয়ে চোখে মোছা/৪৫
সাক্ষাতে কদমবুসি করা বা সালামের ইশারা করা/৫০
জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা/৫২
মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানদাওতে বাধ্য করা/৫৫
কবরের পাশে লোক দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করানো/৬০
কবর অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া ইত্যাদি/৬৫
লাইলাতুর রাগাইব ও শবে ইস্তেফতাহ পালন/১৭৯

ভুল আমল

সালামের কয়েকটা ভুল/৩৭
ইমামকে রুকুতে পেলে তাকবীর বলে হাত বেঁধে কি দাঁড়াতে হয়?/৪৯
ইমামকে সেজদায় পেলে নিজে নিজে রুকু-সেজদা করা/৫১
গোসল শেষে ওযু করা/৫৯
একটি অমার্জনীয় আচরণ : বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা/৫৯
একটা প্রচলিত মারাত্মক গোনাহ : মামি, চাচি এবং
সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে পর্দা না করা/৬৯
সালামে 'ভিআইপি নিয়ম' চালু না হওয়া উচিত/৭৩
জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়া/৮৩
জায়নামাযের দুআ/১০৫
নামাযের কয়েকটি ভুল/১৮৬
নামাযে মনে মনে কুরআন পড়া/১৮৬
তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা/১৮৭
আমীন মনে মনে বলা/১৮৭

ভুল ধারণা

বোরাকুন নবী : একটি কাল্পনিক ছবি/৩৯
পশু জবাইয়ের সময় কুরবানীদাতাদের নাম পড়া কি জরুরি/৬৪
ইসলামের ফরয কি সর্বমোট ১৩০টি?/৬৬
রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া বা আয়না দেখা কি অশুভ?/৬৯
একসঙ্গে মুনাজাত শুরু এবং শেষ করা/৭১

www.eelm.weebly.com

কিরামান-কাতিবীন/৭৭
নামাযে মিলেমিলে দাঁড়ানো/৭৮
তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না/৮৪
আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'এর
জবাবে কী বলবে?/৮৯
ইজতেমার দিনগুলোতে কি রোযা রাখা মুস্তাহাব?/৯৪
মনগড়াভাবে কোন মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা/৯৫
মৃতের বাড়িতে কি আগুন জ্বালানো নিষেধ?/৯৮
চাশতের নামায ছুটে গেলে কি মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?/১০৩
সন্তান মারা গেলে মা আসরের পর খেতে পারেন না/১০৯
২৭-এর রাতই কি শবে কদর?/১১০
ইফতারের ওয়াক্ত কি আযান শুরু হওয়ার পর হয়?/১১৪
মিনার তিনটি 'জামরা' কি তিন শয়তান?/১১৫
মায়ের মীরাসে কন্যা কি পুত্রের সমান বা দ্বিগুণ পাবে?/১২৩
ঈদের জন্য কি সবকিছুই নতুন হওয়া মাসনুন?/১৩১
খতমস কি ইমাম সাহেবের মাধ্যমে বখশানো জরুরি?/১৩৪
হজে কি মহিলাদের পর্দা করতে হয় না?/১৩৮
হারাম শরীফে একটি গোনাহও কি লক্ষ গোনাহের সমান?/১৩৯
৭৮৬ কি বিসমিল্লাহ-এর বিকল্প?/১৪২
ফাতেহা কি কিরাত নয়?/১৪২
দুআয়ে কুনূত কি শুধু আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...?/১৪৪
খাজা আবদুল্লাহ কি ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন?/১৪৬
মুনাজাতে মকবুলে উদ্ধৃত 'দুআয়ে ইবরাহীম' হাদীসের দুআ নয়/১৫৪
মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জরুরি মনে করা/১৬৫
শাহজালাল রহ. ও শাহজালালের মাযার কি এক বিষয়?/১৬৭
চাশতের নামায কি আট রাকাতই পড়তে হবে?/১৭০
ইত্তেখারার জন্য কি ঘুমাতে হয়?/১৭৬
বিধর্মীদের 'ইয়াদাত' ও তাদের সুস্থতার জন্য কি দুআ করা যাবে না?/১৮২
(ক) খাওয়ার পর বরতন ধুয়ে খাওয়া কি সুন্নত?/১৯৭
(খ) খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা কি সুন্নত?/১৯৭
খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে
হাত মোছা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর/১৯৮
কবরের সংবাদ নিয়ে না গেলে কবরে বৃক্ষ জন্মায় না/২০৭

www.eelm.weebly.com

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
হুজরায় কি দর্জি ছিল না?/২০৮
হযরত আহমদ উসমানী রহ. কি
শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর ভাই?/২০৯

ভুল মাসআলা

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা/৪৪
নামাযে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়লে কি নামায ভেঙ্গে যায়?/৬১
হাঁটুর কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙ্গে যাবে/৬৭
মাসবুক মুসল্লির ইমামের সঙ্গে স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া/৮০
শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির নামায সম্পর্কে
মকসুদুল মুমিনীন-এর ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসমূহ/৮১
শবে কদরের নামায পড়ার নিয়ম/৮৫
জুমার নামায কি খোলা ময়দানে সহীহ হয় না?/১০০
বিনা ওযুতে দরূদ পড়া কি জায়েয নয়?/১০৪
মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা/১০৭
স্বামীর নাম মুখে নিলে কি স্ত্রী তালাক হয়ে যায়?/১০৮
রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি সাহরি খাওয়া অপরিহার্য?/১১০
খুতবার শুরুতে কি আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/১১৩
ইহরাম অবস্থায় কি চাদর বা লেপ দ্বারা পা আবৃত করা যায় না?/১২২
সফরের হালতে কি রোযা ভাঙ্গার
অনুমতি আছে, না না-রাখার?/১৩৪
ইহরাম অবস্থায় কি মীকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়?/১৩৭
দাড়ি লম্বা করার শরয়ী বিধান/১৪১
মাকরূহ ওয়াক্তে কি যিকির-তেলাওয়াত মাকরূহ?/১৪৬
বিধবার অন্যত্র বিবাহ হলে সে কি আগের স্বামীর
মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়?/১৫৩
শিশুর জন্য কি তার বোনের দুধ পান করা নিষেধ?/১৬৪
রিকশা বা যানবাহনে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা কি নিষেধ?/১৭৮
বছরের শুরু-শেষের মধ্যে সম্পদের সর্বনিম্ন পরিমাণের যাকাত দেওয়া/১৮১
দাফনের আগে ঈসালে সওয়াব ও দুআ-ইস্তেগফার কি নিষেধ/১৯১
নামাযে তাকবীরে তাহরীমা না বলে রুকুতে চলে যাওয়া/১৯৫
আত্তাহিয়্যাতুর শুরুতে কি আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/২১০

www.eelm.weebly.com

প্রত্যেক মুসল্লির কি সানার পর আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?/২১০
কুরবানীর শরিকসংখ্যা কি বেজোড় হওয়া জরুরি/২১৩

ভুল প্রথা/রীতি/নিয়ম/পদ্ধতি/রসম/পন্থা/চিন্তা

স্বামী মারা গেলে স্বামীর গোসলের সঙ্গে স্ত্রীকে গোসল করানো/৫৯
সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা/৬৮
পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করা/৬৯
অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া/৭২
সালাম দেওয়ার সময় মাথা ও সিনা ঝুঁকিয়ে দেওয়া/৭৩
নামাযে যেখান থেকে ইচ্ছা কাতার করা/৭৭
সামনের কাতার খালি রেখে দাঁড়ানো/৭৮
রাতে সুই বিক্রি করা কি অশুভ?/১০৭
হজ কি একটি বৈশ্বিক সম্মেলন মাত্র?/১১২
আখেরি চাহার শোম্বা কি উদযাপনের দিবস?/১১৮
বোন তার অংশ গ্রহণ করলে পিত্রালয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ/১২৩
ইসলামে কি কোন সংস্কৃতি নেই?/১২৫
ফাতেহায়ে ইয়াযদহম-এর কোন শরয়ী ভিত্তি আছে কি?/১২৬
একটা চরম ভ্রান্তি : সুফীবাদই কি প্রকৃত ইসলাম?/১২৮
ওযরের হালতে কি মাসআলা নেই?/১৩৩
চার রাকাতের সময় না থাকলে দুই রাকাতও না-পড়া/১৪৬
দেশের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে
আপনজনকে পর মনে করা/১৫০
আসরের পর কিছু খাওয়া কি অনুত্তম?/১৫২
ইসলাহে নফস এবং যিকির ও ওযীফা কি শুধু
বাইয়াত হওয়া মুরীদের কাজ?/১৬৮
বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে/১৬৯
প্রবল বৃষ্টি বন্ধের জন্য আযান/১৭২
প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন/১৮০
দিনের প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানানো/১৮৩
ফাতেহায়ে ইয়াযদহম পালন/১৯৪
শ্বশুরবাড়ি প্রবেশের আগে নববধূর পা ধোয়ানো/১৯৬

ভুল ভাবনা

রোযা কি অনাহার যাপন?/৮২

www.eelm.weebly.com

ঈদ বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের
মতোই কি রেওয়াজি অনুষ্ঠান?/৮৩
২৯ দিনে মাস হলে কি এক রোযা কম হয়?/৮৭
কুরবানীর ঈদ কি জবাইয়ের উৎসব?/৯০
সংস্কৃতি সম্পর্কে কি ইসলামের কোন নির্দেশনা নেই?/১০১
আদব ও নফল বিষয়াদির জ্ঞানচর্চাও কি নফল?/১০৪
পুত্র হলে মিঠাই বিতরণ, কন্যা হলে .../১২৪
মিনার জামারাগুলো কি স্মারক বা ভাস্কর্য?/১৩৬
রমযানুল মুবারকের সমাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার কারণ/১৫৮
হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুলের সাত মনযিল/১৫৮
হরম ও মসজিদে হরম কি এক?/১৬০
ইহরামের চাদরকেই ইহরাম মনে করা/১৬১
হিযবুল বাহ্‌র মা'সূর দুআ নয়/১৬৩
তওবা করলে বা করালে কি মওত এসে যায়?/১৮৯
তওবার জন্য কি ওযু জরুরি?/২০৩
কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা কি নিষেধ?/২০৭

ইতিহাসবিষয়ক ভুল

হাসান বসরী রহ. কি সাহাবী ছিলেন?/১০৬
ফেরাউন কোথায় নিমজ্জিত হয়েছিল?/১১১
আবু জাহেল কি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল?/১৪৫

ভুল তথ্য

তাফসীরবিষয়ক একটা ভুল : 'আবাবীল' কি কোন
বিশেষ পাখির নাম?/১৪৯
সুরমা কি তুর-এর তাজাল্লি থেকে সৃষ্টি?/২০৭
মুনাজাতে মকবুল-এ যা কিছু ছাপা হচ্ছে সবই কি
থানভী রহ.-এর সংকলন?/২০৮
একটা অবাস্তব দাবি : বাস্তবেই কি তাঁরা শিয়াদের ইমাম/২১৩

অন্যান্য

সালাম দেওয়ার একটা ভুল পদ্ধতি/৪১
একটি অবহেলা : জুমার নামাযের পর চার রাকাত
সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় না করা/৫২

www.eelm.weebly.com

একটা অমার্জিত আচরণ/৫৩
একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা : হাজী ও আলহাজ/৯৯
আরবী ব্যাকরণগত ভুল/১৪৮
তরজমার ভুল : إن أولياؤه إلا المتقون এর অর্থ কী?/১৫১
মেরাজবিষয়ক আলোচনা : কিছু অসতর্কতা/১৫৪
একটা অন্যায় কাজ : 'বিসমিল্লাহ্' ও 'দরূদ' অশুদ্ধ বা
অসম্পূর্ণ বলা ও লেখা/১৫৫
একটা অলীক কাহিনী : 'দুআয়ে কদ্‌হ' সম্পর্কিত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই/১৫৭
একটা উদাসীনতা : হিজরী বর্ষ ও চান্দ্রমাসের তারিখ ব্যবহারে উদাসীনতা/১৬৩
একটি আশ্চর্য অপবাদ : কাফের মারা গেলে কি
'ফী নারি জাহান্নামা' বলতে হয়?/১৬৯
ভুল শব্দ : অকাল মৃত্যু/১৭৪
একটা ভুল শ্লোগান : ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার/১৭৫

www.eelm.weebly.com

ভুল বিশ্বাস

দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকিতে না করা, ফেরতও না নেওয়া

আমাদের সমাজে একটি ধারণা ও বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকিতে হতে পারবে না, ঠিক দুপুরে ও সন্ধ্যার পরেও বাকি দেওয়া যাবে না। এ সময়গুলোতে মাল ফেরতও নেওয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, এতে সারাদিন ব্যবসা মন্দা যাবে এবং এটা একটা অলক্ষুণে বিষয়।

এটা একটা ভুল ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং একদিক থেকে শরয়ী নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিকও বটে। কারণ, একজন ক্রেতা যদি ঠিকই নগদ মূল্য দিতে অক্ষম হয় এবং তার কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে মূল্য না পাওয়ার আশঙ্কা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে বাকিতে বিক্রি করা বরং নেকির কাজ। কারণ এতে একজন মানুষকে সহযোগিতাও করা হচ্ছে, সাথে সাথে ব্যবসা তো হচ্ছেই।

আর পণ্য ফেরত নিতে গেলে যদি ব্যবসায়ীর বড় কোন ক্ষতি না হয়, বরং শুধু ওই বস্তুটির লাভ থেকে সে বঞ্চিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তা ফেরত নেওয়াই শরীয়তের উপদেশ। হাদীসে এর জন্য ফযীলতের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোন লজ্জিত ক্রেতার পণ্য ফেরত নিল, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।' –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৩৬, সুনানে আবু দাউদ ২/১৩৪

www.eelm.weebly.com

সুতরাং দোকান খোলার পর প্রথম বাকি দেওয়াকে এবং পণ্য ফেরত নেওয়াকে অলক্ষুণে ভাবা শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই বর্জনীয়।

হাদীস নয়

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর

ইসলামে ইল্‌মে দ্বীন অন্বেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ইল্‌মের যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি তা শিক্ষারও কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। শৈশব থেকে আমরণ ইল্‌ম অর্জন করে যেতে হবে। এটিই ইল্‌মের দাবি। তবে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর' কথাটি একটি প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ।

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

لَيْسَ بِحَدِيْثٍ نَبَوِيٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، فَلَا تَجُوْزُ إِضَافَتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَتَنَاقَلُهُ بَعْضُهُمْ، إِذْ لَا يُنْسَبُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّهُ.

وَكَوْنُ هٰذَا الْكَلَامِ صَحِيْحَ الْمَعْنٰى فِيْ ذَاتِهِ وَحَقًّا فِيْ دَعْوَتِهِ: لَا يُسَوِّغُ نِسْبَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُوالْحَجَّاجِ الْحَلَبِيُّ الْمِزِّيُّ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسِبَ حَرْفًا يَسْتَحْسِنُهُ مِنَ الْكَلَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ فِيْ نَفْسِهِ حَقًّا، فَإِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ قَالَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِنْتَهٰى مِنْ كِتَابِ «ذَيْلِ الْمَوْضُوْعَاتِ» لِلْحَافِظِ السُّيُوْطِيِّ ص ٢٠٢.

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ: (أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ) مَشْهُوْرٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثِيْرًا. وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمُؤَلَّفَةَ (فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ) لَمْ تَذْكُرْهُ. مِنْ حَاشِيَةِ «قِيْمَةِ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ»

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ, এটি হাদীসে নববী নয়, বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধিত করা মোটেও বৈধ হবে না। (যেমন কেউ কেউ করে থাকে।) কেননা, তাঁর প্রতি শুধু সেটিকেই সম্বন্ধিত করা যাবে, যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন। যেকোন কথা ভালো মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বলা জায়েয হবে না, যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য, কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নববী নয়। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা উচিত। –কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা ৩০ (টীকা)

ভুল উচ্চারণ

'আকামত' 'মুসওয়াদ্দা' 'আল-বিসমিল্লাহ'

'আকামত' أَقَامَة : এ উচ্চারণটা ভুল। নামাযের জামাতের আগে আযানের মতো যে কাজটি করা হয় তা হচ্ছে ইকামত (إِقَامَة), আকামত (أَقَامَة) নয়। এটি আরবী ভাষার 'বাবুল ইফআল'এর মাসদার।

'মুসওয়াদ্দা' مُسَوَّدَة : এ উচ্চারণটা ভুল। পাণ্ডুলিপি অর্থে আরবীতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে মুসাওওয়াদা (مُسَوَّدَة), মুসওয়াদ্দা (مُسْوَدَّة) নয়। মুসাওওয়াদা শব্দটি 'বাবুত তাফ্‌ঈল' থেকে ইসমে মাফউলের সীগা।

'আল-বিসমিল্লাহ' : এভাবে লেখা বা বলা সম্পূর্ণ ভুল। আরবী ভাষায় ال (আল) ব্যবহারের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। যে শব্দের সাথে 'আল' প্রযোজ্য, শুধু সে শব্দের সাথেই 'আল' ব্যবহার করা যাবে। অন্য ক্ষেত্রে 'আল' ব্যবহার করা বা বাংলা কোন শব্দের সাথে 'আল' ব্যবহার করা ভুল। অনেকে 'আল' শব্দটিকে বরকতময় বা সম্মানজনক কিছু একটা মনে করেন। বিষয়টি আসলে এমন নয়। এ-ধরনের আরও কয়েকটি ভুলের নমুনা হল– আল-সুরেশ্বর, আল-মক্কা, আল-সৈয়দ ইত্যাদি।

ভুল ঘটনা

হযরত জাবের রা.এর দুই শিশু ছেলের বকরি জবাই খেলা

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেন। মেহমানদারির জন্য একটি বকরি জবাই

www.eelm.weebly.com

করেন। বকরি জবাইয়ের সময় হযরত জাবের রা.এর দুই শিশু ছেলে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হযরত জাবের রা. বকরি নিয়ে চলে গেলে দুই ভাই মিলে 'বকরি জবাই খেলা' শুরু করল এবং এক ভাই আরেক ভাইকে শুইয়ে বকরির মতো জবাই করে দিল। এরপর ভয়ে সেও মারা গেল।

নবীজি কষ্ট পাবেন ভেবে হযরত জাবের রা. ধৈর্যের সাথে ছেলে দুটোর লাশ ঘরের কুঠরিতে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে বসে জাবের রা.কে বললেন, তোমার ছেলে দুটোকে ডাক। তিনি বললেন, হুযুর আপনি খান, ওরা ঘুমাচ্ছে। তখন নবীজি বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে কম্বল উঁচু করে ডাকলেন, হে জাবেরের দুই ছেলে, উঠে এস। তখন ভোরের পাখির মতো ছেলে দুটো উঠে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নবীজি বাচ্চা দুটোকে নিয়ে খেতে লাগলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হযরত জাবের রা. অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ থেকে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

উল্লিখিত ঘটনাটা ভুল। লোকমুখে বহুল প্রচলিত হলেও এর কোন দালিলিক ভিত্তি নেই। # ফেব্রুয়ারি '০৫ঈ.

ভুল বিশ্বাস

বিনা ওযুতে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নেওয়া

কিছু লোকের মুখে শোনা যায় এবং কোন কোন চটি বইয়েও পাওয়া যায়, 'বিনা ওযুতে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নিলে শরীরের তিনটি পশম ঝরে যায়।'

এটা একটা ভুল বিশ্বাস। অবাস্তব ও অযৌক্তিক একটা বিশ্বাস। প্রথমত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এ বিশ্বাসের কোন অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ওলীকুল শিরোমণি হলেও তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই একজন উম্মত এবং আল্লাহ্ তাআলার বান্দা। যখন মহান আল্লাহ্ ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বিনা ওযুতে উচ্চারণ করলে পশম ঝরে না, তা হলে তাঁর নাম মুখে নিলে পশম ঝরবে কেন?

তৃতীয়ত একটি পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। আসলেই এমন কোন ব্যাপার ঘটে কি না। তা হলে কেন এ অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করবেন, যা আব্দুল কাদের জিলানী রহ. নিজেও কখনও কামনা করেননি।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়
যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

যে ব্যক্তি তার মুরুব্বী তথা দ্বীনদার উস্তাদ, পিতা-মাতা অথবা কোন হক্কানি বুযুর্গের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না, সে ব্যক্তি সাধারণত শয়তানের ফাঁদে পড়ে থাকে। এজন্য হক্কানি উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং নেককারদের সোহবত অবলম্বন করার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে। তবে উল্লিখিত কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়, কোন হক্কানি বুযুর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি মাত্র।

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন রহ.-এর মালফূযাত তথা বাণী-সংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'-এ আছে, 'মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন–

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

(যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. বললেন– না, এটা মাশায়েখের বাণী।' –ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ–আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়াতিল আলিয়্যা ৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৬১

অনেকে উপরোক্ত কথাটা হাদীস মনে করে নামমাত্র বায়আতকে (পীরের হাতে হাত দেওয়াকে) ফরযে আইন মনে করে থাকে, যা নিতান্তই ভুল। পক্ষান্তরে অনেকে হক্কানি উলামা মাশায়েখের সোহবত ও সংশ্রবের মোটেও প্রয়োজনবোধ করে না, যা আরও মারাত্মক ভুল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৩৬-২৩৮, তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভুল ঘটনা
হযরত হাসান-হোসাইন রা.-এর ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি

ঈদের সকাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরো হাসান-হোসাইন তাঁদের মা ফাতেমার কাছে ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি করছেন। 'আশ-পাশের সমবয়সী অনেকে নতুন জামা পরে হাসি-

www.eelm.weebly.com

কুর্তি করছে, কিন্তু আমাদের নতুন জামা নেই কেন?' মা ফাতেমা কান্না গোপন করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। অগত্যা তাদেরকে বললেন, তোমরা গোসল করে এস, আমি তোমাদের নতুন জামার ব্যবস্থা করছি।

বলাবাহুল্য, ব্যবস্থা করার মতো তাঁর কাছে কোন উপায়ই ছিল না।

মা ফাতেমা দুই পুত্রকে গোসল করতে পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে লুটিয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হে প্রভু! হাসান-হোসাইন গোসল করে এসে জামা চাইলে আমি তাদের কী জবাব দেব? তুমি কি চাও, আজ ঈদের দিনে তাদের সামনে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হই এবং তারা মিসকীনের মতো ঈদ করুক? আল্লাহ্ তাআলা তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দর্জির বেশে দুটো জামা দিয়ে মা ফাতেমার ঘরে পাঠালেন। দরজায় নক করার শব্দ শুনে মা ফাতেমা সেজদা থেকে মাথা তুললেন এবং দর্জির কাছ থেকে জামা দুটো গ্রহণ করলেন। একটি জামা ছিল লাল, আরেকটি ছিল নীল। শিশু হাসান-হোসাইন ঘরে ফিরে নতুন জামা পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। দুজনে জামা দুটো বুকে জড়িয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দিকে দৌড়াতে লাগল। ডাক দিল, নানা! এই দেখুন আমাদের ঈদের নতুন জামা!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা দুটো দেখে কেঁদে উঠলেন এবং লাল জামাটি হোসাইনকে ও নীল জামাটি হাসানকে পরিয়ে দিলেন, যা পরবর্তী সময়ে হযরত হোসাইন রা.এর শাহাদাত এবং হযরত হাসান রা.এর বিষপানের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

এ ঘটনার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। এর চেয়ে অলৌকিক ব্যাপারও নবী পরিবারের সাথে ঘটতে পারে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি বা ঘটেছে বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সে ঘটনা প্রচার করার কোন সুযোগ নেই। আর এর কোন প্রয়োজনও নেই।

ভুল উচ্চারণ

আহমেদ/আহাম্মদ

দুটো উচ্চারণই ভুল। সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে 'আহমাদ' (أَحْمَد) বাংলা ভাষা হিসাবে সর্বোচ্চ 'আহমদ' উচ্চারণ করা যায়। আহমেদ, আহাম্মেদ, আহম্মদ বা আহাম্মদ উচ্চারণ করার কোন সুযোগ নেই। বিশেষত এটি রাসূলুল্লাহ

www.eelm.weebly.com

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম হওয়ার কারণে এ নামকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা বড় ধরনের অন্যায়।

খাইরুল/শফীকুল

এ ধরনের উচ্চারণ ভুল। সাধারণত খাইরুল ইসলাম ও শফীকুল ইসলাম থেকে সংক্ষেপ করে এভাবে বলা হয়। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, এখানে ل হল দ্বিতীয় শব্দের অংশ। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু ال উচ্চারণ করাটা অনর্থক। এ ধরনের আরও কিছু উদাহরণ– মারকাযুল, আশরাফুল, আব্দুল ইত্যাদি।

ভুল নাম

নবীউল্লাহ

এভাবে কারও নাম রাখা ভুল। এ নামের অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র নবী'। উম্মতের কারও এ নাম হতে পারে না। কেননা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন, তাঁর পরে কোন নতুন নবী আসবেন না। সুতরাং এ নামও আর কারও হবে না।

তাই এরূপ নাম কেউ রেখে থাকলে তা পরিবর্তন করা জরুরি। আর ইসলামী নাম রাখার ক্ষেত্রে আরবী ভালো জানে এমন কারও থেকে অর্থ জেনে নাম রাখা উচিত।

রাসূল মিয়া

এরূপ নাম রাখাও ঠিক নয়। রাসূল শব্দটি একটি সম্মানিত শব্দ। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি পরিভাষা, যা উম্মতের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এ নাম রাখা ভুল। # মার্চ '০৫ঈ.

সালামের কয়েকটি ভুল

১. সালামের জবাব দিয়ে আবার সালাম দেওয়া

এ রীতিটা ভুল। উত্তম হল সালাম পাওয়ার অপেক্ষা না করে আগে সালাম দেওয়া। কিন্তু কেউ সালাম দিয়ে দিলে তখন দায়িত্ব হল শুধু সালামের উত্তর দেওয়া।

২. সালামের জবাব না দিয়ে আবার সালাম দেওয়া

www.eelm.weebly.com

এ রীতিটাও ভুল। বড় কেউ যদি আগে সালাম দিয়ে ফেলে, তখন আমাদের অনেকেই জবাব দিতে লজ্জাবোধ করে। তাই জবাব না দিয়ে নতুন করে সালাম দেয়। এ রীতি পরিহারযোগ্য। কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। তাই জবাবই দিতে হবে।

৩. কাউকে সালাম দেওয়ার পর 'সালাম দিয়েছি' বলা

সালাম দেওয়ার পর উত্তর না পেলে আমরা সাধারণত বলে থাকি 'সালাম দিয়েছি।' এভাবে বলা ঠিক নয়। নিয়ম হল আবার সালাম দেওয়া। শ্রোতাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে সালাম দিতে হবে। সালামের উত্তর যেমন সালামদাতাকে শুনিয়ে দিতে হয়, তেমনি সালামও শ্রোতাকে শুনিয়ে দিতে হয়।

৪. মনে মনে বা নিম্নস্বরে সালামের জবাব দেওয়া

এ অভ্যাস পরিহারযোগ্য। সালামদাতাকে শুনিয়েই সালামের জবাব দেবে।

৫. অসময়ে সালাম দেওয়া

কুরআন হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট যে, সালাম হচ্ছে সাক্ষাতের বিভিন্ন আদবসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা ইত্যাদি এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে করার মতো কিছু আমল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় দুআ বা মুনাজাত শেষ হলে অনেকে সালাম দিয়ে বসেন। এটা একটা ভিত্তিহীন রেওয়াজ। দুআ বা মুনাজাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সালামের কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি মুসাফাহা, মুআনাকারও কোন সম্পর্ক নেই।

৬. সালামের উচ্চারণে ভুল

সালাম একটি দুআ। ইসলামের শিআর ও প্রতীক পর্যায়ের একটি আমল। এর সহীহ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। কমপক্ষে এতটুকু বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবশ্যই জরুরি, যার দ্বারা অর্থ ঠিক থাকে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আরবী দেখে এর উচ্চারণ শিখে নেওয়া উচিত। অন্যথায় ع ও ح ইত্যাদি হরফের যথাযথ মাখরাজ আদায় হয় না। অনেকে অসাবধানতা বা তাড়াহুড়োর কারণে ভুল উচ্চারণে সালাম দিয়ে থাকে। এমনটা অনুচিত। সালামের ভুল উচ্চারণের কয়েকটি রূপ :

১. স্লামালাইকুম ২. সালামালাইকুম ৩. আস্লামালাইকুম ৪. আস্লামুআলাইকুম ৫. সেলামালাইকুম ৬. ইস্লামালাইকুম ৭. আচ্ছালামু আলাইকুম ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

বলার ভুল

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া

মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, 'জনাব কোতয়ালী সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।'

এভাবে বলা ভুল। পাঞ্জা লড়ার বিষয়টি সাধারণত সমশক্তিসম্পন্নদের মাঝে হয়, যেখানে হার-জিত উভয় সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারটি এমন নয়। মৃত্যু হল সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার হুকুম। এর সঙ্গে একজন দুর্বল মানুষের পাঞ্জা লড়ার প্রশ্নই আসে না। কোন মুসলমান এ বিশ্বাস রাখে না। অসাবধানতার কারণে এ ধরনের কথা মুখে চলে আসে, যা পরিহার করা জরুরি।

ভুল প্রবাদ

মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

এ প্রবাদটা ভুল এবং একটা ভুল বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ প্রবাদটা প্রচলিত। আমাদের অনেকে রাগ বা অভিমান করে বলে ফেলেন, 'তুমি আমার বাড়িতে না এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?'

মহাভারত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, যা মূলেই ভুল ও অশুদ্ধ; কিন্তু এ প্রবাদটা ব্যবহার করে প্রকারান্তরে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, 'মহাভারত' সহীহ-শুদ্ধ গ্রন্থ। তুমি আমার বাড়িতে না এলেও এ গ্রন্থ অশুদ্ধ হবে না। তাই জোর তাগিদের সঙ্গে বলে থাকি, 'তুমি আমার বাড়িতে না এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?'

একজন মুসলমানের জন্য এ প্রবাদটা অবশ্যই পরিহারযোগ্য।

বোরাকুন নবী : একটি কাল্পনিক ছবি

আমাদের দেশে 'বোরাকের' একটা কাল্পনিক ছবির বেশ প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন চটি বইয়ে বোরাকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে–

'বোরাক একটা চতুষ্পদ জন্তু। এটা দেখতে মাথা হতে বক্ষ পর্যন্ত একটি অতি সুন্দরী রমণীর মতো। মাথায় লম্বা কেশ। বক্ষ হতে পশ্চাৎ দিকে একটি সুন্দর ঘোড়ার মতো। এত দ্রুতগামী যে, চোখের পলকে যমীন হতে আসমানে পৌঁছে যেতে পারে।'

বোরাকের এ বিবরণটা সম্পূর্ণ অলীক ও কাল্পনিক। এ ভিত্তিহীন বিবরণের আলোকেই অনেকে বোরাকুন্নবীর একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে প্রচার করে।

www.eelm.weebly.com

হাদীস ও তারীখের (ইতিহাসের) কিতাবে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জিবরীল আমার কাছে একটি প্রাণী নিয়ে আসল, যার গায়ের রং সাদা, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট। এর গতি ছিল এমন যে, তার দৃষ্টির শেষ সীমায় তার একেকটি কদম পড়ত।' –আসসীরাতুন নববিয়া, ইমাম যাহাবী ১৫৪

এ বাহনটি ছিল মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত। আকাশ পথের সফর তিনি বোরাকে করেননি। তাই বোরাক একপলকে আকাশ পর্যন্ত চলে যেত, একথাও ভুল ও ভিত্তিহীন। –আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসীর ৩/১০৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

একটা মারাত্মক জাল হাদীস
আমি 'মীম'বিহীন আহমাদ এবং 'আইন'বিহীন আরব

أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِيمٍ، وَأَنَا الْعَرَبُ بِلَا عَيْنٍ

কোন মুলহিদ বেদ্বীন এ বাজে মিথ্যা কথাটাকে হাদীস হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল।

আহমাদ (أحمد) শব্দ হতে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে আহাদ (أحد) আহাদ আরবী শব্দ, আল্লাহ্ তাআলার নাম। এর অর্থ একক প্রভু। সুতরাং মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ তিনি আল্লাহ্।

আর আরব (عرب) শব্দটি হতে 'আইন' বাদ দিলে বাকি থাকে রব (رب)। রব শব্দটিও আরবী, অর্থ হল প্রতিপালক। মোটকথা, 'আইন'বিহীন 'আরব' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় তিনি প্রতিপালক তথা আল্লাহ্। তা হলে কথাটার অর্থ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে আহাদ ও রব তথা আল্লাহ্ হওয়ার দাবি করছেন। নাউযুবিল্লাহ!

অর্থ দেখেই পাঠক বুঝতে পারছেন যে, এটা জাল রেওয়ায়েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতেই পারে না। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

দ্রষ্টব্য, খাইরুল ফাতাওয়া ১/২৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২৪২, তালীমুদ্দীন-ইসলাহী নেসাব ৩০৪-৩০৫

এপ্রিল '০৫ ঈ.

www.eelm.weebly.com

নামের ভুল

মুরসালীন/মুত্তাকীন

এভাবে কারও নাম রাখা বা কাউকে ডাকা ভুল। রাসূল ও নবী শব্দের সমার্থ শব্দ 'মুরসাল'। এর বহুবচন হচ্ছে 'মুরসালূন' বা 'মুরসালীন'। সে হিসাবে উম্মতের কোন ব্যক্তির জন্য এ নাম প্রযোজ্য নয়। বহুবচনে তো নয়ই, এক বচনেও নয়। এমনিভাবে 'মুত্তাকীন' শব্দটিও 'মুত্তাকী' শব্দের বহুবচন, বিধায় কোন ব্যক্তির নাম 'মুত্তাকীন' রাখা হলে এর যথাযথ কোন অর্থ দাঁড়ায় না। হয়ত নাম দুটোর মূলরূপ ছিল আনীসুল মুরসালীন ও মুহিব্বুল মুত্তাকীন বা এ-ধরনের অন্য কিছু, যা অর্থগত দিক থেকে খুবই সুন্দর নাম, যার অর্থ যথাক্রমে রাসূলগণের প্রেমিক এবং পরহেযগারদের প্রেমিক। সংক্ষেপ করতে গিয়েই আমাদের ভুলটা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপের জন্য মুহিব ও আনীস বলে ডাকা যেতে পারে।

একটি নামের ভুল ব্যবহার

আমাদের দেশে কাজের ছেলেকে আব্দুল নামে ডাকার একটা ভুল প্রচলন রয়েছে। ভিন্ন নাম থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় এদেরকে 'আব্দুল' নামে ডাকা হয়। আরবী 'আব্দুন' শব্দের অর্থ দাস বা গোলাম। এ নামটি হয়ত 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র বান্দা)এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণেই আব্দুল্লাহকে 'আব্দুল' (যার অর্থ 'দাস') বলে ডাকা উচিত নয়। প্রকৃতিগতভাবে আযাদ ও স্বাধীন কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌র বান্দা না বলে 'বান্দা' বা 'দাস'এর পরিচায়ক আব্দুল বলে ডাকা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং বেয়াদবি। একজন মানুষ গৃহপরিচারক হয়ে তো দাস হয়ে যায়নি!

সালাম দেওয়ার একটা ভুল পদ্ধতি

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বক্তাগণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ বন্দনার অবতারণা করার পর সালাম দেন। এ রীতিটা ভুল। যেমন বলে থাকেন, 'মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় পরিচালক, মান্যগণ্য অমুক অমুক সাহেব ও আমার শ্রোতাবন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।' নিয়ম হল শ্রোতাদের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে সালাম দেওয়া। সাক্ষাতের নিয়মাবলির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সালামের কথাই বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

একটা ভুল ঘটনা
হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর বাঘের আকৃতি ধারণ

শোনা যায়, শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাঁর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় এক অসৎলোক খারাপ উদ্দেশ্যে তাদের ঘরে আসে এবং তাঁর মায়ের সঙ্গে জোরপূর্বক অশালীন আচরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তখন আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাঁর মায়ের নাক দিয়ে বাতাস হয়ে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বাঘের আকৃতি ধারণ করে লোকটার ঘাড় মটকে দেন। লোকটার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে তিনি পুনরায় বাতাস হয়ে মায়ের নাক দিয়ে গর্ভাশয়ে ফিরে যান।

এ ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. রচিত গ্রন্থাবলি, তাঁর জীবনীর উপর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলি এবং ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এ-ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। মূলত শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার জন্য একশ্রেণির অসংযমী বক্তা এসব অলীক ঘটনা তৈরি করেছেন।

ভুল প্রচলন
জানাযার নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি
'ভালো ছিলেন'–এ কথার স্বীকৃতি নেওয়া

কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের আগে তার অভিভাবক বা ইমাম সাহেব উপস্থিত মুসল্লিদের জিজ্ঞাসা করেন, 'এ লোকটি কেমন ছিলেন?' তখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই উত্তরে বলে থাকে, 'ভালো ছিলেন।' এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনবার জবাব নেওয়া হয়।

এটা করা হয় রেওয়াজ হিসাবে। এ রেওয়াজ ও প্রচলনটা ভুল। শরীয়তের কোন দলিলে এ-ধরনের কোন আমলের অস্তিত্ব নেই। সাধারণত মনে করা হয়, এভাবে সম্মিলিতভাবে তার ব্যাপারে 'ভালো ছিলেন' বললে মৃত ব্যক্তি ভালো হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন, আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু বোঝার বিষয় হল, কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবে ভালো না হন, তা হলে এরূপ বলার দ্বারা সে ভালো সাব্যস্ত হবেন না এবং মানুষের মনেও এমন বিশ্বাস জন্মাবে না যে, সত্যি লোকটি ভালো ছিলেন। আর যদি বাস্তবে তিনি ভালো থেকে থাকেন, তা হলে এ রেওয়াজি স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন নেই। তাই এ ভুল প্রচলনটা পরিহার করা জরুরি।

www.eelm.weebly.com

সুন্নত-বিদআত শিরোনামে দেখানো হবে কোন্ কাজটি সুন্নত হিসাবে আমাদের করার দরকার ছিল, কিন্তু আমরা সে সুন্নত আমল না করে একটা বিদআত গ্রহণ করেছি। যদি সুন্নতের ওপর আমাদের আমল থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই বিদআত প্রবেশ করতে পারত না।

সুন্নত

আযানের পর দরূদ ও দুআ পাঠ করা

আযানের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হাদীসে বর্ণিত দরূদ পাঠ করা। অর্থাৎ আযানের দুআর আগে দরূদ নিম্নস্বরে পাঠ করা সুন্নত। –সহীহ মুসলিম ১/১৬৬, হাদীস ৩৮৪

বিদআত

আযান শুরুর আগে 'আসসালাতু ...' ইত্যাদি পড়া

আযান শুরু করার আগে আযানের শব্দাবলির মতো 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুযনিবীন' ইত্যাদি পড়া। মূলত প্রথমোক্ত সুন্নতটি ছেড়ে দেওয়ার কারণেই এ দ্বিতীয়োক্ত বিদআতটা প্রবেশ করেছে। তাই বিদআত ছেড়ে সুন্নত ধরতে হবে।

হাদীস নয়

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে

لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ.

'তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে, তা হলে আল্লাহ্ তাআলা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন।'

এটা একটা হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে এমন বে-ইল্ম লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ও পানি পড়া ইত্যাদি প্রদানে অভ্যস্ত, তাদের অনেকে গ্রাহকদের আস্থা কুড়ানোর জন্য এসব সস্তা-বুলি আওড়ে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. উক্তিটার অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

هُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِيْنَ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ

'এটা মূর্তিপূজারী মুশরিকদের জালকৃত।' –আলমানারুল মুনীফ ফিস-সহীহি ওয়ায-যয়ীফ ১৩৯

আল্লামা সাখাবী রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: إِنَّهُ كَذِبٌ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا: إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.

'ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এটা মিথ্যা কথা। আমাদের শায়েখ (ইবনে হাজার আসকালানীও) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ৪০২

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইসমাইল আজলূনী এবং শায়েখ কাউকজী রহ. এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। –তাযকিরাতুল মাওযূআত ২৮, আলমাসনূ ১৪৮, আলমাওযূআতুল কুবরা ৯৮, কাশফুল খাফা ২/১৩৮, আললুউলুউল মারসূ ৬৫ # মে '০৫ঈ.

ইন্‌শা আল্লাহ্/আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্

এ দুটো বাক্য যথাস্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকে ভুল করে থাকি। একটির জায়গায় আরেকটি ব্যবহার করে ফেলি। বলে থাকি 'ইনশাআল্লাহ আমরা ভালোই আছি', 'ইন্‌শা আল্লাহ্ আমাদের এখানে অনেক ধান হয়েছে।' এভাবে বলা ভুল। মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্জিত কোন নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বলতে হয় আলহামদু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার)। আর ভবিষ্যতে কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করলে বা সিদ্ধান্ত নিলে কাজটি যেন যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায়, সেজন্য আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করে বলতে হয় ইনশা আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ তাআলা চান)। তাই ভবিষ্যতের কোন কাজের ক্ষেত্রে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলা এবং অর্জিত কোন নেয়ামতের ওপর 'ইনশা আল্লাহ্' বলা ভুল। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

এটা গোনাহের কাজ, তা আমরা সবাই জানি। তবে অনেকেই জানি না, এটা কত বড় গোনাহ। তাই অবলীলায় গোনাহটা করে ফেলি। যারা জানেন

www.eelm.weebly.com

তাদের এক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হয়–

১. অনেকে এক হাত মাটির দিকে ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে নামাযীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায় এবং মনে করে হাতের দ্বারা সুতরার কাজ হয়ে গেছে, বা ঝুঁকে ঝুঁকে যাওয়ার দ্বারা গোনাহটা আর হবে না। এ ধারণা ভুল।

২. অনেকে কাঁধের রুমাল নামাযীর সামনে ঝুলিয়ে পার হয়ে যায়। এ পদ্ধতিও ভুল।

এক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক ভুল হয়ে যায়। সেগুলো থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি।

গাড়িতে আরোহণের দুআ

যেকোন গাড়িতে চড়ার দুআ হচ্ছে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

আর যেকোন নৌযান– যেমন নৌকা, স্টিমার ইত্যাদিতে আরোহণের দুআ হল–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যে ভুল করে থাকি তা হচ্ছে, গাড়িতে চড়ার সময় প্রথমোক্ত দুআটি না পড়ে দ্বিতীয় দুআটি পড়ে থাকি, যা মূলত নৌযানে আরোহণের জন্য নির্ধারিত। অনেক গাড়িতে নৌযানে ভ্রমণের দুআটি লেখাও থাকে। এ ভুলটা না হওয়া উচিত।

সুন্নত

দরূদ পড়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে সুন্নত হচ্ছে তাঁর ওপর দরূদ পড়া। এটি আমাদের ওপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক।

বিদআত

অঙ্গুলি চুমু খেয়ে চোখে মোছা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে অঙ্গুলি চুমু খেয়ে তা চোখে মোছা বিদআত। নবীজি এমনটি করতে বলেননি। সাহাবী তাবেয়ীনেরও কেউ এমনটি করেননি।

www.eelm.weebly.com

ঈমান বিধ্বংসী বাতিল আকীদা

মেরাজের নব্বই হাজার কালাম

'মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরি, যেগুলো উলামায়ে কেরাম জানেন। আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে একমাত্র হযরত আলী রা.কে বলে গেছেন।

তাঁর নিকট থেকে সিনা পরম্পরায় পরবর্তী সুফী, ফকীর ও দরবেশদের নিকট গচ্ছিত। বাতেনি এই ষাট হাজার কালাম উলামায়ে কেরাম না-জানার কারণে তারা ফকীর-দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের ওপর আপত্তি করে বসেন।'

এ কথা জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা প্রথমত এতে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এই মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দুপ্রকার শরীয়ত প্রদান করেছেন। একটি ত্রিশ হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত, আরেকটি ষাট হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত এবং উভয় শরীয়ত পরস্পর বিরোধী। এক শরীয়তে একটি বস্তু হালাল হলে অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম। এরূপ পরস্পর বিরোধপূর্ণ কাজ কোন সৃষ্টির পক্ষেও নিকৃষ্ট, অথচ এটাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার শানে চালিয়ে দিয়েছে এসব দাজ্জালরা।

দ্বিতীয়ত এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও এই অপবাদ আসে যে, তিনি দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা, যা সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা জরুরি ছিল, তা তাদের কাছে পৌছাননি। একজনকে গোপনে বলে গেছেন আর অন্যদেরকে বলে গেছেন তার বিপরীত কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ব্যক্তির এরূপ ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তা তো বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.কে দ্বীনের বিশেষ বিশেষ এমন অনেক কথা পৌছিয়েছেন, যা অন্যদেরকে পৌছাননি-এ আকীদা মূলত সাবাঈ চক্রের ছিল (যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে উম্মত একমত।) সাবাঈ চক্র এ আকীদা হযরত আলী রা.-এর যুগেই রটিয়েছিল। আর হযরত আলী রা. সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সহীহ রেওয়ায়েত রয়েছে। দেখুন-

www.eelm.weebly.com

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُوْنَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

'আমের ইবনে ওয়াসেলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি লোকের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন? এ কথা শুনে ক্রোধে হযরত আলী রা.-এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অগোচরে আমাকে কিছু বলে যাননি। তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমরা ছিলাম ঘরের ভেতর। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পিতাকে লানত করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করে, আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর লানত করেন। যে ব্যক্তি কোন বিদআতিকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর লানত করেন। যে ব্যক্তি যমীর চিহ্ন (সীমানা) এদিক-সেদিক করে, আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর লানত করেন।' –সুনানে নাসায়ী ২/১৮৩-১৮৪, হাদীস ৪৪২২

তাই এ ধরনের উক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতেই নব্বই হাজার কালাম লাভ করেছিলেন ... সেগুলো একমাত্র হযরত আলী রা.কে গোপনে বলে গেছেন...) ভিত্তিহীন ও কুফরি কালাম, যা উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করা অপরিহার্য। # জুন '০৫ঈ.

ভুল বিশ্বাস

রাতের বেলায় ঝুটা পানি বাইরে ফেলা কি অলক্ষুণে?

রাতের বেলায় ঝুটা পানি বা খাবার ও পানি জাতীয় কিছু বাইরে ফেলা যাবে না। এ ধরনের একটা ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মনে করা হয়, এতে সৌভাগ্য দূর হয়ে যায় এবং এটা মারাত্মক ধরনের অলক্ষুণে

www.eelm.weebly.com

ব্যাপার। মৃত মুরুব্বীদের রূহ রাতের বেলায় ঘোরাফেরা করে থাকে, তাই ঝুটা পানি ইত্যাদি ফেললে তারা অসন্তুষ্ট হন।

এটা একটা ভুল বিশ্বাস। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। এমনকি বাস্তবের সাথেও এ বিশ্বাসের কোন মিল নেই। বাসি-পচা পানি, ঝুটা ইত্যাদি সারা রাত ঘরে জমিয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতাই নেই। এটা এমন এক মারাত্মক ভুল বিশ্বাস, যার আকলি-নকলি কোন ভিত্তি নেই। রূহ ঘোরাফেরার আকীদাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অসত্য ঘটনা

'ফাতেমার জারি'

'ফাতেমার জারি' নামে একটা মিথ্যা ঘটনা আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে খুব আলোচিত। ঘটনার বিবরণ– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহা যিনি হযরত ওসমান গণি রা.এর স্ত্রী ছিলেন, ওসমান গণি রা.এর স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মে কুলসুম রা. ছিলেন অনেক সম্পদের অধিকারী। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কন্যা তাঁর কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা রা. ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তাঁর স্বামী হযরত আলী রা. ছিলেন সহায়-সম্বলহীন।

উম্মে কুলসুম রা. মদীনার মহিলাদের দাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু আপন বোন ফাতেমাকে দাওয়াত করেননি। কারণ ফাতেমা রা. গরীব হওয়ায় তাঁর উপযুক্ত এমন কোন পোশাক ছিল না, যা পরে এত বড় দাওয়াতের মজলিসে তিনি হাজির হতে পারেন। ফাতেমাকে দাওয়াত করলে সে পুরনো ছেঁড়া-তালি দেওয়া পোশাক পরে আসবে। এতে উম্মে কুলসুমের মান-ইজ্জত চলে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ!) এজন্য তিনি তাকে দাওয়াত করেননি।

ফাতেমা রা. যখন জানতে পারলেন তাঁর আপন বোন মদীনার সব মহিলাকে দাওয়াত করেছেন, কিন্তু তাঁকে দাওয়াত করেননি, তখন তাঁর মনে খুব ব্যথা লাগল। তিনি মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। অপরদিকে দাওয়াতি মেহমানরা যখন উম্মে কুলসূমের বাড়িতে খেতে বসেছে তখন তারা দেখে, পাকানো সব ভাত চাল হয়ে গেছে আর সব গোশত পাথর হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনাটা সম্পূর্ণই কাল্পনিক। ইতিহাস বা সীরাতগ্রন্থের কোথাও এর কোন অস্তিত্ব নেই। উপরন্তু এ বানানো ঘটনার দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.eelm.weebly.com

ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা বিশিষ্ট সাহাবিয়া হযরত উম্মে কুলসুমের ওপর একটা মিথ্যা অপবাদ ও কালিমা লেপন করা হয়, যা নিঃসন্দেহে গোনাহে কবীরা। যারা এগুলো প্রচার করে, শুনে ও বিশ্বাস করে, তারা সবাই এ কবীরা গোনাহে লিপ্ত।

ভুল কথা

তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে

কারও কোন খারাপ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য অনেকে বলে থাকে– 'তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে' অথবা বলে থাকে, 'তোমাকে শনিতে পেয়েছে।'

শরীয়ত গর্হিত একটা বিশ্বাস থেকে এ কথাটার উৎপত্তি। শনি সৌরজগতের একটি গ্রহের নাম, যা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে চলে। কারও কোন ক্ষতি করার মতো শক্তি এর নেই। কিন্তু এসব জ্যোতিষ্ক বা নক্ষত্রপূজারীরা একেক নক্ষত্রকে একেক বিষয়ে শক্তিধর মনে করে। এর মধ্যে কারও ক্ষতি সাধনের জন্য শনিগ্রহকে শক্তিধর মনে করে থাকে। সে হিসাবেই খারাপ অবস্থা বা ক্ষতিকর পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে, 'তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে'।

একজন মুসলমান হিসাবে এ কথাটা আমাদের মুখে উচ্চারিত হওয়া অন্যায়। এ ভুল কথাটা পরিহার করা জরুরি।

ভুল আমল

ইমামকে রুকুতে পেলে তাকবীর বলে হাত বেঁধে কি দাঁড়াতে হয়?

ইমামকে রুকুতে পেলে নিয়ম হল প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তারপর দু'হাত তুলে তাকবীর বলবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। হাত বাঁধবে না। এরপর দাঁড়ানো থেকে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেকেই যে ভুলটা করে থাকে তা হচ্ছে, প্রথম তাকবীর বলে হাত বেঁধে দাঁড়ায়। এর পর তাকবীর বলে রুকুতে যায়। এখানে হাত বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে প্রথম তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। রুকুতে যেতে যেতে তাকবীর বলে। এটাও ভুল। কেননা তাকবীরে তাহরীমার জন্য দাঁড়ানো জরুরি।

www.eelm.weebly.com

সুন্নত

সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা

কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সুন্নত হল পরস্পরে সালাম বিনিময় করা। ছোট হোক, বড় হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, রাজা হোক, প্রজা হোক সবার বেলায় এটিই প্রযোজ্য।

বিদআত

সাক্ষাতে কদমবুসি করা বা সালামের ইশারা করা

সালাম না দিয়ে কদমবুসি করা অথবা হাতে সালামের ইশারা করেই পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়া অথবা সম্মান প্রদর্শনার্থে মাথা নুয়ে অভিবাদন জানানো। এসবই বিদআত। তাই এগুলো পরিহারযোগ্য।

হাদীস নয়

প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী

مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيْهِمْ وَلِيُّ اللهِ، لَا هُمْ يَدْرُوْنَ بِهِ، وَلَا هُوَ يَدْرِيْ بِنَفْسِهِ.

'সমবেত প্রতিটি জামাতেই আল্লাহ্ তাআলার একজন ওলী থাকেন। তারাও জানে না সে কে, এমনকি সে নিজেও জানে না।'

এ কথাটি নিম্নোক্ত শব্দে অধিক প্রসিদ্ধ–

'প্রতি চল্লিশজনে একজন আল্লাহ্র ওলী থাকেন'

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে আবিল ইয্ রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ قَدْ يَكُوْنُوْنَ كُفَّارًا، وَقَدْ يَكُوْنُوْنَ فُسَّاقًا يَمُوْتُوْنَ عَلَى الْفِسْقِ.

অর্থাৎ এটার কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটাও বাতিল। কেননা কখনও গোটা জামাতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক।

মোল্লা আলী কারী রহ.-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ.

'এটা একটা বাতিল কথা এবং এর কোন ভিত্তি নেই।'

www.eelm.weebly.com

–শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া ৩৪৭-৩৪৮, আলমাসনূ ১৬১, আলমাওযূআতুল কুবরা ১০৬, কাশফুল খাফা ২/১৯৪ # জুলাই '০৫ঈ.

ভুল ঘটনা

আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর রূহ ফিরিয়ে দেওয়া

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটা ঈমান বিধ্বংসী মিথ্যা ঘটনা মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে। ঘটনাটা এ রকম–

একবার এক বৃদ্ধার ছেলে মারা যাওয়ার পর সে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর দরবারে এসে হাজির হল। হায়-হুতাশ করতে করতে সে এসে শায়েখের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, মৃত্যুর ফেরেশতা যেন তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়।

মহিলার অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি আশ্বাস দিলেন, তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। সেদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মালাকুল মউতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। মালাকুল মউত সেদিন যতগুলো রূহ কবয করেছিলেন তা একটি থলে ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত জিলানী রহ. তাঁকে ডেকে বললেন, অমুক অসহায় মহিলার ছেলের যে রূহ আজ তুমি কবয করেছ তা ফিরিয়ে দাও। মালাকুল মউত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হুযুর! এ কি সম্ভব? মানুষের একবার মৃত্যু হলে সে কি আর জীবিত হতে পারে?

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ছেলেটির রূহ ফিরিয়ে দিলেন না, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে রূহভর্তি থলেটি কেড়ে নিলেন এবং থলের মুখ খুলে দিয়ে মালাকুল মউত সেদিন যত রূহ কবয করেছিলেন সবগুলো রূহ ছেড়ে দিলেন। ফলে সেদিন যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল তারা সবাই জীবিত হয়ে গেল।

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য ইসলাম-বিদ্বেষীরা এসব ঘটনা তৈরি করেছে। এ-ধরনের ঘটনাকে সত্য বলে ধারণা করলে ঈমানের ক্ষতি হবে।

ভুল আমল

ইমামকে সেজদায় পেলে নিজে নিজে রুকু-সেজদা করা

কিছু লোককে দেখা যায়, জামাত ধরার জন্য যখন তারা মসজিদে গিয়ে

www.eelm.weebly.com

দেখেন ইমাম সেজদা অবস্থায় আছেন, তখন তারা তাকবীর বলে হাত বেঁধে প্রথমত নিজে নিজে রুকু করে। তারপর ইমামের সঙ্গে সেজদায় শরিক হয়। তেমনিভাবে এক সেজদা ছুটে গেলে সে সেজদাও নিজে নিজে আদায় করে দ্বিতীয় সেজদায় ইমামের সঙ্গে শরিক হয়।

এটা ভুল আমল। নিয়ম হল ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সরাসরি সে অবস্থায়ই শরিক হয়ে যাবে। এর আগে শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে উভয় হাত উঠিয়ে হাত ছেড়ে দেবে। এরপর আরেক তাকবীর বলে ইমাম যে অবস্থায় আছে সেখানেই ইমামের সঙ্গে শরিক হয়ে যাবে। হাতও বাঁধবে না, ছুটে যাওয়া অন্য কোন আমলও করবে না। রুকুতে পেলে রাকাত পেল, রুকুতে না পেলে রাকাত পেল না। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

একটি অবহেলা

জুমার নামাযের পর চার রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় না করা

জুমার নামাযের পর মুনাজাত করার জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে দশ-পনের মিনিট অপেক্ষা করতে কারও কোন অসুবিধা বোধ হয় না। কিন্তু মুনাজাতের পর চার রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করতে অনেকেরই ধৈর্যে কুলায় না। অথচ এ সময়ে মুনাজাত এমন কোন জরুরি বিষয় নয়, যা করতেই হবে। আর চার রাকাত সুন্নত হচ্ছে অবশ্যকরণীয় একটি সুন্নত। এ বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের অবহেলা অমার্জনীয়।

সুন্নত

সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা

সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা সুন্নত, মাথার চুল কামিয়ে সে পরিমাণ রূপার মূল্য সদকা করা সুন্নত। আকীকার ক্ষেত্রে ছেলের জন্য দুটো ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবাই করা সুন্নত এবং নববী পদ্ধতি।

বিদআত

জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা

সুন্নত পদ্ধতিতে আকীকা না করে নিজের মনমত কোন দিন জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা। সে অনুষ্ঠানে সুন্নত পরিপন্থী অনেক কাজ করা, যেমন– ১. সাত

www.eelm.weebly.com

দিনের হিসাবের প্রতি খেয়াল না করা, ২. নির্ধারিত দিনে বাচ্চার চুল না কাটা, ৩. সদকা না করা, ৪. বকরি বা ভেড়া জবাই না করা এবং ৫. যশ ও খ্যাতির জন্য যত ধরনের গর্হিত কাজ করতে হয় সব কিছু করা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

একটি অমার্জিত আচরণ

কেউ বাথরুমে বা টয়লেটে গেলে তাকে তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া বা বারবার দরজায় নক করা বড় অন্যায় ও অভদ্র আচরণ। বাইরের ব্যক্তি যে পরিমাণ প্রয়োজনে তাগাদা দিচ্ছে, ঠিক সে পরিমাণ প্রয়োজনেই ভেতরের ব্যক্তি ভেতরে আছে। তাই এ আচরণের কোন মানে হয় না। যে কোন আচরণের আগে এর পূর্বাপর ভেবে দেখা জরুরি। এতে সম্মিলিত জীবনে সবাই শান্তি পাবে।

হাদীস নয়

আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সওয়াব

نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا

'আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আল্লাহ্ তাআলার নিকট ষাট বছরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম।'

লোকমুখে প্রসিদ্ধ উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। কোন এক মিথ্যাবাদী কর্তৃক সামআন ইবনে মাহদি-এর নামে জালকৃত পুস্তকে ছাড়া অন্য কোথাও বর্ণনাটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লামা সাখাবী রহ. ও মোল্লা আলী কারী রহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরাম এটাকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। এ সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়া দ্বীনদার হক্কানি উলামায়ে কেরামের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে অপরিসীম।

–আলমাকাসিদুল হাসানা ৫২২, আলমাওযূআতুল কুবরা ১৩২, কাশফুল খাফা ২/৩১৮, আললুউলুউল মারসূ ৯৬

সামআনের নামে এ জালকৃত পুস্তিকাটির জন্য আরও দ্রষ্টব্য, মীযানুল ইতিদাল ২/২৩৪, লিসানুল মীযান ৩/১১৪, আলমাসনূ ২৪৭ # আগস্ট '০৫ঈ.

www.eelm.weebly.com

ভুল বিশ্বাস

পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরিক হওয়া

সেদিন মনির মিয়ার সঙ্গে চা খেতে খেতে রাশেদ চাচা বললেন, 'যে ব্যক্তি জীবনে কখনও দাড়ি কাটবে না, সে ব্যক্তি পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরিক হতে পারবে।'

এটা একটা ভুল বিশ্বাস। আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের অনেকেই এ ভুল ধারণাটা পোষণ করে থাকে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন।

প্রথমত পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়ের কথাটাই একটা ভিত্তিহীন কথা। এরপর দাড়ি কাটা না কাটার সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। দাড়ি রাখা ও না-কাটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক সহীহ স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। এ-ছাড়া এটি সকল নবী আলাইহিমুস সালামের সুন্নত ছিল। একে মুসলমানের ফিতরাত বা স্বভাব বলা হয়েছে। এ-কথাগুলো বলেই দাড়ি রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উচিত। দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠির কম করা না-জায়েয, এ বিধান সবারই জানা।

ভুল ঘটনা

রাবেয়া বসরীর জাহান্নামের আগুন নেভানো

কোন কোন বক্তার মুখে একটা ঘটনা শোনা যায়, যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঘটনার বিবরণে বলা হয়ে থাকে–

'একদিন রাবেয়া বসরী নাম্নী এক মহিয়সী নারী এক গ্লাস পানি নিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক দৌড়ের গতির দিকে লক্ষ করে পথচারিরা অবাক হয়ে গেল। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওই পানিটুকু নিয়ে এভাবে পেরেশান হয়ে কোথায় দৌড়ে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, শুনতে পেলাম, মানুষ নাকি জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছে, তারা আল্লাহ তাআলার মহব্বতে ইবাদত করছে না। তাই আমি এ পানি নিয়ে যাচ্ছি জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। যেন মানুষ জাহান্নামের আগুনের ভয়ে ইবাদত না করে, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতেই ইবাদত করে।'

এ ঘটনাটা ভিত্তিহীন। নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসগ্রন্থ বা রাবেয়া বসরী রহ.এর ওপর রচিত কোন নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া

www.eelm.weebly.com

যায় না। উপরন্তু এমন ঘটনার কোন যৌক্তিকতাও নেই। কারণ দোযখের ভয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মাঝে অপছন্দনীয় কিছু নেই। তাই কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে জান্নাত-জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকা হয়েছে।

দোযখ আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির স্থান। সুতরাং দোযখকে ভয় করা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলাকেই ভয় করা। তেমনি বেহেশত আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও পুরস্কারের স্থান। তাই বেহেশতের আশা করার অর্থই হল আল্লাহ্ তাআলার রহমতের আশা করা।

ভুল কথা

আল্লাহ্র সহ্য হবে না

কারও অত্যাচারের ভয়াবহতা বা বে-ইনসাফির সীমাতিরিক্ততা প্রকাশ করার জন্য অনেকে বলে থাকে, 'তার এত জুলুম আল্লাহ্রও সহ্য হবে না।'

এ-ভাবে বলা ভুল। কারণ সহ্য না হওয়া একটি দুর্বলতা, যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কোন ব্যাপার ঘটতে পারে না, যা আল্লাহ্ তাআলা সহ্য করতে পারবেন না। আল্লাহ্ তাআলা অন্যায়ের শাস্তি দেবেন। জুলুমের বদলা নেবেন এবং বে-ইনসাফির উপযুক্ত সাজা দেবেন। আল্লাহ্ তাআলা সে ক্ষমতা রাখেন। তাই 'আল্লাহ্র সহ্য হবে না' বা 'সহ্য করবেন না' এ জাতীয় কোন বাক্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

সুন্নত

বিয়ের পর ওলীমা করা

বিয়ের পর সব ধরনের শরীয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ পরিহার করে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ওলীমা করা সুন্নত।

বিদআত

মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানদারিতে বাধ্য করা

নিজের শত শত পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যাওয়া এবং মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানের মেহমানদারি করাতে বাধ্য করা–এটা একটা বিদআত এবং বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত খাবারের বৈধতাও প্রশ্নবিদ্ধ। এসব অবৈধ পদ্ধতি পরিহার করা জরুরি।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়

الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

মসজিদে (দুনিয়াবি) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা সাফ্ফারীনী রহ. বলেন, 'এটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা।' –গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ২/২৫৭–আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

হাফেয ইরাকী রহ. বলেছেন যে, তিনি এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাননি। আল্লামা যাবীদী রহ. বর্ণনাটার ব্যাপারে হাফেয ইরাকী রহ.এর উক্ত অভিমতকে সমর্থন করেছেন। –ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩১–আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

আল্লাহ্র ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হল নামাযের জন্য এবং যিকির, তালীম ও অন্যান্য দ্বীনি আমলের জন্য। একে দুনিয়াবি কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া হারাম। তবে কোন দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্যে অথবা ওযরবশত আরামের জন্য মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবি কোন বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। এর বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। দ্রষ্টব্য, সহীহ বুখারী ১/৬৩, ৬৪ ও ৬৫, মুসাফফা–রদ্দুল মুহতার (শামী) ১/৬৬২, আললুউলুউল মারসূ ৭৮ # সেপ্টেম্বর '০৫ঈ.

ভুল বিশ্বাস

পৃথিবী ষাঁড়ের শিংয়ের ওপর বিদ্যমান

পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে এখনও কারও মাঝে এ ভুল বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, পৃথিবী একটা ষাঁড়ের শিংয়ের ওপর বিদ্যমান। সে ষাঁড়টি একটি মাছের পিঠের ওপর দণ্ডায়মান। ষাঁড়ের একটি শিং ব্যথা হয়ে গেলে যখন সে পৃথিবীকে অন্য শিংয়ে স্থানান্তর করে তখন ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়।

এ বিশ্বাসটা একেবারেই অবাস্তব, বরং পৃথিবী তো হল নিজ গতিতে ঘূর্ণায়মান, যার মাঝে ষাঁড়ের শিংয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। আর ভূকম্পন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কীকরণমূলক নিদর্শনাবলির একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুমে নির্দিষ্ট এলাকার

www.eelm.weebly.com

মধ্যে সংঘটিত হয়। উপরোক্ত ভুল বিশ্বাস হিসাবে পুরো পৃথিবীতে একসাথে ভূমিকম্প হওয়ার কথা ছিল। অথচ এমনটি হয় না।

আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে বাহ্যিক যেসব কারণ দর্শানো হয় ষাঁড়ের শিংয়ের সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। বলাবাহুল্য, কুরআন হাদীস এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে কোন ধরনের ভ্রান্ত ও অলীক কল্পকাহিনীর স্থান নেই। ভিত্তিহীন এসব উদ্ভট বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

ভুল প্রচলন

কবরের প্রথম কোপের মাটিকে কবরের নিশানা হিসাবে ব্যবহার করা

কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, কবর খোঁড়ার সময় প্রথম কোপে যে মাটির চাকাটি তোলা হয় তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রথম কোপের মাটি বিশেষ হেফাযতে রেখে, লাশ দাফন শেষ হলে সে চাকাটি মুরদারের মাথা বরাবর রেখে দেওয়া হয়।

প্রথম কোপের মাটির প্রতি এ-ধরনের বিশেষ গুরুত্বের কোন ভিত্তি নেই। এক্ষেত্রে যদি কবরের নিশানা রাখার প্রয়োজন হয়, তা হলে যেকোন পাথর, ইট বা মাটির চাকা দিয়েই চিহ্ন রাখা যায়।

নামের উচ্চারণের ভুল

হেল্লাল/বেল্লাল

এ উচ্চারণ দুটো ভুল। শব্দ দুটোর উচ্চারণ যথাক্রমে হেলাল ও বেলাল। শব্দ দুটোর বিকৃত উচ্চারণের কারণে অর্থগত ভুলের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামের সাথেও এক ধরনের বেয়াদবি হয়। সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকের এ নাম রয়েছে।

হাদীস নয়

اَلْأَذَانُ جَزْمٌ، وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ، وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ

আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে

মাসআলা হল আযান ও ইকামতের শব্দগুলোর শেষ অক্ষর সাকিন হবে। আর ইকামতের পদ্ধতি হল– প্রথম চার তাকবীর এক সাথে বলবে। এর পরের

www.eelm.weebly.com

বাক্যগুলো শেষ তাকবীরের আগ পর্যন্ত দুটো বাক্য একসাথে বলবে। যেমন– 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার একসাথে বলবে। আর শেষ তাকবীর দুটো ও কালেমা তাইয়েবা একসাথে পড়বে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বাক্যের শেষ হরফে সাকিন করবে। এ-সব কিছুই ঠিক, কিন্তু কেউ কেউ এই মাসআলাটির পক্ষে উপরোক্ত উক্তিটিকে দলিল হিসাবে পেশ করে। আবার কেউ মনে করে, এটি নবীজির হাদীস।

বাস্তবে এটি হাদীস নয়, বরং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (ইন্তেকাল ৯৫ হি.)-এর উক্তি। আল্লামা সাখাবী রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ ... إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

'মারফূ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। ... বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯৩

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা লাখনোভী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম একই মত পোষণ করেছেন।

মোটকথা, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় এবং বাক্যটির যে অর্থ করা হয় তাও ঠিক নয়। কেননা, সাধারণত মনে করা হয় যে, এখানে জযম শব্দটি সাকিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উক্তিটির এরূপ অর্থ করা হয় যে, 'আযান, ইকামত ও তাকবীরের শেষ অক্ষর সাকিন করে পড়তে হবে।'

অথচ জযম শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে এই অর্থে ব্যবহৃত হত না; বরং এ স্থলে জযম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অস্থানে মদ না করা। অর্থাৎ আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোতে যেখানে মদ বা টান নেই, সেখানে টেনে না পড়া এবং যেখানে টান আছে সেখানে মদ করতে অতিরঞ্জন না করা। অবশ্য একথা ঠিক যে, আযান-ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোর শেষ বর্ণ সাকিন হবে। তবে এ মাসআলাটির দলিল ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্ত কথা নয়; বরং মাসআলাটির ভিন্ন দলিল রয়েছে, যা মাআরিফুস সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য, আততালখীসুল হাবীর ১/২২৫, আলহাভী লিল-ফাতাভী ২/৭১, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৮, আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ১০৪, আলমাসনূ ৮৩, মাওযূআতে কুবরা ৫৬, ফাতাওয়া শামী ১/৩৮৬, ৪১৮ # অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ঈ.

www.eelm.weebly.com

ভুল আমল

গোসল শেষে ওযু করা

অনেকে গোসল শেষ করে আবার পুরো ওযু করে। ওযু কেন করেছে জিজ্ঞাসা করলে বলে থাকে, নামায পড়ব তাই। এর মানে হল তারা মনে করে নামায পড়ার জন্য গোসল করাটা যথেষ্ট হয়নি। তাই নামাযের জন্য আবার ওযু করে থাকে। এটা একটা ভুল আমল। গোসলের পর ওযু করার কোন বিধান নেই। ফরয গোসল হলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয এবং পূর্ণ ওযু করে নেওয়া সুন্নত, যা গোসলেরই একটি অংশ। তাই যথাযথভাবে গোসল করার পর নতুন করে আবার ওযু করা ঠিক নয়।

ভুল প্রথা

স্বামী মারা গেলে স্বামীর গোসলের সঙ্গে স্ত্রীকে গোসল করানো

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বর্ণ-অলঙ্কার ও সাজসজ্জা ত্যাগ করে ইদ্দত পালন শুরু করবে–এ বিধান শরীয়তে আছে, কিন্তু কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, স্বামীর লাশ গোসল করানোর সাথে সাথে স্ত্রীকেও গোসল করানো জরুরি মনে করা হয় এবং যেভাবে পুরুষরা স্বামীর লাশকে গোসল দেয়, অনুরূপ মহিলারা স্ত্রীকে গোসল দিয়ে থাকে। শরীয়তে এ প্রথাটার কোন ভিত্তি নেই।

এক্ষেত্রে আরেকটু অতিরিক্ত সংযোজনও রয়েছে। তা হচ্ছে, স্ত্রীকে গোসল করানোর পর যে সাদা শাড়িটা পরতে দেওয়া হবে, তা স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা নিয়ে আসতে হবে। এ প্রথাটারও শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। এ-ধরনের ভিত্তিহীন বিষয়গুলোর পেছনে সময় ব্যয় না করে শরীয়তে যে কাজগুলো করতে বলা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া জরুরি।

একটি অমার্জনীয় আচরণ

বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা

বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটা ঘৃণিত কাজ। তাই এমনটা করা কখনও উচিত নয়। কিন্তু এ অপছন্দনীয় কাজটা মারাত্মক অপরাধে পরিণত হয়, যখন কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করে, যেখানে বসে পেশাব করার ব্যবস্থা রাখা আছে। একটা পেশাবখানা সাধারণত বেশি বড় হয় না। কাপড় গুটিয়ে কোন রকমে বসলেও দেয়ালে কাপড় বা

www.eelm.weebly.com

হাঁটু লেগে যায়। এমন জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবের ছিটায় দেয়াল নষ্ট হবে। একজন মানুষ নিশ্চিন্তে সেখানে বসে পেশাব করতে পারে না। সাধারণত জনগণের ব্যবহারের জন্য যেসব শৌচাগার তৈরি করা হয়ে থাকে, সেসব জায়গায় এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এসব ক্ষেত্রেই আমাদের অবহেলা বেশি।

সুন্নত

মৃত ব্যক্তির গোনাহমাফি, কবরে শান্তি ইত্যাদির জন্য দুআ করা

কেউ মারা গেলে যেহেতু তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তাই জীবিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হল তেলাওয়াত, তাসবীহ, নামায, দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা; মৃত ব্যক্তির গোনাহমাফি, কবরে শান্তি ইত্যাদির জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করা। এ-ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তির ওপর মৃত ব্যক্তির কোন অবদান আছে, তার ওপর এ দায়িত্ব বেশি। তাই পরিবারের লোকদের উচিত, সবসময় তার জন্য দুআ করা।

বিদআত

কবরের পাশে লোক দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করানো

কেউ মারা যাওয়ার পর তার কবরের পাশে লোক দিয়ে পর্যায়ক্রমে কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করানো।

ভুল কথা

সব ধরনের দ্বীনি শিক্ষাকে হাফেযি পড়া বলা

সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে শোনা যায়, তারা কোন বড় আলেমের সঙ্গে কথা বলতে গেলে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, 'আপনি কি হাফেযি লাইনে পড়াশোনা করেছেন?' 'আপনি কি হাফেযি লাইনে ডিগ্রি নিয়েছেন?' কথাবার্তার সময় বলে থাকেন, 'ফতোয়া দিতে হলে হাফেযি লাইনে পড়াশোনা করতে হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একথাগুলো সবই ভুল। দ্বীনি শিক্ষার যেকোন পর্যায়ের নামই হাফেযি পড়া নয়, বরং দ্বীনি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য থেকে এটি প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিক্ষা। একটি শিশু মক্তবের পড়াশোনা শেষ করে দু'তিন বছরে ত্রিশ

www.eelm.weebly.com

পারা কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করার যে কোর্সটি সম্পন্ন করে থাকে, তার নাম হল হাফেযি পড়া।

হাদীস নয়

আযানের সময় কথা বললে ঈমান যাওয়ার আশংকা

مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيمَانِ

'যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে, তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আযানের সময় নিয়ম হল আযানের জবাব দেওয়া। মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে, শ্রোতারাও সে শব্দগুলোই বলবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (হায়্যা আলাস্‌সালাহ) এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হায়্যা আলাল ফালাহ) বলার পর শ্রোতারা لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়বে। তার পর আযান শেষে যেকোন দরূদ পাঠ করবে। অবশেষে আযানের এ দুআ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

এগুলো সবই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে 'আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে'–এ কথাটা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা সাগানী রহ. একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ১২, কাশফুল খাফা ২/২২৬, ২৪০ # ডিসেম্বর '০৫ঈ.

ভুল প্রচলন

ওকিল বাবা

কোন কোন এলাকায় বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি (ইযন) আনার জন্য একজন লোক ঠিক করা হয়, যে মেয়ের বাপ ভাই ব্যতীত অন্য কেউ হয়। এ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকেই ঠিক করা হয়। এ ব্যক্তিকে বলা হয় ওকিল বাবা। এ ব্যক্তি মেয়ে থেকে বিয়ের অনুমতি এনে বিয়ের মজলিসে মেয়ের পক্ষে ওকালতি করে। এ ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে বাপের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া-

www.eelm.weebly.com

তোহফায় অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি মেয়ের মাহরামদের মতো গণ্য হয় এবং তার সাথে কোন ধরনের পর্দার প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওকিল বাবার সাথে বর-কনে দুপক্ষেরই দুজন করে সাক্ষী যায় এবং মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি আনার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকে। এ সাক্ষী থাকাকেও জরুরি মনে করা হয়।

এটা একটা ভুল প্রথা। এ প্রথার মাঝে অনেক ভুল ও গর্হিত কাজের সমাবেশ ঘটে। প্রথমত ইসলামী বিয়েতে মেয়ের মাহরাম থাকা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে কোন গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকে ওকিল হিসাবে মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি আনার জন্য নির্ধারণ করার কোন বিধান নেই।

দ্বিতীয়ত ধারণাভিত্তিক একটা প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে একজন গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকে মাহরামের স্থলাভিষিক্ত করা এবং তাকে বাপের মতো মনে করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এসব পরিহার করা জরুরি।

তৃতীয়ত মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি আনার সময় দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকা জরুরি–এ কথাও ঠিক নয়। শুধু একজন তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিলেই হয়। সাক্ষী উপস্থিত থাকার বিষয়টি আকদের ক্ষেত্রে জরুরি, অনুমতি আনার ক্ষেত্রে নয়।

ইযন আনার উক্ত পদ্ধতি ভিত্তিহীন, তা ছাড়া এটা এমন এক কুপ্রথা, যার কারণে পর্দার মতো শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়। তাই এসব ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত।

জুমার নামাযের নিয়ত

আমাদের দেশের কোন কোন এলাকায় জুমার নামাযের জন্য নিম্নোক্ত নিয়তটি পড়তে হবে বলে মনে করা হয়–

نَوَيْتُ أَنْ أُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِأَدَاءِ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ اللهِ تَعَالَى، اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ أَكْبَرُ.

'আমি জুমার দুই রাকাত নামাযের মাধ্যমে যোহরের ফরয নামাযের যিম্মা আদায় করার নিয়ত করছি এবং আমি এ ইমামের পেছনে ইকতেদা করছি, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে।'

www.eelm.weebly.com

মূলত হাদীস এবং শরীয়তের অন্য কোন দলিলে এ-ধরনের নিয়তের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এ-ধরনের কিছু পড়তে হবে এমন বিধানও নেই।

উল্লিখিত কথিত নিয়তে রয়েছে, 'আমি জুমার মাধ্যমে যোহরের ফরয নামাযের যিম্মা আদায় করার নিয়ত করছি।' এ কথা সঠিক নয়। কারণ যাদের ওপর জুমা ফরয, জুমা আদায় করাই তাদের দায়িত্ব। এমন নয় যে, তাদের ওপর যোহর ফরয ছিল আর জুমার মাধ্যমে সে ফরয আদায় করছে। তাই কথিত নিয়তের এ কথাগুলো স্পষ্ট ভুল।

বস্তুত প্রত্যেক নামাযের মতো জুমার নামাযেও নিয়তের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হবে যে, আমি জুমার নামায পড়ছি।

ভুল মাসআলা

নামাযে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়লে কি নামায ভেঙে যায়?

অনেকের মুখে বলতে শোনা যায়, নামাযের যেকোন অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি আপন জায়গা থেকে নড়ে গেলে নামায ভেঙে যায়। নামাযের জন্য এটি খুঁটি স্বরূপ। এ ধারণাটা ভুল। বিষয়টি মূলত এমন নয়, বরং বিনা প্রয়োজনে নামাযে শরীরের যেকোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করাই মাকরূহ। এ ব্যাপারে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবে পূর্ণ একটি সেজদা অবস্থায় যদি উভয় পা একসাথে উঠে থাকে, তাহলে নামায ভেঙে যাবে।

ভুল বিশ্বাস

কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির মুরগি/হাঁস কুরবানী দেওয়া

গরু বা ছাগল কুরবানী দিতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। মনে করা হয়, যারা কুরবানী দিতে অক্ষম তারা কমপক্ষে একটি মুরগি বা হাঁস কুরবানী দেবে। এতে সে কুরবানীর সওয়াব পাবে। তাই এমনটি করা উচিত।

এ ধারণা ভুল। শরীয়তে কুরবানীর জন্য যেসব পশু নির্ধারিত আছে শুধু সেগুলো দ্বারাই কুরবানী দেওয়া যাবে, অন্য কিছু দিয়ে কুরবানীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা হলে কুরবানীর সওয়াব হবে–এ ধারণা ভিত্তিহীন। এ-ধরনের বিশ্বাস ও প্রচলন পরিহারযোগ্য।

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা

পশু জবাইয়ের সময় কুরবানীদাতাদের নাম পড়া কি জরুরি?

সাধারণ মহলে দেখা যায়– কুরবানীর পশু জবাই করার সময় কুরবানী-দাতাদের নাম পড়াকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্বও দেওয়া হয়। অথচ জবাই করার সময় এভাবে নাম পড়া জরুরি নয়। উপরন্তু এতে কুরবানীর পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবে পশুটি কার কার কুরবানী হিসাবে জবাই করা হচ্ছে তা সুনির্দিষ্ট থাকা জরুরি।

হাদীস নয়

প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ পালন

'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কা'বাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতি বছর ছয় লক্ষ হাজী হজ পালন করবে। হাজীর সংখ্যা কম হলে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কা'বা শরীফকে হাশরের ময়দানে নববধূর মতো সজ্জিত করে উপস্থিত করা হবে। আর যারা হজ পালন করেছে তারা কা'বার আঁচল ধরে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। এরপর কা'বা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারাও কা'বার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

কা'বা শরীফের বহু মার্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই এবং তা হাদীস হিসাবে প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী রহ. বলেন–

لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا

'আমি এর কোন ভিত্তিই পাইনি।'–তাখরীজে ইহইয়া–ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৫২ মোল্লা আলী কারী, আল্লামা কাউকজী, মুরতাজা যাবীদী এবং আল্লামা শাওকানী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইরাকী রহ.-এর কথা সমর্থন করেছেন। –আলমাসনূ ৬৩, আললুউলুউল মারসূ ২৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৪/২৭৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৪২ # জানুয়ারি '০৬ঈ.

ধর্মের বাপ/ভাই

আমাদের দেশের প্রায় জায়গায়ই দেখা যায়– ধর্মের বাপ বা ধর্মের ভাই বানানোর একটা প্রচলন রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারও বাপ না থাকলে

www.eelm.weebly.com

বা ভাই না থাকলে গায়রে মাহরাম কোন ব্যক্তিকে বাপ হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয় বা ভাই বানিয়ে নেওয়া হয়। আবার কখনও দেখা যায়– বাপের সমবয়সী কারও কোন বিশেষ অনুগ্রহ কারও ওপর থাকলে তাকে ধর্মের বাপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এমনিভাবে ভাইয়ের সমপর্যায়ের কারও কোন বড় ধরনের অনুগ্রহ নিজের ওপর থাকলে তাকে বড় ভাই হিসাবে মনে করা হয়। এ উভয় ক্ষেত্রে যাকে ধর্মের বাপ বা ভাই বানানো হয়েছে, তার সঙ্গে নিজের বাপ বা ভাইয়ের মতো আচরণ করা হয়। পুরুষ-মহিলার ক্ষেত্রে পর্দার কোন তোয়াক্কা করা হয় না। এমনিভাবে একজন গায়রে মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে যেসব আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো এক্ষেত্রে মানতে হবে না বলে মনে করা হয়।

এ প্রচলনটা সম্পূর্ণই ভুল। শরীয়তের বাতানো গণ্ডির বাইরে নিজের মতে কাউকে বাপ বা ভাই বানিয়ে নিলেই সে বাপ বা ভাই হয়ে যায় না। কোন কারণবশত কাউকে মুরুব্বী হিসাবে গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু এর দ্বারা শরীয়তের স্বীকৃত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার অধিকার কারও নেই। এ ভিত্তিতে অনেকে ধর্মের ভাই বা বাপকে উত্তরাধিকারের বেলায়ও অংশীদার মনে করে থাকে। এরও কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

সুন্নত

মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় সালাম দেওয়া

যে কোন মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সুন্নত আমল হল কবরবাসীদের লক্ষ করে এভাবে সালাম দেওয়া–

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ! أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

যদি সম্ভব হয় সূরা ফাতেহা, দরূদ ইত্যাদি পড়ে কবরবাসীর জন্য ঈসালে সওয়াব করা এবং সবার জন্য মাগফেরাতের দুআ করা।

বিদআত

কবর অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া ইত্যাদি

কোন কবর বা মাযার অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া, মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়া, মাজারের দিকে হাত জোড় করে বাড়িয়ে দেওয়া এবং মাথাকে

www.eelm.weebly.com

পেছনে না ফেলার কসরত করা এবং সামনে রেখে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি আমল বিদআত এবং অনেক বড় গোনাহ। ইসলামে এসব আমল ও ধারণার কোন ভিত্তি নেই।

হাদীস নয়

আহারের শুরু ও শেষ লবন দিয়ে করা। কারণ লবন সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা পাগলামি, কুষ্ঠ, শ্বেত ...

হাদীস হিসাবে এর যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে। কিন্তু বাস্তবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। এটা একটা জাল বর্ণনা।

ইমাম বায়হাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কায়্যিম, হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আররাক রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম একে জাল বলেছেন। –দালায়েলুন নুবুওওয়া ৭/২২৯, আলমানারুল মুনীফ ৫৫, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৩৭৪-৩৭৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/৪৩, ৩৩৯

কেউ কেউ বর্ণনাটাকে এভাবেও বলে থাকে, 'যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায় সে তিনশ ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল রোগ।'

এটাও হাদীস নয়। সম্পূর্ণ জাল ও ভিত্তিহীন কথা। হাফেয সুয়ূতী রহ. এবং আল্লামা ইবনে আরারাক রহ. একে জাল বলেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১৪২, আলমাসনূ ৭৪ (টীকা) তানযীহুশ শরীয়া ২/২২৬

উল্লেখ্য, লবণ খাওয়ার কোন উপকারিতা যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়, তবে তা আপন জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেহেতু উক্ত কথাগুলো প্রমাণিত নেই, তাই এগুলোকে হাদীস বলার কোন অবকাশ নেই। # ফেব্রুয়ারি '০৬ঈ.

ভুল ধারণা

ইসলামের ফরয কি সর্বমোট ১৩০টি?

'মকসুদুল মুমিনীন'-এর মতো কিছু অনির্ভরযোগ্য বইপত্রের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণা বেশ প্রচলিত যে, ইসলামের ফরয সর্বমোট ১৩০টি। যথা ত্রিশ রোযা ৩০ ফরয, ত্রিশ রোযার ত্রিশ নিয়ত ৩০ ফরয; চার মাযহাব

www.eelm.weebly.com

৪ ফরয, চার বংশ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম) ৪ ফরয ইত্যাদি।

এই ধারণা ঠিক নয়। ইসলামে 'ফরযের' সংখ্যা ১৩০ থেকে অনেক বেশি। তার পর যে বিষয়গুলোকে এখানে ফরয বলা হয়েছে, সেগুলোর সবকটিকে ফরয বলাও ঠিক নয়। যেমন চার মাযহাবকে চার ফরয বলা হয়েছে। এখানে সঠিক কথা হল, ফিকহের প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবই হক এবং আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাআতের পথ ও মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দায়িত্ব হল কর্মক্ষেত্রে কোন একটি ফিকহি মাযহাব অনুসারে কুরআন হাদীস মোতাবেক আমল করা। তাই কোন ফিকহি মাযহাবের তাকলীদ তো জরুরি, কিন্তু এজন্য 'চার মাযহাব'কে 'চার ফরয' সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

অনুরূপ ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা ফরয। কিন্তু 'হাশেম' পর্যন্ত তাঁর বংশলতিকা জানা বা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ফরয গণ্য করা ভুল। তবে মনে রাখতে হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

ভুল মাসআলা

হাঁটুর কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙে যাবে

এই ভুল মাসআলাও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে।

এটা ঠিক যে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা জরুরি। এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, পা ধোয়ার সময় বা অন্য কোন সময় যেন হাঁটু থেকে কাপড় সরে না যায়, কিন্তু কোন সময় কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙে যাবে এ-কথা ঠিক নয়। কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন– বেহেশতি যেওর ইত্যাদি থেকে ওযু ভঙের কারণসমূহ ভালোভাবে মুখস্থ করে নেওয়া উচিত।

ভুল প্রচলন

দস্তরখান 'লাল রঙ' হওয়া কি সুন্নত?

কোন কোন মানুষ দস্তরখান লাল রঙের হওয়াকে সুন্নত মনে করেন এবং এটা খুব সওয়াবের কাজ মনে করেন। এই ধারণা অমূলক। এর কোন ভিত্তি নেই।

www.eelm.weebly.com

এ প্রসঙ্গে কোন কোন মানুষের মুখে যে রেওয়ায়েত শোনা যায়, তাও একদম ভিত্তিহীন।

সুন্নত

পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া

অনেক জায়গায় দস্তরখানের খুব গুরুত্ব আছে। এটি প্রশংসনীয়, কিন্তু এরচেয়েও বড় একটি সুন্নতের ব্যাপারে অবহেলা করা হয়; সুন্নতটি হল- কোন লোকমা, তরকারি বা খাদ্যের অংশবিশেষ হাত থেকে পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া। ধুলোবালি লেগে গেলে তা পরিষ্কার করে খাওয়া। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত, কিন্তু এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। পড়ে যাওয়া খাবারের অংশ বিশেষকেও হাড্ডি, মাছের কাঁটা ইত্যাদির সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়। এটা গোনাহের কাজ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

হাদীস নয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন

কোন কোন মানুষের মুখে শোনা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন। এই রেওয়ায়েত সহীহ্ নয় এবং এটা হাদীস নয়। মহিলাদেরকে হস্তলিপি শেখানো নাজায়েয নয়, বরং তাদেরকে কুরআন ও ঈমান শেখানো, দ্বীনের তালীম দেওয়া ফরয। দ্বীনদারি ও আল্লাহ্ভীতি থাকলে লেখালেখির যোগ্যতাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করবে না, নতুবা পুরুষরাও তো তাদের যোগ্যতা পাপের কাজে ব্যবহার করতে পারে। –আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৯২-৯৩, লিসানুল মীযান ২/৪৮০, ইমদাদুল আহকাম ১/২১৪-২১৫ # মার্চ '০৬ঈ.

ভুল রীতি

সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা

কোন কোন মানুষকে সালাম বা মুসাফাহার পর নিজ বুকে হাত রাখতে দেখা যায়। এ কাজকে যদি সালাম-মুসাফাহার সুন্নত নিয়মের অংশ মনে করা হয় তা হলে এটা বিদআত আর এমনি করা হলে এটা একটা অনর্থক কাজ।

www.eelm.weebly.com

মহব্বতের প্রকাশ তো সালাম-মুসাফাহার মাধ্যমেই হয়ে গেল। বাড়তি কিছুর তো প্রয়োজন নেই। মোটকথা, এটা সংশোধনযোগ্য।

ভুল ধারণা

রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া বা আয়না দেখা কি অশুভ?

কোন কোন মহিলার মনে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া কিংবা আয়না দেখা অশুভ বা অকল্যাণকর। এই ধারণা ভিত্তিহীন। যখনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন দেখা দেবে, রাতে হোক বা দিনে, ঘর-দোর ঝাড়ু দেওয়া যাবে; তেমনি আয়না দেখার বিষয়টিও।

ভুল নিয়ম

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করা

জামাতের কাতার সোজা করার সময় কেউ কেউ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করে। এ নিয়মটা ভুল। কাতার সোজা করার নিয়ম হল কাঁধ, টাখনু বা পায়ের গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ানো। এ-ছাড়া কাতার সোজা হয় না।

অনেকে মনে করে, নামাযে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়ানো মারাত্মক অপরাধ। আমাকে একবার এক নামাযী বলেছিলেন, 'জাহাজের নোঙ্গরের মতো পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্থির রাখতে হবে।' আসলে এটা একটা বাড়াবাড়ি। নামাযে ধীরস্থির থাকা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথেই সম্পৃক্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলির কোন বিশেষত্ব এখানে নেই। বিনা প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে শরীরের কোন অঙ্গই নাড়ানো ঠিক নয়।

একটা প্রচলিত মারাত্মক গোনাহ

মামি, চাচি ও সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে পর্দা না করা

কোন কোন মানুষ মামি, চাচি ও সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে পর্দা করাকে জরুরি মনে করে না। তারা বলে, এদের সঙ্গে পর্দা নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এরা গাইরে মাহরাম এবং এদের সঙ্গে পর্দা করা জরুরি।

তেমনি খালু, ভগ্নিপতি, দেবর, স্বামীর বড় ভাই, চাচাশ্বশুর, মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর সবাই গাইরে মাহরাম। এদের সবার সঙ্গেই পর্দা করা জরুরি। এটা মনে করা যে, এদের সঙ্গে পর্দা নেই, বুঝে-শুনে বললে কাফের হয়ে যাওয়ার

www.eelm.weebly.com

আশংকা রয়েছে। যদি সঠিক মাসআলা জানা থাকে এবং তা স্বীকারও করে, পাশাপাশি উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করে তবে তা অনেক বড় গোনাহ।

হাদীস নয়

উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন...

কিছু লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'শবে মেরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, আমার উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন, যাতে তারা অন্য উম্মতদের সামনে লজ্জিত না হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, জী না, এরা আমার বিশিষ্ট বান্দা। তাদের ভুলত্রুটি আপনাকেও জানাতে চাই না। এবার নবীজি আরয করেন, আমার গোনাহগার উম্মতের কী হবে? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন আমি রহীম ও মেহেরবান এবং আপনিই সুপারিশকারী, তা হলে আর ভয়ের কী আছে?'

এ-ধরনের কথাবার্তা কোন কোন মানুষ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করে। মনে রাখতে হবে, এগুলো হাদীস তো নয়ই, ঐতিহাসিক বর্ণনাও নয়। এগুলো হল মনগড়া কাহিনী, মিথ্যুকরা এগুলো তৈরি করে হাদীস নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ১৭৯

সহীহ হাদীস

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'হে কুরাইশ, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে বনু আব্দে মানাফ, (শুনে রেখো) আল্লাহ্র কাছে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে সাফিয়্যা, (নবীজির ফুফু) আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, সম্পদ চাইলে বল, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে আমি তোমার কোন উপকারে আসব না।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭১, সহীহ মুসলিম ২/১১৪

অন্য হাদীসে এসেছে, 'হে ফাতেমা, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই।' –সহীহ মুসলিম ২/১১৪

www.eelm.weebly.com

সারকথা হল নিজের ঈমান আমল ঠিক করা, আখলাক দুরস্ত করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, ফরয-ওয়াজিবসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। শুধু এ-কথার ওপর বসে থাকার কোন সুযোগ নেই যে, আমরা তো খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। কারণ শরীয়তের ব্যাপারে এ রকম বেপরোয়া হলে অনেক সময় মৃত্যুকালে ঈমান নসীব হয় না। আল্লাহ্ না করুন, যদি এমন হয়ে যায়, তবে তো নবীজির সুপারিশও পাওয়া যাবে না। এ-ছাড়া প্রত্যেক মুমিন প্রথম সুযোগেই নবীজির সুপারিশে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং অনেকে দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর তাঁর সুপারিশে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ্ না করুন, যদি আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

তাই আমাদেরকে প্রথম সুযোগেই সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার জন্য ঈমান দুরস্ত করার এবং বেশি বেশি আমল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে নাজাত আমল দ্বারা হবে না, নাজাত পাওয়া যাবে আল্লাহ্ তাআলার রহমত দ্বারা। আর এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নিজের আমল সংশোধনের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া বান্দাকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত করে। # এপ্রিল '০৬ঈ.

ভুল ধারণা

একসঙ্গে মুনাজাত শুরু এবং শেষ করা

সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাতের ব্যাপারে কিছু লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, তারা একইসঙ্গে মুনাজাত শুরু করা এবং শেষ করাকে জরুরি বা সুন্নত মনে করে। এমনকি এক জায়গায় এমনও ঘটেছে যে, এক ব্যক্তি তাসবীহ-তাহলীল পড়ছিল আর ওদিকে মুনাজাত শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ওই ব্যক্তি তাসবীহ-তাহলীল পুরো করার মধ্যে মগ্ন ছিল। পাশের মাসবূক মুসল্লি তার ছুটে যাওয়া নামায আদায় করছিল। সে নামাযে থেকেই ওই ব্যক্তিকে মুনাজাত শুরু হওয়া সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ইঙ্গিত করছিল। তবে বাঁচা গেছে যে, সে নিজে নামায ছেড়ে মুনাজাতে শরিক হয়নি এবং এ কথা বলেনি যে, আগে মুনাজাত করে নিই, অবশিষ্ট নামায পরে পড়ে নেব। এমন অনেক সময়ই হয় যে, কারও মুনাজাতে মন নিমগ্ন হয়েছে, সম্মিলিত মুনাজাত শেষ হওয়ার পরও সে নিজের মুনাজাতে রত রয়েছে। আর আশ-

www.eelm.weebly.com

পাশের লোকেরা পরস্পরে ইঙ্গিত করে হাসছে। তারা ভাবছে যে, এই বেচারা মুনাজাত শেষ হওয়ার কথা জানতেই পারেনি।

সম্মিলিত মুনাজাত অবশ্যই একটি ভালো আমল। (যদি তাতে কোন গলত রসম-রেওয়াজ বা গর্হিত কাজের মিশ্রণ না ঘটে।) হাদীস শরীফে এসেছে–

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ

'যখন কিছু লোক সমবেত হয় এবং তাদের কেউ দুআ করে আর অন্যরা আমীন বলে, তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাদের দুআ কবুল করেন।' –মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৪১৭

বোঝা গেল, সম্মিলিত দুআ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এটা কোথাও নেই যে, সম্মিলিত দুআয় সবার শামিল হওয়া জরুরি। আর এটাও কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, যে তাতে শামিল হবে তাকে অন্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে শুরু করতে হবে এবং একই সঙ্গে শেষও করতে হবে, বরং সে যেকোন তাসবীহ-তাহলীল বা অন্য কোন আমলে মগ্ন থাকতে পারে। দেরিতে শামিল হতে পারে আবার মুনাজাতে নিমগ্ন হয়ে গেলে বা আল্লাহ্ তাআলার কাছে কামনার আরও কিছু থেকে থাকলে সে দেরিতে শেষ করতে পারে। এতে কোন ধরনের অসুবিধা নেই এবং এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই যে, এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে বা তাকে মুনাজাত শেষ করার জন্য ইঙ্গিত করতে হবে।

এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমাদের কোন এক বুযুর্গ বলে থাকেন, 'দুআয় ইমামতি নেই।' অর্থাৎ দুআয় অংশগ্রহণকারীদের মুক্তাদিদের মতো এক ব্যক্তিকে অনুসরণে বাধ্য থাকতে হয় না।

ভুল প্রথা

অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া

হাদীস শরীফের শিক্ষা হল অধিক পরিমাণে সালাম আদান-প্রদান করা। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মাঝে পরিচয় থাকুক বা না থাকুক, পরস্পরে সালাম দাও।' কিন্তু আজকাল নিয়ম উল্টো হয়ে গেছে। যার সঙ্গে পরিচয় নেই তাকে সালাম দেওয়া হয় না। কখনও এমন হয় যে, সালাম অপরিচিত ব্যক্তি দিলে তার উত্তরও দেওয়া হয় না। আর যার সঙ্গে পরিচয় আছে সে

www.eelm.weebly.com

যে-ই হোক, তাকে আগে আগে সালাম দেওয়া হয়। এরূপ ভেদাভেদ না করে সালামের ব্যাপক প্রচলন করা উচিত।

সালামে 'ভিআইপি নিয়ম' চালু না হওয়া উচিত

আগে আগে সালাম দেওয়া তো দূরের কথা কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়ার মাঝেও সেই 'ভিআইপি নিয়ম' অবলম্বন করা হয় এবং কখনও শুধু মাথা হেলানো পর্যন্তই শেষ। অথচ প্রত্যেক মুসলমানের সালামের জবাব দিতে হয় এবং স্পষ্ট আওয়াযে জবাব দিতে হয়। কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই বলা উচিত, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ।'

ভুল পদ্ধতি

সালাম দেওয়ার সময় মাথা ও সিনা ঝুঁকিয়ে দেওয়া

কোন কোন লোককে দেখা যায়– তারা বড় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার সময় মাথা নয় বরং সিনাও ঝুঁকিয়ে দেয়। এটা ভুল নিয়ম। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

হাদীস নয়

মদীনা মক্কা থেকে উত্তম

কতক লোককে বলতে শোনা যায় এবং কেউ কেউ একে হাদীসও মনে করে থাকে যে, মদীনা মক্কা থেকে উত্তম। অথচ এটা কোন হাদীস নয় এবং কোন দলিল দ্বারাও এটা প্রমাণিত নয়; বরং দলিল-প্রমাণ দ্বারা মক্কার শ্রেষ্ঠত্বই সু-প্রমাণিত।

لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ وَقَدْ صَحَّ فِيْ مَكَّةَ خِلَافُهُ

–মীযানুল ইতিদাল ৩/৫৯৬, লিসানুল মীযান ৭/২৮৬ # মে-জুন '০৬ঈ.

ছাতায় অমঙ্গলের বিশ্বাস একটা ভিত্তিহীন কল্পনা

১ মে '০৬ ঈ. তারিখে দৈনিক প্রথম আলো নিম্নের খবরটি ছেপেছে–

'ছাতায় অমঙ্গল! বৈশাখ মাসে ছাতা নিয়ে বিলে গেলে ধানের অমঙ্গল হয়। কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিতে পাকা ধান নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এ বিশ্বাস এখনও লালন করছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। উপজেলার মাকড়াই গ্রামের কৃষক জহুর আলী

www.eelm.weebly.com

(৪৫) বলেছেন, বাবা চাচাদের কাছে শুনেছি, বিলে ছাতা ব্যবহার করা নিষেধ। ছাতা নিলে ধান নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সে নিষেধাজ্ঞা পালন করছি। কেউ যাতে ছাতা নিয়ে না যায় সেজন্য বিলে পাহারা বসিয়েছি।' –খাটাইল (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি।'

ইসলামে অমঙ্গলের আকীদা-বিশ্বাসই বাতিল। অমঙ্গল কেবল কুফর, শিরক, বিদআত ও বদআমলসমূহের মধ্যেই নিহিত। কোন বস্তু, কোন সময়, কোন রঙ বা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে অমঙ্গলের বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা, যা ধীরে ধীরে শিরকি কর্ম ও বিশ্বাসের পথ সুগম করে। উল্লিখিত মিথ্যা খেয়াল এবং অনুরূপ অন্যান্য ভিত্তিহীন ধারণার সংশোধন করা যেমন ঈমান-আমলের হেফাযতের জন্য জরুরি, তেমনি দুনিয়ার নিয়ম-নেযাম বহাল রাখার জন্যও জরুরি। খেয়াল ও কল্পনার পেছনে পড়া বড়ই খারাপ রোগ, যা মানুষকে দ্বীন-দুনিয়ার প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে এবং বহু অকল্যাণে নিমগ্ন করে।

একটা শিরকি আমল

ভারী বস্তু ওঠাতে ইয়া আলী বলা

কোন কোন দিনমজুর ও শ্রমিককে দেখা যায়, যখন তারা কোন ভারী বস্তু ওপরে ওঠায় বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয় তখন তারা বলে, ইয়া আলী, ও আলী বা ইয়া আলী আলী। এর কারণ হয়ত এই হবে যে, হযরত আলী রা. যেহেতু বড় বাহাদুর এবং অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই এরা মনে করে তাঁকে ডাকলে বা তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তাদের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হবে বা সেই বস্তু ওঠানোয় সাহায্য পাওয়া যাবে।

মনে রাখতে হবে, এটা একটা শিরকি খেয়াল। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। ফরিয়াদ পূরণকারীও শুধু তিনিই। কোন মৃতের কাছে, কোন রূহ বা ব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করা শিরক। জীবিত ও বর্তমান ব্যক্তিদের কাছে শুধু সেসব বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করা যায়, যেগুলো উপায়-উপকরণের অধীন। মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের কোন বিষয়ে কারও থেকে সাহায্য কামনা করা শিরক। আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কারও নামের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করা যে, তার নাম নেওয়া হলে বা তাকে ডাকা হলে সমস্যার সমাধান হবে–এটা শুধুই শিরকি ধারণা।

সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় হযরত আলী রা.কে ডাকার পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনকে ডাকা উচিত এবং তাঁর

www.eelm.weebly.com

নামই উচ্চারণ করা উচিত। তিনিই সকল মুশকিল আসানকারী এবং সকল মসিবত থেকে নাজাত দানকারী।

আরেকটা শিরকি আমল

ইয়া গাউসুল আযম!

একবার জুমার উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। একটি সিএনজি পেয়ে তাতে চড়লাম। হঠাৎ দেখি, ড্রাইভার বলছে, ইয়া গাউসুল আযম! আমি বললাম, লাভ-ক্ষতি, হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র রাব্বুল আলামীন। তাঁর নামেই শুরু করা উচিত। এটাই তাওহীদ ও একত্ববাদের দাবি এবং শরীয়ত ও সুন্নতের শিক্ষা। কুরআন কারীম স্থলযানে আরোহন করে

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

পড়ার শিক্ষা দিয়েছে। এই দুআর অর্থে সামান্য চিন্তা করে দেখুন। এতে বলা হয়েছে, 'পবিত্র তিনি যিনি এই বাহনকে আমাদের অধীন করেছেন। তাকে অধীন করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই ফিরে যাব।' –সূরা যুখরুফ ১৩-১৪

আর জলযানে আরোহণ করার জন্য কুরআনেই দুআ শেখানো হয়েছে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

'আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা ও স্থির হওয়া। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।' –সূরা হূদ, ৪১

এই দুআসমূহে তাওহীদের কত স্বচ্ছ শিক্ষা রয়েছে। এর পরও কি আল্লাহ্ তাআলার নাম ব্যতীত অন্য কারও নামে ড্রাইভ শুরু হতে পারে? শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ., যাঁকে সাধারণ মানুষ 'গাউসুল আযম' নামে ডাকে (অথচ এ নামটি সংশোধনযোগ্য। কেননা শায়েখ রহ. গাউস তথা ফরিয়াদপূরণকারী নন, বরং তিনি নিজেই আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদকারী ছিলেন।) তিনি বড় পাক্কা তাওহীদবাদী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে শরীয়ত ও সুন্নতের তালীমই দিতেন। তাওহীদ ও সুন্নত প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটনের জিহাদই ছিল তাঁর মিশন। তিনি বলতেন–

'আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কাউকে ভয় করো না এবং তাঁকে ছাড়া কারও কাছে আশা পোষণ করো না। সকল

www.eelm.weebly.com

প্রয়োজন তাঁরই নিকট পেশ কর এবং তাঁরই কাছে প্রার্থনা কর। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও ওপর ভরসা রেখো না। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি সকল ত্রুটিমুক্ত, তাঁরই ওপর আস্থা রেখো। খবরদার, তাওহীদ! তাওহীদ! তাওহীদ! (অর্থাৎ একমাত্র সে একক সত্তাকে মেনে চল, একক সত্তার ওপর ভরসা কর এবং সে একক সত্তার সঙ্গেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর।)'
–মালফূযাত–ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/৫

সুতরাং সবার খালেক ও মালেকের নামেই ড্রাইভিং এবং অন্য সকল কাজ শুরু করা উচিত।

হাদীস নয়

সমস্যায় পড়লে কবরবাসীর সাহায্য প্রার্থনা কর

কতক বুযুর্গ থেকে একটি উক্তি বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে–

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَصْحَابِ الْقُبُوْرِ

উক্তিটির মর্ম হল দ্বীনি ব্যাপারে মত-পার্থক্যের কারণে যদি জটিলতা সৃষ্টি হয় যে, কী করা হবে, কী করা হবে না, তাহলে পূববর্তী বুযুর্গ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন (সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) তাঁদের কর্মপদ্ধতি জেনে নাও এবং সে মোতাবেক আমল কর। বিষয়টি অনুরূপ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যেমন বলেছিলেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ

কিন্তু কতক বিদআতিকে দেখা যায় এই উক্তিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতে। এরপর তারা এটা দ্বারা কবর ও মাযারবাসীদের কাছে সাহায্য কামনার বৈধতার পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করে। নাউযুবিল্লাহ! মনে রাখতে হবে, এটা হাদীস নয়। কারও উক্তি মাত্র, যার সঠিক মর্মও আগেই বলা হয়েছে।

এই নীতিটি মনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত কবরবাসীদের কাছে নয়, বরং কবরবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফেরাত ও রহমতের দুআ করার নির্দেশ দিয়েছে।

–ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ১/১২১, ২/১০৫ (১৭৯ উর্দু তরজমা) # জুলাই '০৬ঈ.

www.eelm.weebly.com

উচ্চারণের ভুল

মুনকার-নাকীর

কবরে মৃত ব্যক্তিকে সওয়াল করার জন্য যে দুই ফেরেশতা আসেন তাদের একজনের উপাধি 'মুনকার' আর অপরজনের উপাধি 'নাকীর'। উভয় শব্দের একই অর্থ তথা অপরিচিত। আকার-আকৃতিতে উভয় ফেরেশতা এমন অপরিচিত হবেন যে, তাদের দেখলেই মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। তাই তাঁদের নামও এমন নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু অনেককে শোনা যায়, তারা শব্দ দুটোর উচ্চারণ করেন 'মুনকির' ও নিকীর', প্রথম শব্দে 'কাফ'-এ 'যের' দিয়ে এবং দ্বিতীয় শব্দেও 'নূন'-এ 'যের' দিয়ে, অথচ এই উচ্চারণ ভুল। শুদ্ধ হচ্ছে উভয় স্থানে 'যবর' হবে–মুনকার ও নাকীর।

ভুল ধারণা

কিরামান-কাতিবীন

প্রত্যেকের সঙ্গে যে ফেরেশতা নেগাহবান হিসাবে নিয়োজিত এবং আমলনামা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত, তাঁদের ব্যাপারে কারও কারও মাঝে এমন ধারণা রয়েছে যে, নেক-আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম 'কিরামান' আর বদ-আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম 'কাতিবীন'। এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ 'কিরামান' শব্দের অর্থ সম্মানিতগণ এবং 'কাতিবীন' অর্থ লেখকগণ। তাই উভয় শব্দ নেক-আমল ও বদ-আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ হিসাবে প্রযোজ্য।

কুরআন কারীমেও উভয় প্রকার নেগাহবান ফেরেশতার বিশেষণ হিসাবে 'কিরামান কাতিবীন' শব্দ বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

'অবশ্যই তোমাদের ওপর নেগাহবান নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।' –সূরা ইনফিতার ১১

ভুল পন্থা

নামাযে যেখান থেকে ইচ্ছা কাতার করা

নামাযে কাতার করার নিয়ম হচ্ছে ইমামের পেছন থেকে দাঁড়ানো শুরু করবে। ধীরে ধীরে ডানে-বামে কাতার বাড়তে থাকবে। কিন্তু বহু মসজিদে

www.eelm.weebly.com

দেখা যায়- এক দুই রাকাত হয়ে যাওয়ার পর যারা আসেন, তারা কাতারের ডানদিকে দাঁড়ান। এরপর মুসল্লি আসতে আসতে কখনও ইমামের পেছন পর্যন্ত কাতার পূর্ণ হয়, কখনও অপূর্ণ থেকে যায়। এ পদ্ধতি ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে কাতার শুরু হবে ইমামের পেছন থেকে। তারপর উভয় দিকে সমানভাবে কাতার বাড়তে থাকবে।

আরও একটা ভুল

সামনের কাতার খালি রেখে দাঁড়ানো

কেউ কেউ ইমামকে রুকুতে পাওয়ার জন্য অলসতা করে আগের কাতারে ডানে-বামে জায়গা থাকা সত্ত্বেও নতুন কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর তাদের দেখাদেখি অন্যরাও ওই কাতারে দাঁড়ায়। ফলে আগের কাতারে জায়গা খালি থেকে যায়। মনে রাখতে হবে, এমন করা ঠিক নয়।

আগের কাতারে জায়গা খালি রেখে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীস শরীফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির প্রতি খেয়াল করা অতি জরুরি।

একটা বাহানা বা একটা ভুল ধারণা

নামাযে মিলেমিলে দাঁড়ানো

অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। একজন বুযুর্গ তাঁর সঙ্গের মুসল্লিকে মিলেমিশে দাঁড়ানোর উৎসাহ দেন এবং নিজে পাশের মুসল্লির সঙ্গে মিশে দাঁড়ান। মসজিদটি ছিল মোজাইক করা এবং কাঁচের টুকরো দ্বারা রেখা খচিত জায়নামায আকৃতির বক্সে সুসজ্জিত। পাশের মুসল্লি বলে উঠল, আপনি এ-দিকে আসছেন কেন? আপনি আপনার বক্সের ভেতরে থাকুন। এটা যদি সে মিলেমিশে দাঁড়ানো সুন্নত-একথা না-জানার কারণে অথবা কোন ওযর ছাড়াই শুধু স্বভাবগত ভালো না-লাগার কারণে (যা শরীয়তে ধর্তব্য নয়) মিলেমিশে দাঁড়ানো থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে বলে থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা অনর্থক। আর বাস্তবে যদি সে এই মনে করে থাকে যে, ফ্লোর, কার্পেট বা চাটাইয়ে যে বক্স বা পৃথক পৃথক জায়নামাযের আকৃতি করা থাকে তা মাসআলার দৃষ্টিতেও এক একজন মুসল্লির জন্য নির্ধারিত, তবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাতারে দাঁড়ানোর সুন্নত তরিকা হচ্ছে পরস্পরে মিলেমিশে

www.eelm.weebly.com

দাঁড়ানো। কাতারের মাঝে জায়গা খালি রাখা সুন্নত পরিপন্থী কাজ এবং খুবই গর্হিত আচরণ।

হাদীস নয়

اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় যদিও সে কাফের হয়

কেউ কেউ এই উক্তিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করে থাকে অথচ এটা হাদীস নয়, অতি উৎসাহী কোন ব্যক্তির উক্তি। খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৬হি.-৭২৫হি.) রহ.কে এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তা হাদীস কি না? তিনি বলেছিলেন, এটা হাদীস নয়; কারও উক্তি। -ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ ১০৩, তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ৩/১২৭-১২৮

আর উক্তিটিও সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলার নিকট ওই দানই গ্রহণযোগ্য, যা ঈমান ও ইখলাসের সঙ্গে হয়ে থাকে। ঈমান ও ইখলাসশূন্য লোকদের দান-খয়রাত ও নেক আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব।' –সূরা ফুরকান ২৩

কারও কারও মুখে উক্তিটি এমনও শোনা যায়–

اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا

'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়, যদিও সে পাপী হোক।'

এটাও হাদীস নয় আর কথাটাও সঠিক নয়। কেননা পাপ আর আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়া একত্র হতে পারে না। # আগস্ট '০৬ঈ.

ভুল বিশ্বাস

মৃত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়ায় ঘুরে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়

কিছু মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, পরলোকগত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়ায় ঘুরতে থাকে এবং আপন লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে (নাউযুবিল্লাহ!) কেউ কেউ এমনও বলে থাকে যে, তাঁদের রূহ সর্বত্রই

www.eelm.weebly.com

বিরাজমান (নাউযুবিল্লাহ!) তাই ওদের মতে তাঁদেরকে ডাকা এবং তাঁদের কাছে সাহায্য কামনা করা জায়েয।

কালেমা পাঠকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, যার তাওহীদে বিশ্বাস আছে এবং যিনি তাওহীদের অর্থ বুঝেন, তিনি জানেন যে, এসব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন এবং ওসব আমলও সুস্পষ্ট শিরক।

ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে মাশায়েখের রূহ (আত্মা) হাজির এবং তারা মানুষের অবস্থাদি জানতে পারে, সে কাফের হয়ে যাবে।' –আলবাহরুর রায়েক ৫/১২৪

ভুল মাসআলা

মাসবুক মুসল্লির ইমামের সঙ্গে স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া

কিছু লোকের দেমাগে এ ভুল মাসআলা স্থান করে আছে যে, মাসবুক মুসল্লির ইমামের সঙ্গে কোন একটি স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া উচিত এবং এমনভাবে শরিক হওয়া উচিত, যেন কোন আমল অতিরিক্ত হতে না পারে। যেমন সেজদায় শরিক না হওয়া। কেননা এতে সেজদার সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমন ধারণা ঠিক নয়। হাদীস শরীফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হল, ইমামকে যেখানেই পাবে সেখানেই ইমামের সঙ্গে নামাযে শরিক হয়ে যাবে। এটিই মাসবুকের নামাযের নিয়ম। একাকী, ইমামের পেছনে পূর্ণ নামায আদায়কারী এবং ইমামের নামাযের সঙ্গে মাসবুকের নামাযের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। কওমা– উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সেজদা, জলসা– দুই সেজদার মাঝে বসা এবং শেষ বৈঠক ইত্যাদি সাধারণ অবস্থার চেয়ে মাসবুকের নামাযে অতিরিক্ত হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এটি অতিরিক্ত নয়। সাধারণ অবস্থা থেকে মাসবুকের নামাযের বিন্যাস ও নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু বাহ্যিক এ অবিন্যাসটিই তার বেলায় নিয়ম ও বিন্যাস। কেননা শরীয়তই এ পার্থক্য ও ব্যতিক্রমের নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং মাসবুকের নামায সেভাবেই পড়া উচিত, যেভাবে শরীয়ত শিখিয়েছে। এতে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রশ্ন ওঠানোই ভুল।

ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত ও ভুল উদ্ধৃতি

অদ্যাবধি আমার ধারণা ছিল যে, 'মকসুদুল মুমিনীন'এর উৎসসমূহ অনির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে বহু ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়েত তাতে স্থান

www.eelm.weebly.com

পেয়েছে, কিন্তু গতকাল যখন শবে বরাতের আলোচনা পড়তে লাগলাম তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। কতগুলো একেবারে ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়েত লিখে কোনটাতে মেশকাত, কোনটাতে তিরমিযী, কোনটাতে বুখারীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে অথচ এসব কিতাবে ওসব রেওয়ায়েতের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই এবং এগুলো ভিত্তিহীন ও বাতিল।

যেহেতু বইটি সর্বসাধারণের মহলে বহুল প্রচলিত, তাই সাবধান করার জন্য ওসব রেওয়ায়েত বইটি থেকে নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির নামায সম্পর্কে মকসুদুল মুমিনীন-এর ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসমূহ

আমার সামনে মকসুদুল মুমিনীন-এর যে কপিটি (৪৬তম সংস্করণ, ১৯৯৬ সনের ছাপা এবং এর রেজিস্ট্রি নং ৬৫৯, এ কপিটির ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠায় নিচের রেওয়ায়েত ৩টি রয়েছে) আছে, তাতে লেখা আছে যে–

'হাদীসে আছে, মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপনিষ্পাপহইয়াভূমিষ্ঠ হয়, উল্লিখিত চার রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। –মেশকাত'

রেওয়ায়েত ও উদ্ধৃতি উভয়টাই মিথ্যা। এরপর লেখা আছে–

'তারপর আবার দুই দুই রাকাত করিয়া ৪ রাকাত নামায উল্লিখিত নিয়ত করিয়া পড়িবে। নিয়ত, ছুবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ ৫০ বার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়তেই নামায শেষ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর বসিয়া ১০০ বার দরূদ পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবে। হাদীস শরীফে আছে, যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন। –তিরমিযী'

রেওয়ায়েত ও উদ্ধৃতি উভয়টিই মিথ্যা। তিরমিযী শরীফে এরূপ কোন হাদীস নেই এবং কোন সহীহ হাদীসেও এই নিয়ম ও ফযীলতের কথা নেই।

এরপর লেখা আছে–

'আরো হাদীসে আছে, যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাঠ করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের উপর দোযখ হারাম করিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। –সহীহ বোখারী'

www.eelm.weebly.com

রেওয়ায়েত ও উদ্ধৃতি উভয়ই মিথ্যা। আগেই বলা হয়েছে, তিনটি রেওয়ায়েতই বাতিল ও ভিত্তিহীন। এগুলোতে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণই মিথ্যা। এসব কিতাবে ওসব রেওয়ায়েতের নাম নিশানাও নেই আর এমন জাল রেওয়ায়েত এসব কিতাবে থাকতেও পারে না। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট বলেছেন যে, শবে বরাতের ফযীলত এবং তাতে নফল ইবাদতের গুরুত্ব আপন জায়গায় স্বীকৃত, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত এবং বিশেষ সূরা নির্দিষ্টকরণের সঙ্গে শবে বরাতের নামায নামে যে নামায এবং এর বিশেষ ফযীলতের যে কথা জনসাধারণের মাঝে বা কতক সাধারণ বইপত্রে প্রসিদ্ধ আছে, সেগুলো জাল ও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারের হাদীস জাল ও ভিত্তিহীন। এ মর্মে হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য জানার জন্য উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখতে পারেন–

কিতাবুল মওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/৪৯-৫২, আলমানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম ৯৮-৯৯, তাখরীজে ইহইয়া–ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, যাইনুদ্দীন ইরাকী ১/২৯৬, আল-লাআলিল মাসনূআ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ২/৫৯-৬০, তানযীহুশ শরীআ, ইবনে আররাক ২/৯২-৯৪, আলমাওযূআতুল কুবরা, মোল্লা আলী কারী ১৬৫, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাযা যাবীদী ৩/৪২৫-৪২৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ, শাওকানী ১/৭৫-৭৬, আলআসারুল মারফূআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮২-৮৫ # সেপ্টেম্বর '০৬ঈ.

ভুল ভাবনা

রোযা কি অনাহার যাপন?

রমযানের রোযার ব্যাপারে কারও কারও মন্তব্য শুনে মনে হয়, তারা যেন রোযাকে শুধুই একটি অনাহার যাপনের সাধনা মনে করে। ইসলামের রোযা যেন অন্যান্য ধর্মের সাধনার মতো শুধুই একটি সাধনা। মনে রাখবেন, এ ভাবনা নিতান্তই ভুল। রোযা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, তাতে অনেক হেকমত ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

রোযার সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, মাসায়েল ও পদ্ধতি ইসলামে নির্দেশিত রয়েছে, যা আমরা খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি। রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেকমত বা রহস্য হল তাকওয়া ও অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন– সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পক্ষান্তরে অনৈসলামী সাধনা বা অনাহার যাপনের মূল উদ্দেশ্য হল শুধু রূহ বা আত্মার শক্তি অর্জন করা, অন্তরের পবিত্রতা বা তাকওয়া অর্জনের সঙ্গে যার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। উপরন্তু তাদের সে সাধনা সম্পূর্ণ মনগড়া এবং ইবাদতের সঙ্গে তার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। সুতরাং ইসলামী রোযাকে বিজাতিদের মাঝে প্রচলিত সাধনার মতো একটি সাধনা মনে করা চরম মূর্খতা, যা থেকে তওবা করা ফরয।

আরেকটা ভুল ভাবনা

ঈদ বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতোই কি রেওয়াজি অনুষ্ঠান?

ঈদের ব্যাপারেও অনেক মানুষের ধারণা কিছুটা এ-রকম যে, এটা যেন অন্যান্য বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতোই একটা রেওয়াজি প্রোগ্রাম মাত্র, অথচ এটাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ ইসলামের ঈদ তাৎপর্য, রহস্য, ভিত্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিধান ও পদ্ধতি সবদিক থেকেই বিজাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামের ঈদ কোন রেওয়াজি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি অত্যন্ত অর্থবহ ও হেকমতপূর্ণ অনেক বড় নেক কাজ এবং ইসলামের একটি 'শিআর' বা নিদর্শন পর্যায়ের বিধান এবং অনেকগুলো নেক আমল ও ইবাদতের সমষ্টি। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য মাসিক আলকাউসার অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৬ঈ. সংখ্যার 'পথের সন্ধানে' কলামের নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

ভুল আমল

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়া

কোন কোন মানুষকে দেখা যায়, নামাযের জন্য যখন জায়নামাযে বা কাতারে দাঁড়ায় তখন তারা প্রথমে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে। তারপর নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলে। এ আমলটা ভুল। নামায শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা এবং শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। তাকবীরে তাহরীমার আগে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ বা অন্য কিছু পড়া শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ার সময় হল তাকবীরে তাহরীমা ও সানার পর, যা মূলত সূরায়ে ফাতেহা শুরু করার জন্য পড়া হয়। এজন্যই তো যাকে সূরা ফাতেহা পড়তে হয় না (যেমন মুক্তাদি) সে ব্যক্তি সানার পরও আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়বে না।

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা

তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না

জনৈক ব্যক্তির মুখে 'তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না' শুনে আমি ভ্রুক্ষেপও করিনি। ভেবেছিলাম, এটা তার ব্যক্তিগত ভ্রান্তি। তাই এবে 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন উপরোক্ত কথাটা একটি দৈনিক পত্রিকায় পড়লাম, তখন আশ্চর্যের কোন সীমা থাকল না। এর চেয়েও আফসোসের ব্যাপার হল, এই ভুল বক্তব্যটা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকজন মুফতী সাহেবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বলে অথচ কোন 'মুফতী' এ-কথা বলবেন তা হতেই পারে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারাবীহ অতি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতে মুআক্কাদা। মাহে রমযানের হকসমূহের মধ্যে তারাবীহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া তারাবীহ পরিত্যাগ করা গোনাহের কাজ। কিন্তু কারও যদি তারাবীহ পড়ার সুযোগ না হয় কিংবা দুর্ভাগ্যবশত যদি কেউ কোন ওযর ছাড়াই তারাবীহ না পড়ে, তবে তার রোযাও হবে না-এ কথাটা একদম ভুল। রোযা মাহে রমযানের স্বতন্ত্র আমল এবং ফরযে আইন। তারাবীহ পড়া না হলেও তা ফরয থাকে এবং তারাবীহ পড়া ছাড়াও তা আদায় হয়।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, তারাবীর ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা একটা বড় বঞ্চনা। আর তারাবীহ না পড়াকে বাহানা বানিয়ে রোযাও না রাখা আরও বড় বঞ্চনা এবং মারাত্মক কবীরা গোনাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানের হকসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার তওফীক দান করুন, আমীন।

হাদীস নয়

প্রতিদিনের তারাবীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত

১. কোন কোন এলাকায় রমযান উপলক্ষে একটি লিফলেট বিতরণ করা হয়, যাতে রমযানের প্রতিদিনের তারাবীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সওয়াবের কথা রয়েছে এবং সেটাকে হাদীস বলেও দাবি করা হয়েছে অথচ বর্ণনাটার আদ্যোপান্ত পুরোটাই মিথ্যা এবং এটাকে হাদীস বলাও অনেক বড় গোনাহ। তারাবীর ফযীলতের ব্যাপারে যেসব সহীহ হাদীস রয়েছে সেগুলোই বলা উচিত। যেমন- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি তো খুবই প্রসিদ্ধ যে,

www.eelm.weebly.com

'যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রমযানের রাতের (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ) নামায পড়বে, তার আগে-পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

শবে কদরের নামায পড়ার নিয়ম

২. মকসুদুল মুমিনীন-এর ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠায় 'শবে কদরের নামায পড়িবার নিয়ম' শিরোনামে যা লেখা হয়েছে, তা সবই ভিত্তিহীন বর্ণনা। আফসোসের কথা হচ্ছে, ওই সব বর্ণনার কোনটার সঙ্গে মেশকাতের বরাত দেওয়া আছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেসব বর্ণনার কোনটাই মেশকাতে নেই। আর শবে কদরের নামায নামেও শরীয়তে কোন নামায নেই। শবে কদর অনেক বড় ফযীলতের রাত। এ রাতে অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া উচিত, যা সাধারণ নফল নামাযের নিয়মেই পড়তে হয়। তাতে বিশেষ কোন রাকাতসংখ্যা, বিশেষ কোন পদ্ধতি বা বিশেষ কোন সূরা নির্দিষ্টসংখ্যক পড়া-এর কোনটাই শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনির্ভরযোগ্য বাজারি বইয়ের ভুল কথায় ধোঁকা না খাওয়া উচিত। এমনিভাবে একথাও ভুল যে, কদর বা বরাতের রাতে গোসল করা সুন্নত বা এর বিশেষ কোন সওয়াব বা ফযীলত রয়েছে। মকসুদুল মুমিনীন-এ এ বিষয়ে যত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলোই জাল ও ভিত্তিহীন। # অক্টোবর-নভেম্বর '০৬ঈ.

কথা বলার একটা ভয়ানক ভুল যা আকীদা-বিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে

বিয়ের পরে কাউকে কাউকে এমন কথা বলতে শোনা যায়, 'এখন বাচ্চা নেব না, কয়েক বছর পর বাচ্চা নেব।'

'বাচ্চা নেব না' বলার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে তারা এমন কোন ওষুধ ব্যবহার করবে বা এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা সাধারণত গর্ভে বাচ্চা আসতে বাধা প্রদান করে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল শরীয়তসম্মত কোন ওযর ছাড়া এরূপ করাই ঠিক নয়। তা ছাড়া এসব করলেও তা কারও কাছে বলার মতো বিষয় নয়, কিন্তু এরচেয়েও জঘন্য ব্যাপার হল তাদের একথা বলা যে, 'আমি বাচ্চা নেব' বা 'বাচ্চা নেব না', যেন বাচ্চা হওয়া বা না-হওয়া তাদের নিজেদের কব্জায় অথচ প্রত্যেক

www.eelm.weebly.com

মুসলমানই একথা জানে যে, এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অধীন। স্বামী-স্ত্রী যদি গর্ভ সঞ্চারে বাধাদানকারী কোন কিছু অবলম্বন নাও করে আর হাজারও চেষ্টা করে, তবুও অনেক সময় দেখা যায় গর্ভসঞ্চার হয় না, হলেও স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হলেও জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় না।

পক্ষান্তরে গর্ভ বাধাদানকারী কোন ওষুধ বা কোন পদ্ধতি অবলম্বনের পরও আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে বাচ্চা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যে ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন, তা রুখবার কেউ নেই এবং যা সেখানে মঞ্জুরকৃত নয়, তা পাওয়ারও কোন পথ নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা মেয়ে দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেলে দান করেন। অথবা তাদেরকে ছেলে-মেয়ে উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।' –সূরা শূরা ৪৯-৫০

আল্লাহ্ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন তা রুখবার কেউ নেই এবং তিনি যা রুখে দেন তা তিনি ব্যতীত কোন প্রেরণকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' –সূরা ফাতির ২

হাদীস শরীফে আছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' (সহবাসে বাইরে শুক্রক্ষরণ ঘটানো) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, তা তোমরা কেন করতে যাবে? কেননা যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার তা তো আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করবেনই।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৮/১৩২

তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'যে পানি থেকে সন্তান হওয়ার তা যদি পাথরেও ফেল, তা থেকেও আল্লাহ্ তাআলা সন্তান সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তাআলা যত প্রাণী সৃষ্টি করার তা তিনি সৃষ্টি করবেনই।' –মুসনাদে আহমদ ৩/১৪০

www.eelm.weebly.com

মোটকথা যে জিনিস বান্দার হাতে নেই, বরং তার সম্পর্ক তাকদীরের সঙ্গে এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও রহমতের সঙ্গে, সে ব্যাপারে এরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করা, যা দ্বারা সন্দেহ হয়, যেন তা বান্দার কব্জায়–এরূপ আচরণ কোন মুমিনের জন্য কখনও শোভনীয় নয়। তাই এ-ধরনের কথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২৯ দিনে মাস হলে কি এক রোযা কম হয়?

যদি ২৯ রমযান চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় এবং পরের দিন ঈদ হয় তখন কতক লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'আহ! রোযা একটা কম হয়ে গেল।'

এরূপ বলা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ওপর রমযান মাসের রোযা ফরয করেছেন, যা চান্দ্র মাসসমূহের নবম মাস। আর চান্দ্র মাস কখনও ৩০ দিনে হয়, কখনও ২৯ দিনে।

সুতরাং রমযান মাস যখন ২৯ দিনে হল তখন এটিই পূর্ণ মাস এবং ২৯ রোযাই ওই বছরের পূর্ণ ফরয রোযা। এক রোযা কম হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

প্রসিদ্ধ নামসমূহে প্রচলিত কিছু ভুল

(ক) হোসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজ একজন প্রসিদ্ধ সুফী ব্যক্তিত্ব। লোকেরা সাধারণত তাঁকে মনসূর হাল্লাজ বলে থাকে, যা ঠিক নয়। কেননা মনসূর তাঁর পিতার নাম।

(খ) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী রহ. আরবের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কারক বুযুর্গ ছিলেন। বহু লোকই তাঁকে আব্দুল ওয়াহ্হাব নামেই উল্লেখ করে থাকে, যা ঠিক নয়। আব্দুল ওয়াহহাব তাঁর পিতার নাম। আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী বলে লোকেরা যাকে বুঝিয়ে থাকে, তিনি হলেন তার ছেলে মুহাম্মাদ।

(গ) 'দরসে নেযামী' যার দিকে সম্বন্ধযুক্ত বলে কেউ কেউ মনে করে, তিনি উযীর নেযামুল মুলক, যিনি বাগদাদের মাদরাসা নেযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই ধারণা ঠিক নয়। মূলত এই নেসাবের প্রবর্তক হলেন শায়েখ নেযামুদ্দীন সুহালাভী (১১৬১ হি.) যিনি বাহরুল উলূম আব্দুল আলী লাখনোভী রহ. (১২২৫ হি.)এর শ্রদ্ধেয় পিতা ছিলেন। # ডিসেম্বর '০৬ঈ.

www.eelm.weebly.com

ভুল বিশ্বাস

বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটা কি আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল?

আধুনিক বিশ্বের খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রোপাগান্ডা ও অপকৌশলের ফলে কিছু সাধারণ মুসলমান ভাইকে এই ভুল ধারণায় পতিত হতে দেখা যায় যে, বর্তমানে বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটা আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

স্মরণ রাখবেন, এটা খ্রিষ্টানদের একটা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। যে তাওরাত হযরত মূসা আ.-এর ওপর এবং যে ইঞ্জিল হযরত ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মূল কপি তো দূরের কথা, সেগুলোর অনুবাদও কোন স্থানে সংরক্ষিত নেই। বর্তমানে যে কিতাবগুলো বাইবেল নামে প্রসিদ্ধ এবং কিছু খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠান যে গ্রন্থকে নতুন মুদ্রণে ইঞ্জিল নামে প্রকাশ করেছে, সেটা মূলত হযরত ঈসা আ.-এর জীবন চরিত। যা বিভিন্নজন লিখেছে। কিন্তু যাদের সঙ্গে কিতাবগুলোকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তাদের পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্র বিদ্যমান নেই এবং এমন কোন কপি মজুদ নেই, যা সরাসরি রচয়িতাদের হাতে লেখা। এমনকি রচয়িতাদের কপি থেকে নকলকৃত কোন কপি বিদ্যমান আছে–একথার প্রমাণও পাওয়া যায় না। উপরন্তু কিতাবগুলোর কোন কপি ওই ভাষায় নেই, যে ভাষায় বাইবেল রচয়িতারা লিখেছেন বলে দাবি করা হয়ে থাকে। বাইবেল নামে যা পাওয়া যায় তাতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এত বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের স্তূপ রয়েছে, যা বড় বড় পাদ্রিরা এবং খ্রিষ্টান গবেষকরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। এগুলোর উদাহরণ দেখতে চাইলে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর বিশ্বখ্যাত লা-জবাব আরবী কিতাব 'ইযহারুল হক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কিতাবটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং উর্দু ভাষায় অনেক আগেই 'বাইবেল সে কুরআন তক' নামে তিন খণ্ডে কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির একথা ভালোভাবে বুঝা উচিত যে, আমাদের ঈমান বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের ওপর নয়, বরং ওই তাওরাত ও ওই ইঞ্জিলের

www.eelm.weebly.com

ওপর ঈমান থাকতে হবে, যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যথাক্রমে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যার কপি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ওই আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হল যে, তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েতের গ্রন্থ ছিল। সম্পূর্ণরূপে হক ছিল এবং খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের আগ পর্যন্ত অনুসরণীয় ছিল। ওই আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলে আখেরি নবীর গুণাবলি এবং তাঁকে প্রেরণের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। যখন আখেরি নবীর আবির্ভাব ঘটবে তখন আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারীদের ওপর তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা ফরয–একথাও সেখানে ছিল, কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টান যাজক ও পণ্ডিতরা ওই আসল কিতাবগুলোকে সংরক্ষণ করেনি, বরং জেনে-শুনে তা বিকৃত করেছে, তার শিক্ষা ও হেদায়েতসমূহ গোপন করেছে; পরিশেষে ওই কিতাবগুলোর সুস্পষ্ট ও অকাট্য হেদায়েত– শেষ নবীর ওপর ঈমান আনা অস্বীকার করে বস্তুত তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপর ঈমান না রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

মুসলমান যেমন আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলকে হক জানে, তেমনি এই আকীদাও পোষণ করে যে, আলকুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পর আমলযোগ্য হেদায়েতগ্রন্থ একমাত্র কুরআন কারীম। কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়ার কারণে (মূসা আ. ও ঈসা আ.-এর) তাওরাত ও ইঞ্জিলের শরীয়ত মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। এখন তা থেকে শুধু ওই হুকুমগুলো আমলযোগ্য, যেগুলো আলকুরআনুল কারীমের শরীয়ত বহাল রেখেছে।

ভুল ধারণা

আযান ও ইকামতে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর জবাবে কী বলবে?

আযান ও ইকামতের জবাব দেওয়া সুন্নত–একথা সবাই জানে। মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে, জবাবে সে শব্দগুলোই বলতে হয়। তবে 'হায়্যা আলাস সালাহ ও হায়্যা আলাল ফালাহ'-এর জবাবে শ্রোতারা 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর উত্তরে হুবহু আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-ই বলতে হয়। কিন্তু কিছু

www.eelm.weebly.com

মানুষকে দেখা যায়, মুআয্যিন যখন এই কালেমা উচ্চারণ করেন তখন তারা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে থাকেন। তারা মনে করেন, এটাই এ বাক্যের জবাব অথচ এটা এই বাক্যের জবাব নয়। এ বাক্যের জবাব হল এ বাক্যটিই পুনরায় বলা।

হাদীস নয়
আল্লাহ্‌র নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য

এক বক্তার ওয়াযে শোনা গেল, 'রাসূলের মুআয্যিন হযরত বেলাল রা. 'আশহাদু' ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি ش (শীন) কে س (সীন) পড়তেন। তাঁর এই অশুদ্ধ উচ্চারণে লোকদের আপত্তির কারণে তাঁকে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন সহীহ উচ্চারণকারীকে মুআয্যিন বানানো হয়। এরপর একদিন অতিবাহিত হলে জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাশরীফ এনে বললেন, আজ কি আপনার মসজিদে আযান হয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, খুব সুন্দর আযান হয়েছে। আগের থেকে ভালো। জিবরীল আ. বললেন, আগের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌঁছুত, কিন্তু আজকের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। আল্লাহ্‌র নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য হয়।'

এটা একটা বানানো জাল ও মুখরোচক ভিত্তিহীন ঘটনা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সঙ্গে এর সামান্যতম সম্পর্ক নেই। সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা যায়, বেলাল রা. খুব স্পষ্টভাষী, উঁচু আওয়ায এবং সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী ছিলেন। এজন্যই তাঁকে আযান দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। হাদীস পর্যালোচকগণ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, উল্লিখিত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। –আলমাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ ১১৩, আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯৭, কাশফুল খাফা ১/৪১১ # জানুয়ারি '০৭ঈ.

একটা ভয়াবহ ভুল
কুরবানীর ঈদ কি জবাইয়ের উৎসব?

দ্বীনি ইলমের ব্যাপক চর্চা না থাকার কারণে কোন কোন বে-দ্বীন মানুষ অজ্ঞতাবশত কিংবা জেনে-শুনে এই মারাত্মক ভ্রান্ত কথা বলে থাকে যে,

www.eelm.weebly.com

কুরবানীর ঈদ পশু জবাইয়ের উৎসবের নাম। এ-জন্য তাদের ধারণামতে সেই দিনের আনন্দ হল পশু জবাই করার আনন্দ এবং মুসলিমদের এই উৎসবও ভিন জাতির নানা উৎসবের মতোই একটা উৎসব। যেমন– হিন্দুদের রয়েছে বলিদান উৎসব (নাউযুবিল্লাহ!)।

অথচ 'কুরবানীর ঈদ' শব্দেই এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন বিদ্যমান রয়েছে। কেননা কুরবানীর ঈদ শব্দটির অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের ঈদ। এটি এমন ঈদ, যে ঈদে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া রিযিক (গৃহপালিত পশু) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পেশ করে থাকে। সুতরাং এই উৎসব পশু জবাইয়ের উৎসব নয়; বরং আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য অর্জনের উপকরণ পেশ করতে পারার সৌভাগ্য অর্জনের আনন্দ। এটি গোশত ভক্ষণের উৎসব নয়; বরং খালেস আল্লাহ্র ইবাদত।

কুরবানী পেশ করার পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে এভাবে শিখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার দানকৃত গৃহপালিত বিশেষ প্রকারের বিশেষ বয়সের এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের হালাল পশু নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পন্থায় শুধু তাঁর হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর নামে জবাই করা। এর পর এই পশুর গোশত-চামড়া তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করা।

কুরবানীর এই হাকীকত সামনে থাকলে ইসলামী ঈদ এবং ভিন জাতির উৎসবের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক পার্থক্যগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে যায়–

১. অন্যান্য জাতির উৎসব কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হয়, কিন্তু ইসলামী ঈদ সম্পৃক্ত হচ্ছে ইবাদতের সঙ্গে। যথা ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক রমযানের রোযার সঙ্গে এবং ঈদুল আযহার সম্পর্ক হজের সঙ্গে। হজের বরকতপূর্ণ সময়ে আল্লাহ্ তাআলা হাজীদের জন্য এবং তাদের ওসীলায় অন্যদের জন্যও মাগফেরাতের দরজা উন্মুক্ত করেন। এই মাগফেরাতের মৌসুমে নৈকট্য অর্জনের আমল হল কুরবানী।

২. অন্যান্য জাতির উৎসবগুলো তাদের নিজেদের বানানো, কিন্তু ইসলামী ঈদ শরীয়ার শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. অন্যদের উৎসব কর্মসূচি ও কর্মপন্থার দিক থেকে শিরক ও বিদআতের সমষ্টি অথচ ইসলামী ঈদের ভিত্তিই হল নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইত্তেবায়ে

www.eelm.weebly.com

সুন্নত। কুরবানীর পশু জবাই করার আগে কুরবানীদাতার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

'আমি সকল ভ্রান্তি থেকে বিমুখ হয়ে ওই সত্তার অভিমুখী হলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা।' –সূরা আনআম ৭৯, ১৬২ এরপর বলে–

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

ইয়া আল্লাহ্! আপনার দেওয়া নেয়ামত থেকে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি এবং আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। এরপর জবাই সমাপ্ত হওয়ার পর বলে– اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ 'ইয়া আল্লাহ্, আমার পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল করুন।'

৪. অন্যদের উৎসবগুলো রীতিসর্বস্ব অথচ ইসলামী ঈদ হল অনেকগুলো নেক আমলের সমষ্টি। যেমন, ঈদুল আযহায় কুরবানীর পশু জবাই করা একটি ইবাদত, এটি কোন রেওয়াজ নয়। আবার এর উদ্দেশ্য গোশত খাওয়াও নয়। গোশত তো মানুষ বারো মাসই খেয়ে থাকে। যে কোন হালাল পশু আল্লাহ্ তাআলার নামে জবাই করা হয়, তা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার জন্য হালাল করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে পশু জবাই করে তা গোশত খাওয়ার কাজে আসতে পারে, কিন্তু তা نُسُكٌ কুরবানী হিসাবে গণ্য হবে না। কুরবানী হওয়ার জন্য ঈদের নামাযের পর কুরবানীর নিয়তে জবাই করতে হবে। যদি কুরবানী একটি ইবাদত না হত, বরং গোশত ভক্ষণের উৎসব হত, তবে এর জন্য এত মাসায়েল এবং এত নিয়ম-কানুন যথা– নির্ধারিত সময়, বিশেষ ধরনের, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পশু এবং অন্যান্য মাসায়েল ইত্যাদির প্রয়োজন হত না এবং এর জন্য ইখলাসেরও কোন প্রয়োজন হত না।

অতএব তাওহীদ ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শেখানো ঈদুল আযহা ও কুরবানীকে যারা হিন্দুদের বলিদান উৎসবের মতো একটি

www.eelm.weebly.com

শিরক ও কুসংস্কারভিত্তিক উৎসব মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষেই একজন মুলহিদ ও যিন্দীক। এ-ধরনের মানুষের খালেস তওবা করে সহীহ ইলম অর্জন করা এবং ঈমান ও আকীদা ঠিক করা ফরয।

ভুল কাজ

দুআর মধ্যেও কি মুকাব্বিরের প্রয়োজন?

পুরনো ঢাকার একাধিক মসজিদে বিষয়টি লক্ষ করেছি। অন্য আরও মসজিদেও এমন হয়ে থাকবে। অর্থাৎ নামাযে মুকাব্বির ছিল না আর বিনা প্রয়োজনে কারও মুকাব্বির হওয়া ঠিকও নয়, কিন্তু দুআর সময় মুআযযিন সাহেব হঠাৎ করে মুকাব্বির হয়ে যায়। ইমাম দুআর জন্য হাত ওঠালে মুআযযিন উচ্চস্বরে বলে– اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ দুআ শেষ করলে বলে– بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এই প্রচলিত পদ্ধতিতে কয়েকটি বিষয় সংশোধনযোগ্য রয়েছে–

১. এই মুকাব্বির হওয়ার মূল কারণ হল নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে দুআ করাকে জরুরি মনে করা হয়। অথচ এটি কোন জরুরি ব্যাপার নয়।

২. এর এক কারণ এটাও যে, অনেক মানুষের সম্মিলিত দুআয় সবারই দুআর সূচনাকারীর সঙ্গে আরম্ভ করা এবং তার সঙ্গেই শেষ করাকে জরুরি মনে করা হয়। অথচ এটাও জরুরি নয়। কেউ ইচ্ছা করলে পরে দুআ আরম্ভ করেও আগে শেষ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে একসঙ্গে শুরু করে অন্যদের দুআ শেষ হওয়ার পরও নিজের দুআ জারি রাখতে পারে। মোটকথা সবার একসঙ্গে দুআ শুরু করা কিংবা একসঙ্গে শেষ করা কোনটাই জরুরি নয়। দুআয় নামাযের মতো ইমামত ও ইক্তেদার বিধান প্রযোজ্য হয় না।

৩. নামাযে মুকাব্বির না হয়ে দুআয় মুকাব্বির হওয়া–এ থেকে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, নামাযে জামাতবদ্ধ হওয়ার চেয়ে দুআয় জামাতবদ্ধ হওয়া অধিক জরুরি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। নামাযে প্রয়োজনের সময় মুকাব্বির হওয়া কাম্য, কিন্তু দুআয় কোন সময়ই মুকাব্বির রাখার আদেশ করা হয়নি।

৪. সাধারণত জামাতের নামাযে কিছু মানুষ মাসবূক থাকে। এ অবস্থায় ইমাম উচ্চ স্বরে দুআ করে কিংবা মুআযযিন উচ্চ আওয়াযে মুকাব্বির হয়ে তাদের নামাযে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এটা জায়েয নয়। যদি একজন মানুষও নামাযে মাসবূক থাকে তাহলে ইমাম-মুআযযিন কারও জন্যই এভাবে দুআ করার অধিকার নেই, যাতে নামাযীর নামাযে বিঘ্ন ঘটে।

www.eelm.weebly.com

৫. দুআর সূচনা হামদ ও সানা দ্বারা এবং সমাপ্তিও হামদ-সানা ও আমীন দ্বারা করা মুস্তাহাব। উপরোক্ত রেওয়াজি পদ্ধতিতে এই বিষয়টিও অনুসৃত হয় না।

ভুল ধারণা

ইজতেমার দিনগুলোতে কি রোযা রাখা মুস্তাহাব?

কোন কোন অঞ্চলে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার দিনগুলোতে মহিলাদেরকে রোযা রাখতে দেখা যায়। তাদের কারও কারও কথা থেকে অনুমিত হয় যে, তারা এই রোযা রাখাকে সেই দিনগুলোর বিশেষ করণীয় আমল মনে করে থাকে। যদি বাস্তবিকই তারা এমন ধারণা পোষণ করে, তবে তা একটা ভুল ধারণা এবং তা পরিহার করা উচিত।

নফল রোযা যে কোন দিন রাখা যায়। বছরের যে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষেধ, সে দিনগুলো ছাড়া অন্য যে কোন দিন রোযা রাখা যায় এবং তা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তবে মনে রাখতে হবে, এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার। নফল রোযার মধ্যে শুধু ওই সব রোযারই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যে রোযাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে হাদীস শরীফে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যথা– ৯ই যিলহজের রোযা, আশুরার রোযা, আইয়ামে বীযের (যিলহজ বাদে প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা, শাবান ও আশহুরে হুরুম-এর রোযা ইত্যাদি।

যেসব দিনের রোযার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়নি, সে দিনগুলোর রোযা সব এক ধরনের। সেই দিনগুলোর মধ্যে যে কোন দিন রোযা রাখা যায়। তবে সেই দিনগুলোর কোনটির ব্যাপারে কোন স্বাতন্ত্র্যের বিশ্বাস রাখা কিংবা বিনা দলিলে কোন বিশেষ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বলা কোনভাবেই ঠিক নয়।

টঙ্গীর বিশ্বইজতেমা সাধারণ দাওয়াত ও ঈমানী চেতনার নবায়ন প্রসঙ্গে একটি দ্বীনি আলোচনার ইজতেমা। প্রত্যেক দ্বীনি ইজতেমার মতো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ ইজতেমা। এই ইজতেমার তারিখ, স্থান ও কর্মপদ্ধতি সবই ব্যবস্থাপনাগত উপযোগিতার প্রতি লক্ষ রেখে চিন্তা-ভাবনা ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাহলে এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনগুলোতে এ উপলক্ষে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

ফেব্রুয়ারি-২০০৭

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা
মনগড়াভাবে কোন মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা

কোন কোন মানুষের মধ্যে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, কোন মসজিদ অনেক পুরনো হলে কিংবা কোন মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যা দেওয়া হলে অথবা কোন মসজিদের সঙ্গে মাযার থাকলে অথবা অন্য কোন দিক দিয়ে তাতে কোন বিশেষত্ব থাকলে, ওই মসজিদকে ফযীলতের মসজিদ মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, এই মসজিদে নামায পড়ায় অন্য কোন মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশি সওয়াব। কোন কোন মানুষ তো এই উদ্দেশ্যে সফর পর্যন্ত করে থাকে। মহিলাদেরকে দেখা যায়, তারা এ জাতীয় মসজিদের জন্য মান্নত করেন এবং বাচ্চাদেরকে বরকতের জন্য বা অসুস্থদেরকে সুস্থতার জন্য সেসব মসজিদে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন।

মনে রাখতে হবে, এগুলো হল ভিত্তিহীন ধারণা ও অর্থহীন কাজ। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বা এ জাতীয় আরও কোন বৈশিষ্ট্য কোন মসজিদের শরয়ী মর্যাদা ও ফযীলত বৃদ্ধি করে না। সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর এবং ফযীলতের দিক থেকে সবগুলোর মর্যাদা এক সমান। কোন ঐতিহাসিক বিশেষত্বের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে কোন মসজিদ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতেই পারে, কিন্তু এতে করে আল্লাহ্‌র ঘর হওয়ার দিক থেকে এবং সওয়াব ও ফযীলতের দিক থেকে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। সব মসজিদ এক মর্যাদার। ফযীলত ও অধিক সওয়াবের বিষয়টি শুধু তিন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

এক. মসজিদে হারাম, দুই. মসজিদে নববী, তিন. মসজিদে আক্বসা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

শুধু তিন মসজিদের উদ্দেশেই সফর করা যাবে। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আক্বসা। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৭

www.eelm.weebly.com

কোন মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যায়িত করা একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এর কারণে ওই মসজিদে বিশেষ ফযীলত কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? তেমনি মসজিদের ভেতরে মাযার হওয়া তো জায়েযই নেই, মসজিদের আশে-পাশেও মাযার থাকা উচিত নয়। তাহলে মাযার থাকার কারণে মসজিদের ফযীলত বৃদ্ধি পায় কীভাবে?

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া যাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল উপরোক্ত ভুল ধারণাটা সংশোধন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে মসজিদে কোন বুযুর্গ আলেম ইমাম হিসাবে আছেন এবং সেখানে দ্বীনি তালীম ও মুযাকারার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই মসজিদ যদি অন্য কোন মহল্লায়ও হয়, তবুও সেখানে দ্বীনি ও ইলমি উন্নতির স্বার্থে যাওয়া মোটেই নিষেধ নয়।

একটা ভুল কর্মপদ্ধতি

হিসনে হাসীন কি খতম বা ওযীফা আকারে পড়ার কিতাব?

'হিসনে হাসীন' মুহাদ্দিস ইবনুল জাযারী (মৃত্যু ৮৩২ হিজরী)-এর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব, যে কিতাবে তিনি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় পঠিতব্য মা'সূর দুআগুলো হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলন করেছেন। এ কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর ওই দুআগুলো সংকলন করেছেন, যা কোন বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটি কোন ওযীফার পুস্তকও নয় আর মসিবত কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যে খতম করার কিতাবও নয়। আফসোসের বিষয় হল, খুব কমসংখ্যক লোকই কিতাবটির মূল উপকার হাসিল করে। অর্থাৎ এই কিতাবে উল্লেখকৃত দুআগুলো মুখস্থ করে কিংবা দেখে দেখে যে সময়ে যে দুআ পড়া উচিত, তা পড়ে। অধিকাংশ মানুষ এ কিতাবটিকে শুধু মসিবতের সময় খতম করানোর কিতাব মনে করে। আর যারা একে গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে থাকেন, তাদের মধ্যেও অনেকে কিতাবটিকে ওযীফা আকারে প্রতিদিন এক মনযিল করে পড়ে থাকেন। প্রত্যেক যিকির ও দুআ, যা বিশেষ সময়ে বা বিশেষ অবস্থায় পড়া কাম্য, তার ব্যাপারে যত্নবান হতে সাধারণত দেখা যায় না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর তওফীক দান করুন।

হিসনে হাসীনের উর্দুভাষায় অনূদিত একটি সংস্করণ আমাদের উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা ইদরীস রহ. (মৃত্যু ১৪০৯ হিজরী) কর্তৃক

www.eelm.weebly.com

সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। সংকলনটির উপস্থাপনা থেকেই এই দুআগুলো হাদীসের শিক্ষা অনুসারে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ভুল নাম

'আলহাজ্জুল আকবার' কি জুমার দিনের হজের নাম?

লোকমুখে প্রসিদ্ধ যে, আরাফার দিন যদি জুমাবার হয়, তবে সেই হজকে আকবরি হজ বলা হয়। কারও কারও কথা থেকে অনুমিত হয় যে, কুরআন কারীমে সূরা তওবায়- يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যে এই আকবরি হজের কথাই বলা হয়েছে। এই ধারণা ঠিক নয়। কুরআনে হাকীমে- يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ শব্দে জুমার দিন উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা শুধু হজই উদ্দেশ্য, তা যে দিনই হোক না কেন। হজকে 'আকবার' বলার একটি কারণ হচ্ছে হজের একটি প্রকার হল উমরা, যা সাধারণ হজের তুলনায় ছোট। তাহলে হজ হল বড় হজ আর উমরা ছোট হজ।

এটা ঠিক যে, জুমার দিনে হজ হলে সেখানে একদিকে আরাফার দিনের ফযীলত ও অন্যদিকে জুমার দিনের ফযীলত একত্র হয় এবং এজন্য এর একটি বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে, তবে এর সঙ্গে উপরোক্ত কথার সম্পর্ক নেই, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

হাদীস নয়

কবরকে সম্বোধন ও কবরের উত্তর

এক বক্তার মুখে শোনা গেল, হযরত ফাতেমা রা.কে দাফন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে কবর, সাবধান থেকো। তুমি কি জান, তোমার উদরে কাকে রাখা হচ্ছে? ইনি হলেন সাইয়িদুল মুরসালীনের প্রিয়তম কন্যা।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে আওয়ায এল, আমার কাছে বংশ-বিচার নেই, এখানে প্রত্যেকের আমল অনুসারে আচরণ করা হবে।'

এটা একটা ভিত্তিহীন কিস্‌সা। বাস্তবতার সঙ্গে এর দূরবর্তী কো সম্পর্কও নেই। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে এর কোন সনদ উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কেরাম তো অনেক উর্ধ্বে, সাধারণ একজন

www.eelm.weebly.com

মুসলমানও তো কাউকে দাফন করার সময় এ-ধরনের কথা বলে না। আখেরাতে হিসাব-কিতাবের বিষয়টি যে ঈমান ও আমলের ভিত্তিতেই হবে তা দ্বীনের একটি সর্বজনবিদিত শিক্ষা, যা মুসলমান মাত্রেরই জানা আছে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলতে পারেন-এই কল্পনাও জাহালত বা মূর্খতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রিয়তম কন্যা ফাতেমা রা.কে বলে গেছেন–

يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

'হে ফাতেমা, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা আমি উপকার-অপকারের মালিক নই।' –সহীহ মুসলিম ২/১১৪, জামে তিরমিযী হাদীস ৩১৮৫

এবং একথাও বলেছেন–

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، وَلَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

'হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চাইতে পার, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭১, সহীহ মুসলিম ২/১১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুস্পষ্ট শিক্ষার পর সাহাবীগণ কবরকে উপরোক্ত কথা কীভাবে বলতে পারেন? আর কবর থেকেই বা এ-ধরনের জবাব কেন আসবে? আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন। # মার্চ-২০০৭

ভুল ধারণা

মৃতের বাড়িতে কি আগুন জ্বালানো নিষেধ?

কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে শোনা যায়, যে বাড়িতে কেউ মারা যায়, সে বাড়িতে তিনদিন পর্যন্ত আগুন জ্বালানো নিষেধ। এটা নাকি অশুভ! মনে রাখতে হবে, ইসলামে কোন কিছু থেকে কুলক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। আর স্বাভাবিক গৃহ-কর্মে আগুন জ্বালালে তাতে কুলক্ষণের তো প্রশ্নই আসে না। তাই এ-ধারণা ঠিক নয় যে, যে বাড়িতে কেউ মারা যায়, সে বাড়িতে মৃত্যুর দিন এবং পরবর্তী আরও দু'দিন আগুন জ্বালানো যাবে না। প্রয়োজনে যে কোন সময়ই আগুন জ্বালানো যাবে। তাছাড়া মৃতকে গোসল

www.eelm.weebly.com

দেওয়ার জন্য সব অঞ্চলেই পানি গরম করার নিয়ম আছে। তখন এই কুলক্ষণের বিষয়টি কোথায় যাবে?

এ কথা ঠিক যে, মৃতের পরিবার স্বজন হারানোর বেদনায় শোকাহত থাকার কারণে রান্না-বান্নার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। তাই পাড়া-পড়শী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনকে পরিবারটির একদিন একরাতের খাবার-দাবারের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। –রদ্দুল মুহতার ২/২৪০, ৬৬৬৫

মদীনায় জাফর ইবনে আবু তালিব রা.এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার রান্না কর। কেননা এ মুহূর্তে তারা এদিকে মনোযোগ দিতে পারবে না।' –মুসনাদে আহমাদ ২/২০৫, ৬/৩৭০, জামে তিরমিযী, হাদীস ১০০৩

মোটকথা, মৃতের পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। এখান থেকে এ-ধারণা করা যে, মৃতের বাড়িতে আগুন জ্বালানো যাবে না, সম্পূর্ণ ভুল।

একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

হাজী ও আলহাজ

হজ আদায়কারীকে উর্দু ও বাংলা ভাষায় হাজী বলা হয়। এখানে মূল আরবী শব্দটি হল حَاجٌّ বা اَلْحَاجُّ। সাধারণ আরবী কথাবার্তায় اَلْحَاجُّ শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। বাংলাভাষায় মূল আরবী শব্দের জীমের তাশদীদ বাদ দিয়ে 'আলহাজ' বলা হয়। এ শব্দের অর্থ হল 'হজ আদায়কারী'। তিনি কয়বার হজ করেছেন তা এই শব্দে নেই। কিন্তু কারও কারও নাকি এ-ধারণা রয়েছে যে, যে একবার হজ করেছে তাকে বলা হয় হাজী, আর যে একাধিক বার হজ করেছে তার উপাধি আলহাজ! এই ধারণা ঠিক নয়। একবার হজ আদায়কারীর জন্যও উভয় শব্দ ব্যবহার করা যায়। হজকারীকে হাজীও বলা যায়, আলহাজও বলা যায়। যাহোক এটি একটি শব্দকেন্দ্রিক আলোচনা হল। এখানে যে বিষয়ে সবারই সচেতন থাকা প্রয়োজন তা হল, হজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন এবং একটি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত, যা শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই আদায় করতে হবে। হাজী বা আলহাজ উপাধি পাওয়ার জন্য হজ করা কিংবা হজ আদায়ের পর এই উপাধির আশায় থাকা দুটোই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা ইবাদতের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সব বিনষ্ট করে দেয়।

www.eelm.weebly.com

ভুল মাসআলা

জুমার নামায কি খোলা ময়দানে সহীহ হয় না?

টঙ্গী ইজতেমায় জুমার নামায ময়দানে পড়া হয়েছে। এতে একজন এই আপত্তি তুলেছেন যে, 'জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদ জরুরি, ময়দানে জুমার নামায শুদ্ধ হয় না।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জুমার নামায ও পাঞ্জেগানা নামায সবই জামাতের সঙ্গে শরয়ী মসজিদে আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা। বিনা ওযরে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও পড়া উচিত নয়। আর জুমার নামাযের বিশেষত্ব হল, এ নামাযে জামাত অপরিহার্য। বিনা জামাতে জুমা হয় না। তবে জুমার জন্য মসজিদ জরুরি, ময়দানে জুমা পড়লে জুমা হয় না–একথা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য গোটা ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। –সহীহ বুখারী ৩৩৫, সহীহ মুসলিম ৫২২

এই বিধানে জুমা ও পাঞ্জেগানা সবই শামিল। হ্যাঁ, বিনা ওযরে মসজিদ ছেড়ে বাইরে জুমা পড়া বা জামাত করা ঠিক নয়। আর তা নিয়ম বানিয়ে নেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। (টঙ্গী ইজতেমার ওযরটি তো স্পষ্ট, আশ-পাশের সকল মসজিদেও এতগুলো মানুষের সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে মাঠেই জামাত করতে হয়।) –রদ্দুল মুহতার ২/১৫২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৮, আলমুসান্নাফ, ইবনে আবি শাইবা ৪/৪৮, হাদীস ৫১০৮, ৫১১১

হাদীস নয়

দ্বীন ও সিয়াসত দুই সহোদর

সিয়াসত বা রাজ্য-পরিচালনা সামাজিক জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন। ন্যায় বিচার ও ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আদেশ ইসলাম দিয়েছে। মুসলামানদের স্বতন্ত্র শরীয়া রাষ্ট্র হওয়া শুধু শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থেই নয়, দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রয়োজন এবং তা একটি দ্বীনি দায়িত্ব। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের অনেক দলিল রয়েছে। এই স্বীকৃত বিষয়টিকে কেউ কেউ এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন–

اَلدِّيْنُ وَالسِّيَاسَةُ تَوْأَمَانِ

اَلْمُلْكُ وَالسِّيَاسَةُ تَوْأَمَانِ

বা

www.eelm.weebly.com

اَلسُّلْطَانُ وَالدِّيْنُ اَخَوَانِ

'দ্বীন ও শাসন জমজ-সহোদর ভাই।' অর্থাৎ দ্বীনবিহীন শাসনব্যবস্থা ফলদায়ক হতে পারে না এবং এই শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান ইত্যাদি উদ্দেশ্যও হাসিল হয় না। তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা শাসন-ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়। সারকথা, একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। তবে এটা পরিষ্কার যে, এ ক্ষেত্রে দ্বীন হল উদ্দেশ্য আর শাসনক্ষমতা তার ওসীলা বা উপায়। সূরা নূরে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন অংশীদার স্থির করবে না।' ...

তাহলে শাসন-ক্ষমতা দ্বীনের জন্য, দ্বীন শাসন-ক্ষমতার জন্য নয়। যাহোক, এ মুহূর্তে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হল, কেউ কেউ উপরোক্ত বাক্যকে হাদীস মনে করে থাকে। এ ধারণা ভুল। এটা হাদীসের বাক্য নয়, কোন মনীষীর উক্তি। –মাকতূবে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী–সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ১/৮০৫, তাহযীবুর রিয়াসা, আবু আব্দুল্লাহ আলকালয়ী ৯৫, উয়ূনুল আখবার, ইবনে কুতাইবা ১/৫৭ # এপ্রিল '০৭ঈ.

একটা ভয়াবহ চিন্তাগত ভুল

সংস্কৃতি সম্পর্কে কি ইসলামের কোন নির্দেশনা নেই?

কিছু মানুষের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, ইসলাম সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলেনি। অথচ ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি। তাই যারা ইসলামের কালেমা পড়েছে তাদের দ্বীন যেমন ইসলাম,

www.eelm.weebly.com

তেমনি ইসলামী সংস্কৃতিই হল তাদের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় সংস্কৃতি তো দূরের কথা, কোন অঞ্চল বা গোত্র-বংশভিত্তিক সংস্কৃতিও তাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। তবে কোন অঞ্চলের প্রচলিত কোন মুবাহ বা উপকারী রীতি-নীতিকে ইসলাম কখনও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না। তাই ইসলাম গ্রহণের পরও সেসব রীতি-নীতি অনুসরণ করতে বাধা নেই। আর এ জাতীয় বিষয়গুলো সংস্কৃতির প্রকৃত অনুষঙ্গও নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলাভাষায় কথা বলা, লুঙ্গি পড়া, ভাত-মাছ খাওয়া ইত্যাদিকে যদি বাঙালি সংস্কৃতির অংশ গণ্য করা হয়, তবে যেহেতু এ জিনিসগুলো ইসলামী তাহযীবের পরিপন্থী কিছু নয়, তাই ইসলাম গ্রহণের পর এগুলো পরিহার করতে হবে–এমন কোন কথা ইসলামে নেই।

তবে বার্ষিক উৎসবগুলো সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সম্পর্কে ইসলামের একটি ভিন্ন দর্শন রয়েছে। এ-বিষয়ক ইসলামী নির্দেশনাগুলো ইসলামের সেই দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন মদীনাবাসীর বার্ষিক দুটো উৎসব ছিল। তিনি ওই উৎসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মদীনাবাসী উত্তরে বলল, এ দুটো উৎসব অনেক আগে থেকে আমাদের এ অঞ্চলে পালিত হয়ে আসছে। নবীজি ইরশাদ করলেন–

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ خَيْرًا مِنْهَا، عِيْدَ الْفِطْرِ وَعِيْدَ الْأَضْحٰى

'আল্লাহ্ তাআলা এ উৎসবের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটো উৎসব দান করেছেন। তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।'

লক্ষ করার বিষয় এই যে, মদীনাবাসীকে একথা বলা হয়নি যে, ঠিক আছে ওই দুটো উৎসব হল তোমাদের দেশীয় বা গোত্রীয় উৎসব আর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা হল ইসলামী উৎসব। ওই দুটো হল মদীনার বা আউস-খাযরাজ গোত্রের সংস্কৃতি আর এই দুটো হল মদীনাবাসীর ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব দুই বিবেচনায় দুই উৎসব পালিত হবে। এমন কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি; বরং স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ উৎসবের পরিবর্তে উত্তম দুটো উৎসব দান করেছেন।

www.eelm.weebly.com

আজকাল একশ্রেণির মানুষকে এই বিভ্রান্তি ছড়াতে দেখা যায় যে, অমুক উৎসব আমরা বাঙালি হিসাবে পালন করি আর অমুক উৎসব মুসলমান হিসাবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তি।

ইসলামের নীতি এই যে, মানুষ প্রথমে যে সংস্কৃতিরই থাকুক না কেন, ইসলাম গ্রহণের পরে একমাত্র ইসলামী সংস্কৃতিই তার সংস্কৃতি। যারা মনে করে ইসলাম শুধু ধর্ম-কর্মের নাম আর সংস্কৃতি হল প্রত্যেক অঞ্চলভিত্তিক নিজস্ব বিষয়, ইসলামে এ বিষয়ে কোন আদর্শ বা নির্দেশনা নেই, তারা না ইসলামকে জানে আর না সংস্কৃতির অর্থ বুঝে।

একটা ভিত্তিহীন ধারণা

চাশতের নামায ছুটে গেলে কি মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?

হাদীস শরীফে চাশতের নামায (সালাতুয যুহা)-এর অনেক ফযীলত এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন, চাশতের নামায হল আট রাকাত। তাই আট রাকাত পড়া ছাড়া চাশতের নামায হবে না। এ ধারণার কারণে তারা চাশতের নামায পড়ার হিম্মত করেন না। অথচ সঠিক কথা এই যে, নামাযের রাকাত-সংখ্যা নির্ধারিত নয়। কেউ যদি দু'রাকাত পড়ে, তাহলেও এই নফল নামাযটি আদায় হবে এবং এর সবচেয়ে বড় ফযীলতটি সে পেয়ে যাবে।

আরেকটি কথা মুহাদ্দিস যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. (মৃত্যু ৮০৬ হি.) লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষের মাঝে একথাটা প্রচলিত রয়েছে যে, 'কেউ যদি চাশতের নামায পড়া আরম্ভ করে পরে তা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে।' এ কথায় ভীত হয়ে অনেকে চাশতের নামায একেবারেই পড়ে না। অথচ সেই প্রচলিত কথাটা একটা ভিত্তিহীন কথা, শয়তানই মানুষের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে, যাতে মানুষ এই গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রভূত সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. আরও লিখেছেন, উপরোক্ত ভিত্তিহীন কথার কারণে কোন কোন মহিলা এই ধারণা পোষণ করেন যে, চাশতের নামায শুধু বয়স্কা মহিলারাই পড়তে পারেন, যাদের মাসিক আসে না। কেননা যাদের মাসিক আসে তারা যেহেতু সে সময় কোনরূপ নামাযই পড়তে পারে না, তাই খোদা নাখাস্তা, তখন চাশতের নামায ছুটে যাওয়ার কারণে তারা অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। –জমউল ওয়াসায়েল ২/৯০

www.eelm.weebly.com

এ মূলনীতিটি ভালোভাবে মনে রাখা উচিত যে, নেক আমল যখন যতটুকু করা যায় ততটুকুই হল মহাসৌভাগ্য। তাই কোন নফল নামায থেকে শুধু এই বাহানায় বিরত থাকা যে, আজ যদিও পড়তে পারি আগামীকাল তো পড়তে পারব না, একদিন পড়ে আর কী হবে? এটা খুবই অন্যায় কাজ। বরং এটা এক ধরনের শয়তানি কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করার অর্থ হল নিজেকে বঞ্চিত করা।

ভুল মাসআলা

বিনা ওযুতে দরূদ পড়া কি জায়েয নয়?

কেউ কেউ মনে করেন, দরূদ শরীফ পড়তে হলে ওযু করা জরুরি। এই ধারণা ঠিক নয়। দরূদ শরীফ ওযু ছাড়াও পড়া যায়। তাই এ জাতীয় ভুল ধারণার ভিত্তিতে দরূদ পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। ওযু থাক বা না থাক, সুযোগ হলেই দরূদ শরীফ পড়া উচিত। কুরআন মাজীদ পড়ার জন্যও তো ওযু জরুরি নয়, হ্যাঁ তা স্পর্শ করার জন্য ওযু জরুরি। তবে গোসল ফরয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। তাই কোন ওযর ছাড়া এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকাও অনুচিত। খুব তাড়াতাড়ি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা কাম্য।# জুন '০৭ঈ.

চিন্তাগত ভুল

আদব ও নফল বিষয়াদির জ্ঞানচর্চাও কি নফল?

শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে শ্রেণি-বিভাগ রয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে যা ফরয ও ওয়াজিব, আর কিছু বিষয় রয়েছে যা নফল বা মুস্তাহাব। নফল বিষয়াদির মধ্যে কিছু রয়েছে যা স্বতন্ত্র আমল বা ইবাদত, যেমন– নফল নামায, নফল রোযা ইত্যাদি। আবার কিছু রয়েছে যা ফরয বা ওয়াজিব আমলের অংশ।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আদব ও নফল শ্রেণির বিষয়গুলো ব্যাপক অবহেলার শিকার। এর পেছনে যে মানসিকতা কার্যকর তা এই যে, এগুলো তো নফল কিংবা আদব। অর্থাৎ এগুলো ছেড়ে দিলে গোনাহ নেই। যখনই কোন নফল আমলের ক্ষেত্র আসে কিংবা কোন আদব পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন প্রথমে এই নেতিবাচক দিকটাই মনে আসে অথচ এখানে এভাবেও চিন্তা করা

www.eelm.weebly.com

গেছে যে, এ কাজে অনেক সওয়াব এবং অনেক উপকারিতা রয়েছে। নফল ও আদব পর্যায়ের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক চিন্তা পরিত্যাগ করে উপরোক্ত নেতিবাচক চিন্তা অবলম্বন করা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

আমি এখানে যে ভুল চিন্তাটা সম্পর্কে বলতে চাই তা এই যে, অনেকে আদব ও নফল বিষয়ের প্রচার-প্রসার এবং নিজের অধীন লোকদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের কাজটিকেও একটি নফল কাজ মনে করেন। ফলে কোন বুযুর্গ যদি এ বিষয়ে তাগিদ করেন, তাহলে একে 'বাড়াবাড়ি' বলে গণ্য করেন। মনে রাখা উচিত যে, এই চিন্তা ভুল। সঠিক কথা এই যে, আদব ও নফল শ্রেণির বিষয়াদির পঠন-পাঠন এবং ইসলাহ-তরিবয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে এর চর্চা ও প্রচার-প্রসার করা ফরযে কেফায়া। দলিলের নিরিখে এ বিষয়টি স্পষ্ট। ফিকহে হানাফীর তৃতীয় ইমাম– ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী রহ. 'কিতাবুল কাস্ব'-এ বিষয়টি পরিষ্কার বলেছেন। মূল কিতাবে এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ.এর ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, কিতাবুল কাস্ব, তাহকীক শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ পৃ. ১৫৯-১৬০, আলমাবসূত, সারাখসী ৩০/২৬৩

ভুল আমল

জায়নামাযের দুআ

মক্তবের 'কাওয়াদে বোগদাদি'তে জায়নামাযের দুআ শিরোনামে নিম্নোক্ত দুআটি লেখা রয়েছে–

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ...

এই দুআ সম্পর্কে অনেকের এ ধারণা রয়েছে যে, জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে তা পড়া সুন্নত বা নফল।

এটা একটা প্রসিদ্ধ ভুল মাসআলা। হাদীস শরীফে জায়নামাযের দুআ নামে কোন দুআ নেই। কোন নির্ভরযোগ্য ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবেও এই মাসআলা লেখা নেই যে, তাকবীরে তাহরীমার আগে এই দুআ পড়তে হবে; বরং ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব 'হেদায়া'-এ লেখা আছে যে, তাকবীরে তাহরীমার আগে এ দুআ পড়বে না।

তাকবীরে তাহরীমার পরে প্রথম কাজ হল সানা পড়া। হাদীস শরীফে বিভিন্ন সানা এসেছে। এগুলোর মধ্যে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' সানাটিই বেশি প্রসিদ্ধ এবং

www.eelm.weebly.com

একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও তাহাজ্জুদ নামাযে সানা হিসাবে–

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ...

দুআটি পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১) অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও বিষয়টি জানা যায়। তাহলে বোঝা গেল, উপরোক্ত দুআ তাকবীরে তাহরীমার আগে নয়, বরং তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়ার দুআ আর তাও মাঝে মধ্যে, তাহাজ্জুদ নামাযে।

ইতিহাসের ভুল

হাসান বসরী রহ. কি সাহাবী ছিলেন?

হাসান বসরী রহ.-এর সম্পর্কে কোন কোন আম-মানুষ এই ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন। 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' বইয়ে লেখা আছে যে, হাসান বসরী রহ. (যিনি ইল্‌মে ফিকহ, ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে তাফসীর ছাড়াও ইসলাহ ও তরবিয়তের ক্ষেত্রেও অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তাসাওউফের শাজারার কারণে তিনি সাধারণ লোক সমাজেও বেশ প্রসিদ্ধ) তিনি নাকি সাহাবী ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইতিহাসের সামান্য ধারণা আছে এমন যেকোন মানুষই জানেন যে, এটা একটা অলীক ধারণা। হাসান বসরী রহ. সাহাবী নন, তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নয়, ওমর ফারুক রা.এর খেলাফতের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তৃতীয় খলীফা উসমান রা.এর শাহাদতের সময় (৩৫হি.) তাঁর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর।

এই ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিচারে উপরোক্ত ধারণার কোন ভিত্তিই থাকে না। তাই তাযকিরাতুল আউলিয়া কিংবা এ জাতীয় বইপত্রে এ বিষয়ে যত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে সব মওযূ ও ভিত্তিহীন। –সিয়ারু আলামিন নুবালা, তাহযীবুল কামাল, তবাকাতে ইবনে সা'দ, আলী ইবনে আবি তালিব ইমামুল আরিফীন, আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আলগুমারী, আলমুরসালুল খাফী ওয়া আলাকাতুহু বিত-তাদলীস, ড. শরীফ হাতিম আউনী ১/২৬৩-২৬৮, আলমুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক, খতীব বাগদাদি পৃ. ৩৪৪

www.eelm.weebly.com

ভুল মাসআলা

মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, ফরয নামাযের সময় হয়ে যাওয়ার পরও মহিলারা নামায আদায় করতে দেরি করেন। কারণ, পুরুষরা এখনও মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফিরে আসেনি বা মসজিদের জামাত শেষ হয়নি। তাদের ধারণা– পুরুষের নামায শেষ হওয়ার পর মহিলাদের নামাযের সময় হয়। যেন এটা শরীয়তের একটা মাসআলা। এ বিষয়টা ঠিক নয়। পুরুষ যেমন নামাযের সময় হওয়ামাত্র নামায পড়তে পারে, তেমনি মহিলারাও পড়তে পারবে। পুরুষরা মসজিদ থেকে ফেরেনি–এই অযুহাতে নামাযের মুস্তাহাব সময় শেষ হতে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।

জুমার দিনের ব্যাপারেও একই কথা। অর্থাৎ সেদিন মহিলাদের যোহরের নামায পড়ার জন্য পুরুষদের জুমা পড়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে না। সময় হওয়ার পর মহিলারা নামায আদায় করতে পারবেন। # জুলাই '০৭ঈ.

ভুল বিশ্বাস

মেরাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?

মেরাজের আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ স্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে এমন সব কথা বলে থাকেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ধারণায় মেরাজের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র ঘরে মেহমান হিসাবে দাওয়াত দেওয়া। অথচ আল্লাহ্‌র ঘর-বাড়ির প্রয়োজন হয় না। স্থান ও কাল তাঁরই সৃষ্টি, তিনি স্থান ও কালের গণ্ডির উর্ধ্বে।

কুরআন কারীমে সূরা ইসরা ও সূরা নাজমে মেরাজের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উর্ধ্ব-জগতের সফর করানো এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের বড় বড় অনেক নিদর্শন দেখানো।

কুসংস্কার

রাতে সুই বিক্রি করা কি অশুভ?

দু'তিন দিন আগের ঘটনা। ঢাকা শহরের কথা। আমাদের এক দোস্ত রাতে দোকানে গিয়েছিলেন সুই কিনতে। দোকানে একজন তরুণ ও একজন বৃদ্ধ

www.eelm.weebly.com

ছিলেন। সুই আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তরুণ ছেলেটি ইতস্তত করতে লাগল এবং বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, সুই চাচ্ছে, এখন কি সুই দেওয়া যাবে? আল্লাহ্ তাআলার শোকর বৃদ্ধ মানুষটি বললেন– কেন, অসুবিধা কী? রাতে সুই বিক্রি করা যাবে না–এগুলো হল সব কুসংস্কার।

আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন, এসব ধারণা আমাদের সমাজে কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে! এগুলো মানুষের মনে এমনই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তারা এগুলোকে এক ধরনের 'আকীদা' বানিয়ে নিয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামী বিশুদ্ধ আকীদাগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা না গেলেও এসব 'আকীদা'র বেশ গভীর প্রভাব তাদের কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়!

এ-ধরনের অলীক ধারণার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। আমার ধারণা ছিল যে, শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ এ জাতীয় ধারণার বশবর্তী হন না, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শহরের অনেক শিক্ষিত মানুষও এ জাতীয় অলীক ধারণা পোষণ করে থাকেন।

তাই এ জাতীয় বিষয়গুলোও আলোচনায় আসা উচিত, যদিও এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই হল বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক কুসংস্কার, যা শুধু ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার কিছু কুসংস্কার আছে, যা শ্রেণি বিশেষের মধ্যে পাওয়া যায়।

একটা অবিশ্বাস্য ভুল মাসআলা

স্বামীর নাম মুখে নিলে কি স্ত্রী তালাক হয়ে যায়?

কোন কোন অঞ্চলের মহিলাদের সম্পর্কে এই আশ্চর্য কথা শোনা যায় যে, তারা স্বামীর নাম মুখে নেওয়াকে এমন অপরাধ মনে করে যে, এতে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়! কথাটা যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক, কারও মনে এমন ধারণা থাকা আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। দ্বীনি ইলমের চর্চা ব্যাপকভাবে না থাকলে স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মাঝে এ-ধরনের ধারণা সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

স্বামীর সম্মান করা স্ত্রীর জন্য জরুরি। স্বামীকে নাম ধরে ডাকাও বেআদবি। তবে স্বামীকে নাম ধরে ডাকলে কিংবা স্বামীর নাম মুখে নিলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়–এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়

ওযুতে কি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআ রয়েছে?

ওযুর সময়ের এবং ওযুর পরে বিভিন্ন দুআ সহীহ হাদীসে এসেছে, যা প্রসিদ্ধ এবং সবারই জানা রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ওযীফার বইয়ে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার যে ভিন্ন ভিন্ন দুআ বিদ্যমান রয়েছে, তা কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তাই এ দুআগুলোকে 'মা'সূর' ও 'মাসনুন' দুআ মনে করা ভুল। তবে দুআগুলোর অর্থ যেহেতু ভালো, তাই কেউ যদি শুধু দুআ হিসাবে ওযুর সময় কিংবা অন্য কোন সময় অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়ে, তবে তা নাজায়েযও হবে না।

তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এগুলোকে হাদীসের দুআ মনে করা কিংবা ওযুর মাসনুন দুআ মনে করা ভুল। –আলআযকার, নববী, আলফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ শরহুল আযকারিন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে আল্লান ২/২৭-৩০, আততালখীসুল হাবীর ১/১০০, আসসিআয়া ফী কাশফি মা ফী শরহিল বিকায়াহ ১/১৮১-১৮৩

ভুল ধারণা

সন্তান মারা গেলে মা আসরের পর খেতে পারেন না

কিছুদিন আগে শুনলাম, কোন কোন অঞ্চলে নাকি একথাও প্রচলিত আছে যে, কোন মহিলার সন্তান মারা গেলে তিনি চল্লিশ দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে পারবেন না। চা-নাস্তা বা পান-সুপারিও খেতে পারবেন না। এটা নাকি গোনাহের কাজ এবং এরূপ করলে ভবিষ্যতে তার সন্তান হবে না।

বালাবাহুল্য, এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণা। এর না কোন দ্বীনি ভিত্তি আছে, না দুনিয়াবি। এটা একটা মূর্খতাপ্রসূত কুসংস্কার। তাছাড়া উপরোক্ত সময়ে পানাহার করলে ভবিষ্যতে সন্তান হয় না–এরকম অমূলক ধারণাও প্রচলিত আছে। এটা যে একটা অবাস্তব কথা তা একেবারেই পরিষ্কার। কেননা অনেক মা রয়েছেন যাদের সন্তান মারা গেছে এবং তারা ওই নিয়ম মেনে চলা তো দূরের কথা, তার কল্পনাও কখনও করেননি। বিকালে হালকা চা-নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস বজায় রেখেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সন্তান দিয়েছেন। এসব অমূলক ধারণা থেকে মুক্ত থাকা জরুরি।# আগস্ট ২০০৭

www.eelm.weebly.com

ভুল মাসআলা

রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি সাহরি খাওয়া অপরিহার্য?

এবার রমযানের শেষ জুমা ছিল উনত্রিশে রমযান। জুমার জন্য যাচ্ছিলাম। সিএনজির চালক জিজ্ঞাসা করল, 'রাতে শোবার সময় রোযার নিয়ত ছিল, কিন্তু সাহরির সময় ঘুম ভাঙল না। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। সাহরি খেতে পারিনি। আমি ইস্তেগফার পড়েছি। এরপর রোযার নিয়ত করেছি। আমার রোযা কি হয়েছে?'

আরও মানুষকেও এমন সন্দেহ করতে দেখেছি। তারা যেন রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরি খাওয়া অপরিহার্য মনে করেন। অথচ মাসআলা এমন নয়। রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা জরুরি, সাহরি খাওয়া জরুরি নয়। অতএব, ঘুম বা অন্য কোন কারণে কেউ যদি সাহরি খেতে না পারে কিংবা কোন কারণ ছাড়াই সাহরি না খেয়ে থাকে, কিন্তু সে রাতে বা সকালে রোযার নিয়ত করেছে, তবে তার রোযা শুদ্ধ হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সাহরি খাওয়া সুন্নত এবং অত্যন্ত বরকতের বিষয়। হাদীস শরীফে সাহরি খাওয়ার জন্য এক রকম তাকিদই করা হয়েছে। তাই বিনা কারণে সাহরি খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। সামান্য পরিমাণে হলেও কিংবা স্বাভাবিক খাবারের বাইরে অন্য কোন সংক্ষিপ্ত খাবার দ্বারা হলেও সাহরি খাওয়া উচিত।

ভুল ধারণা

২৭-এর রাতই কি শবে কদর?

অনেকের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, সাতাশের রাতই হচ্ছে শবে কদর। এই ধারণা ঠিক নয়। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল কদর কোন্ রাত তা জানানো হয়েছিল। তিনি তা সাহাবীদেরকে জানানোর জন্য আসছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। তাদের ওই ঝগড়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সে রাতের ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ-কথাগুলো সাহাবীদেরকে জানানোর পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হতে পারে, এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখন তোমরা এ রাত (অর্থাৎ তার বরকত ও ফযীলত) রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২০, সহীহ মুসলিম ১১৬৫/২০৯

www.eelm.weebly.com

অন্য হাদীসে বিশেষভাবে বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১৭

তাই সাতাশের রাতকেই সুনির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদর বলা উচিত নয়। খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, এ রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, আজকাল আমাদের সমাজে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা এই যে, রমযানের শুরুতে মানুষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দলে দলে মসজিদে এসে থাকে। এটি অত্যন্ত ভালো দিক, কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে মুসল্লি-সংখ্যা ততই হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি শেষ দশকের মুসল্লিসংখ্যা প্রায় অন্যান্য মাসের মতোই হয়ে যায়। এটা খুবই আফসোসের বিষয়। রমযানের প্রথম দিকে যে আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল, শেষ দিকে তা আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কেননা, রমযানের শেষ দশকের ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস এই ছিল যে, শেষ দশকে তিনি পুরো রাত জাগতেন, পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন এবং ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নিতেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৭৪

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে, রমযানের প্রথমদিকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, তা অত্যন্ত মুবারক বিষয়। এটি মোটেও নিন্দার বিষয় নয়। নিন্দার বিষয় হল ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, এটাও শুধু রমযান মাসের ফরয নয়, তেমনি জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার বিধানও রমযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সারা বছরের বিধান। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন।

ইতিহাসবিষয়ক একটা ভুল

ফেরাউন কোথায় নিমজ্জিত হয়েছিল?

কারও কারও মুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যে জলভাগ দিয়ে মূসা আ. ও তাঁর সাহাবীদেরকে কুদরতিভাবে পার করেছিলেন আর ফেরাউনকে ও

www.eelm.weebly.com

তার দলবলকে নিমজ্জিত করেছিলেন, তা হচ্ছে নীলনদ। এই ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু নীলনদ মিসরের নদী আর ফেরাউন ছিল মিসরের অধিপতি, সম্ভবত এজন্যই এ কথা অনেকের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ফলে এই ভুল ধারণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। সঠিক তথ্য হচ্ছে, ফেরাউন যে স্থানে নিমজ্জিত হয়েছে, তা হচ্ছে লোহিত সাগরের উত্তরের অংশ। মিসরে আগে যেখানে সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে, তার সংলগ্ন দক্ষিণে সমুদ্রে দুইটি মাথা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আলোচিত স্থান হচ্ছে পশ্চিমের মাথা। (এ স্থান বর্তমানে সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত।)

হযরত মূসা আ. যখন আল্লাহ্ তাআলার আদেশে মজলুম বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা এখানে পৌঁছালেন এবং সঙ্গের লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন তখন সমুদ্র যেন তার জন্য পথ করে দিল। পানি উঁচু টিলার মতো দুই পাশে স্থির হয়ে গেল আর তিনি শুকনো রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হলেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মূসা আ. ও তাঁর সঙ্গীরা সীনা উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিলেন। এদিকে ফেরাউন যখন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইল, তখন আল্লাহ্ তাআলা উভয় পাশ থেকে পানিকে মিলিত হওয়ার আদেশ দিলেন। ফলে তারা সবাই নিমজ্জিত হয়ে জাহান্নাম-রসীদ হল।

মূসা আ. সে সময় মিসর থেকে সীনা উপদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তা একটি স্বীকৃত বিষয়। মিসর থেকে সীনা যাওয়ার পথে যে জলভাগ রয়েছে তা হচ্ছে লোহিত সাগর, নীলনদের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। –আরযুল কুরআন, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি ১৮-১৯, কাসাসুল কুরআন, মাওলানা হিফযুর রহমান এবং অন্যান্য সূত্র # নভেম্বর ২০০৭

ভুল চিন্তা

হজ কি একটি বৈশ্বিক সম্মেলন মাত্র?

হজের বিভিন্ন উপকারিতা আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লেখেন, 'হজকে কেন্দ্র করে গোটা ইসলামী বিশ্বের মুসলিম জনতা মক্কা নগরীতে একত্র হয়ে থাকেন। এটি পরস্পর পরিচিত হওয়ার এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে মত বিনিময় করার এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে এটা হজের তাৎপর্য নয় এবং সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ও উপকারিতাও নয়, অথচ সামসময়িক কিছু কিছু লেখকের আলোচনা

www.eelm.weebly.com

থেকে তা-ই অনুমিত হয়। তেমনি হজ কোন রাজনৈতিক কনফারেন্স নয়। অথচ হজ সম্পর্কে এমন ধারণা দিতে দেখা যায় বর্তমান সময়ের অনেক চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও মুসলিম লিডারদের।

যদি হজের তাৎপর্য এটাই হত, তবে হজের কাজকর্মগুলোর ধরনই ভিন্ন হত। তখন স্থিরতা ও এক জায়গায় দীর্ঘসময় অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হত, যাতে চিন্তা-ভাবনা, পড়াশোনা, পরস্পর মতবিনিময় এবং আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ হজের প্রকৃতিই হচ্ছে গতিময়তা এবং অবিরাম স্থানত্যাগ। বলাবাহুল্য, এটা উপরোক্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া তখন হজের দাওয়াত সীমাবদ্ধ থাকত আলেম-উলামা, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়। আলেম-জাহেল, বিশিষ্ট-সাধারণ সবার জন্যই হজ ফরয, যদি সে সামর্থ্যবান হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।' –সূরা আল-ইমরান ৯৭

তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো হজের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপকারিতা বলে গণ্য হতে পারে, একমাত্র লক্ষ্য ও মূল তাৎপর্য হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। –আরকানে আরবাআ ৩২৭-৩২৮ (টীকা)

ভুল মাসআলা

খুতবার শুরুতে কি আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?

এক মসজিদে দেখা গেল, খুতবার শুরুতে খতীব সাহেব জোরে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়লেন। হয়ত তিনি ভেবেছেন, খুতবা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, তাই তা বরকতপূর্ণ করার জন্য আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা উচিত। এ ধারণা ঠিক নয়। এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্ তাআলার কোন না কোন যিক্‌রের মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত। যে আমলের জন্য শরীয়ত যে যিক্‌র নির্দেশ করেছে সে আমল ওই যিক্‌রের মাধ্যমেই শুরু করা উচিত। যেমন– নামায শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা, হজ শুরু হয় তালবিয়া– লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... দ্বারা, কুরআন তেলাওয়াত আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ দ্বারা, চিঠিপত্র শুরু বিসমিল্লাহ দ্বারা ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

খুতবা 'আলহামদু লিল্লাহ' দ্বারা শুরু করা মাসনুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আলহামদু লিল্লাহ্ দ্বারা খুতবা শুরু করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই খুতবা দেওয়া হয়েছে। তাই খুতবার শুরুতে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ার রেওয়াজ সঠিক নয়।

ভুল ধারণা

ইফতারের ওয়াক্ত কি আযান শুরু হওয়ার পর হয়?

কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছিলাম। তিনি শাওয়ালের রোযা রেখেছিলেন। সূর্যাস্তের নির্ধারিত সময়েরও কিছু পরে তিনি সংক্ষিপ্ত ইফতার করলেন। ইফতারের পর মাগরিবের আযান শোনা গেল। তখন উপস্থিত কেউ কেউ বলে উঠলেন, আপনি তো আযান হওয়ার আগেই ইফতার করলেন!

অনেক সময় বেখেয়ালির কারণে মানুষ এ-ধরনের ভুল ধারণায় পড়ে যায়। না হয় সবারই জানা আছে যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ইফতারেরও। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোযাদার ইফতার করবে এবং মুআযযিন আযান দেবে। ইফতারের ওয়াক্ত আযান শুরু হওয়ার পর হয় বিষয়টি এমন নয়।

আমাদের দেশে রেওয়াজ আছে যে, লোকেরা ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং আযানের শব্দ শোনার আগ পর্যন্ত ইফতার করে না। এ থেকে কারও কারও মনে এ-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ইফতারের ওয়াক্তই শুরু হয় আযানের পর। এই ধারণা ঠিক নয়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতারের ওয়াক্ত হয়। আর বিনাকারণে ইফতার বিলম্ব করা খেলাফে সুন্নত। ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উচিত।

হাদীস নয়

চল্লিশ বছরের আমল বিনষ্ট হবে

কিছুদিন আগে এক ভাই ফোন করে বললেন, একজন তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শুনিয়েছেন যে, পাঁচ কাজ এমন রয়েছে, যেখানে দুনিয়াবি কথা বললে চল্লিশ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়– আযান, ওযু ও যিয়ারতের সময় দুনিয়াবি কথা বললে এবং মসজিদে বসে দুনিয়াবি কথা বললে।

www.eelm.weebly.com

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পঞ্চম কাজ কী? তিনি বললেন, ভুলে গেছি।

সত্যি বলতে কী, এ-ধরনের ভিত্তিহীন কথা আগাগোড়াই ভুলে যাওয়া ভালো। ওযু বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এ পর্যন্ত শুধু মসজিদে কথা বলার বিষয়ে ওই কথা পাওয়া যেত। এখন দেখা গেল, এর সঙ্গে কেউ আরও চারটি বিষয় যুক্ত করেছে।

মনে রাখতে হবে, এ-ধরনের বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। একে হাদীস মনে করা অনেক বড় গোনাহ।

এটা ঠিক যে, ওযুর সময় বিনাপ্রয়োজনে কথাবার্তা না বলাই ভালো। এ সময় দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক পবিত্রতার নিয়তে আল্লাহ্ তাআলার দিকে মন নিবিষ্ট রাখা কর্তব্য। তেমনি যিয়ারতের সময় আখেরাতের ধ্যান-খেয়াল মনে রাখা উচিত। অনর্থক কথাবার্তা যদি বলতেই হয়, তাহলে আর এখানে আসা কেন?

আযানের সময়ও একাগ্রতার সঙ্গে আযানের জবাব দেওয়া উচিত। আর মসজিদে মশগুল থাকবে যিকিরে-ফিকিরে। এ মূল্যবান সময়গুলো অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি কথাবার্তায় ব্যয় করা উচিত নয়। তবে কেউ যদি প্রয়োজনে কিংবা বিনাপ্রয়োজনে কোন দুনিয়াবি কথা বলে ফেলে, তাহলে তার কৃত ইবাদত, এমনকি চল্লিশ বছরের ইবাদত বিনষ্ট হবে–এটা একেবারেই ভিত্তিহীন বানানো কথা।

জানুয়ারি ২০০৮

ভুল ধারণা

মিনার তিনটি 'জামরা' কি তিন শয়তান?

অনেক মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, তিন 'জামরা' হল তিন শয়তান কিংবা প্রত্যেক জামরার সঙ্গে একটি করে শয়তান বাঁধা আছে, বরং কিছু মানুষকে এমনও বলতে শোনা যায় যে, প্রথমটি হচ্ছে বড় শয়তান। তার পরেরটা মেঝ শয়তান। তার পরেরটা ছোট শয়তান।

জেনে রাখুন, এ জাতীয় ধারণা পোষণ বা নামকরণ কোনটাই সহীহ নয়। আসলে 'জামারাত' আরবী 'জাম্‌রাতুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে ছোট ছোট কংকর বা নুড়ি পাথর। যেহেতু এসব স্থানে ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করা হয়, তাই এগুলোকে 'জামারাত' বলে।

www.eelm.weebly.com

এই নুড়ি বা কংকর নিক্ষেপের প্রেক্ষাপট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। হযরত ইবরাহীম আ. যখন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে হযরত ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান তিনবার তাকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিল। আর তিনবারই ইবরাহীম আ. তাকে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করেছিলেন। অবশেষে তিনি এই মহা পরীক্ষায় কামিয়াব হয়েছেন। যে তিনস্থানে ইবলিস তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সে তিনস্থান নিশানার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেখানে একটি করে খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যে খুঁটিটি মক্কার সীমানার একেবারেই নিকটবর্তী এবং মসজিদে খায়েফ থেকে দূরে অবস্থিত সেটাকে 'আলজাম্‌রাতুল কুবরা' বা 'জাম্‌রাতুল আকাবা' বলে। এর পরেরটিকে 'আলজাম্‌রাতুল উসতা' এবং এর পরেরটিকে 'আলজাম্‌রাতুল উলা' বা 'আলজাম্‌রাতুদ দুন্‌ইয়া' (নিকটতম জাম্‌রা) বলে।

হযরত ইবরাহীম আ. সরাসরি শয়তানকেই কংকর মেরেছিলেন। আজ তাঁর অনুসরণে ওসব স্থানে কংকর নিক্ষেপ করা হয় যেখানে যেখানে শয়তান তাঁকে বাধা দিয়েছিল। তিনি কংকর মেরে শয়তানকে প্রতিহত করেছিলেন আর আমাদের কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল মিল্লাতে হানীফ (মিল্লাতে তাওহীদ)এর ইমাম হযরত ইবরাহীম আ.-এর অনুকরণ এবং তাঁর কাজের হুবহু অনুকরণ–এই জযবা ও অনুভূতি নিয়ে যে, আশেকীন ও মুহিব্বীনের অনুকরণের মাঝে এমন শক্তি ও প্রভাব রয়েছে যে, যারা তাঁদের অনুকরণ করবে, তাদের মাঝেও আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি বাঁকে শয়তানের মোকাবেলা করার এবং তাতে কামিয়াব হওয়ার তওফীক দান করেন।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ওসব স্থানে খুঁটির আকৃতিতে শয়তানও থাকে না বা ওসব খুঁটির সঙ্গে শয়তানকে বেঁধেও রাখা হয়নি, কিন্তু যদি আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে চিরশত্রু শয়তানের বিরোধিতা করার সংকল্প নিয়ে যবানে আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহু আকবার বলে কংকর নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেটা হবে শয়তানের মুখে কালি মেখে তাকে অপদস্থ করা। এর দ্বারা শয়তানের কোমর ভেঙে যায় এবং

www.eelm.weebly.com

সে হতাশ হয়। তবে শয়তানকে জুতা ছুড়ে মেরে বা তাকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলার কাছে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার মাধ্যমে, তাকে চিরশত্রু ভেবে তার বিরোধিতা করা এবং সুন্নত অনুসারে ওসব স্থানে কংকর নিক্ষেপ করার দ্বারাই সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়।

আর বিশেষ করে কংকর নিক্ষেপের কাজ যদি সুন্নত মোতাবেক করা হয়, তাহলে সেটা হয় শয়তানের জন্য সবচেয়ে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ।

এই কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে যে যত বেশি আল্লাহ্র বড়ত্ব ও আনুগত্যের প্রেরণা আর মহব্বত অন্তরে পোষণ করবে এবং যত বেশি শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জযবা ও ইচ্ছা রাখবে, সেটা শয়তানের জন্য তত বেশি লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের কারণ হবে।

মোটকথা, মিনার 'জামারাত' শয়তান নয় এবং শয়তান সেখানে খুঁটি আকৃতিতে উপস্থিতও নয়, আর শয়তানকে সেখানে বেঁধেও রাখা হয়নি; বরং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়।

আল্লাহ্ তাআলার এই নির্দেশের মাঝে অনেক হেকমত নিহিত রয়েছে। একটি বড় হেকমত হল আল্লাহ্র স্বর তাজা করা। তাঁর যিকির যিন্দা করা এবং শয়তানকে অপদস্থ করে তার বিরোধিতায় পূর্ণ উজ্জীবিত হওয়া। আর এর প্রেক্ষাপট হল হযরত ইবরাহীম আ.এর ওই ঘটনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

ভুল প্রচলন

তওয়াফের সাত চক্করের জন্য কি আলাদা আলাদা দুআ রয়েছে?

হজের সময় প্রতিবছর অনেক মানুষকে দেখা যায়, মাতাফে তওয়াফ করার সময় হাতে পুস্তিকা নিয়ে তাতে লেখা তওয়াফের প্রতি চক্করের নির্দিষ্ট দুআ জোরে জোরে পড়তে থাকে। অনেক মানুষ অশুদ্ধভাবেও পড়ে। আর অধিকাংশ মানুষ অর্থ ও মর্ম না বুঝে শুধু মৌখিকভাবে উচ্চারণ করতে থাকে। বহু মানুষ এমনও আছেন, যারা মুখস্থ বা পুস্তিকা দেখে কোনভাবেই তা পড়তে পারেন না। তারা শুধু এই দুআগুলো পড়ার জন্য দলবেঁধে এমন কারও সঙ্গে তওয়াফ করেন, যিনি পুস্তিকা দেখে অশুদ্ধভাবে হলেও ওই দুআগুলো পড়তে পারেন। তিনি উচ্চস্বরে দুআগুলো পড়েন। আর অন্যরা যতদূর সম্ভব তার অনুকরণের চেষ্টা করেন।

www.eelm.weebly.com

এতখানি শ্রমস্বীকারের পেছনে তাদের এই ধারণা কাজ করে যে, তওয়াফের প্রতি চক্করে শরীয়তের পক্ষ থেকে ভিন্ন দুআ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যা পড়া জরুরি কিংবা গুরুত্বের সঙ্গে পড়া উচিত। আর এতে বিশেষ সওয়াব ও উপকারিতা রয়েছে।

এ-ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন লিফলেট বা পুস্তিকায় তওয়াফের প্রত্যেক চক্করের সময় পড়ার জন্য যেসব দুআ লিখিত আছে, সেগুলোর শব্দ ও অর্থ সঠিক হোক বা ভুল, দুআগুলো কুরআন হাদীসের দুআ হোক বা অন্য কারও বানানো, সেগুলো তওয়াফের দুআ নয়। অর্থাৎ ওই বিশেষ দুআগুলো তওয়াফের সময় পড়া সুন্নতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। তওয়াফের সময় পড়ার জন্য যে দু-একটি দুআ হাদীস শরীফে এসেছে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এই কুরআনি দুআ গোটা তওয়াফেই করা যায়। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানি ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এ দুআ করা উচিত। এ-ছাড়া যে দুআ মুখস্থ থাকে তা তওয়াফের সময় পাঠ করা যায়। তেমনি অন্তরে যে হাজত থাকে, তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা যায়। এটিই আল্লাহ্ তাআলার নিকট পছন্দনীয়–বান্দা যে ভাষাতেই তা প্রার্থনা করুক না কেন।

কত ভালো হত, যদি আমাদের হাজী ছাহেবান এ মাসআলাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতেন এবং সে মোতাবেক আমল করতেন। তাহলে তওয়াফের সময় এই দলবদ্ধতার কারণে অন্য হাজীদেরও কষ্ট হত না, আর তাদের উচ্চ আওয়াযে অন্যদের মনঃসংযোগে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটত না। # ফেব্রুয়ারি '০৮ঈ.

একটা ভিত্তিহীন রসম

আখেরি চাহার শোম্বা কি উদযাপনের দিবস?

সর্বপ্রথম একটি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, বহু মানুষ সফর মাসের শেষ বুধবারকে একটা বিশেষ দিবস গণ্য করে এবং এতে বিশেষ আমল রয়েছে বলে মনে করে। পরে মনে হল এ-ধরনের ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজের উল্লেখ 'মকসুদুল মুমিনীন' জাতীয় পুস্তক-পুস্তিকায় থাকতে পারে। দেখলাম, 'মকসুদুল মুমিনীন' ও বার চাঁদের ফযীলতবিষয়ক যেসব অনির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তাতে এই

www.eelm.weebly.com

বিষয়টি রয়েছে। যদি ওই দৈনিকে দিবসটি সম্পর্কে এভাবে মাহাত্ম্য ও করণীয়ের বয়ান না থাকত, তবে সম্ভবত প্রচলিত ভুল শিরোনামেও তা উল্লেখ করার উপযুক্ত মনে করতাম না।

খাইরুল কুরূনের হাজার বছরেরও বহু পরে উদ্ভাবিত এই রসমের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারীদের মতামতও এ ভিত্তিহীন বিষয়ের ভিত্তি অন্বেষণে বিভিন্নমুখী। উপরোক্ত দৈনিকটির ২৩ সফর ১৪২৮ হিজরী বুধবারের সংখ্যায় লেখা হয়েছে–

'আজ চান্দ্রমাস সফরের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরি চাহার শোম্বা। দু'জাহানের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগমুক্তির দিন। আর এ কারণেই এদিন মুসলমানদের জন্য আনন্দময় ও পবিত্র দিন। হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ইহুদি কবিরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক নিয়ে জাদুটোনা করেছিল। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি কিছুদিন মসজিদে নববীতে যেতে পারেননি। সফর মাসের শেষ বুধবার তিনি সুস্থতাবোধ করে গোসল করেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদে নববীতে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করেন। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগমুক্তিতে খুশি হয়েছিল মুসলিম জাহান। খুশি হয়ে হযরত ওসমান রা. তাঁর নিজ খামারের ৭০টি উট জবাই করে গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। খুশিতে আত্মহারা সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ ও শুকরিয়া আদায় করেছিলেন রোযা রেখে, নফল নামায পড়ে এবং হামদ-নাত গেয়ে। পবিত্র আখেরি চাহার শোম্বার দিনে আজিমপুর দায়রা শরীফ ঐতিহ্যগতভাবে রোগমুক্তি ও মসিবত দূরের জন্য এক বিশেষ আংটি তৈরি করে থাকে। এছাড়াও এদিনে বিভিন্ন খান্‌কা দরবারে রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দুআ ও মুনাজাত করা হয়। অনেকে এদিনে রোগমুক্তির জন্য মানত করে গোসল করে থাকেন। অনেকে এদিনে গরিব-দুঃখীদের মাঝে তৈরি খাদ্য বিতরণ করে থাকেন। এ বিশেষ দিনটি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে।'

অন্যদিকে মকসুদুল মুমিনীনে বলা হয়েছে–

'এই মাসের শেষ বুধবারকে আখেরি চাহার শোম্বাহ বলা হয়। (আখেরি শব্দের অর্থ শেষ এবং চাহার শোম্বাহ শব্দের অর্থ বুধবার) হিজরী একাদশ

www.eelm.weebly.com

সনের সফর মাসের শেষভাগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অসুস্থ এবং পীড়িত হইয়া পড়েন। তারপর এই মাসের শেষ বুধবার দিন তিনি শরীরে একটু সুস্থ বোধ করায় গোসলাদি করত কিছুটা শান্তি লাভ করেন। এই গোসলই হুযুরের জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর তাঁহার জীবনে আর গোসল করার ভাগ্য হয় নাই। অতএব এইদিন মুসলমানদের বিশেষভাবে গোসলাদি করত নফল নামায ও রোযা ইত্যাদি করত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহের উপর সাওয়াব বখশেষ করা উচিত।'

এরপর এদিন সম্পর্কে বিভিন্ন করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো একবারেই ভিত্তিহীন। যেমনটি ভিত্তিহীন উপরোক্ত উভয় বিবরণ।

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এক ইহুদি জাদু করেছিল। এটা ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মহররম মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। এ জাদুর প্রভাব কতদিন ছিল, সে সম্পর্কে দুটো বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় ছয় মাসের কথা এসেছে, অন্য বর্ণনায় এসেছে চল্লিশ দিনের কথা। কিন্তু এ দুই বিবরণে কোন সংঘর্ষ নেই। এক বর্ণনায় পুরো সময়ের কথা এসেছে, আর অপর বর্ণনায় এসেছে শুধু ওই সময়টুকুর কথা, যাতে জাদুর প্রতিক্রিয়া বেশি ছিল। তবে যাই হোক, সুস্থতার তারিখ কোন হিসাব অনুযায়ীই সফরের আখেরি চাহার শোম্বা হতে পারে না। –ফাতহুল বারী ১০/২৩৭, আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ২/১৫৪, শরহুয যুরকানী ৯/৪৪৬-৪৪৭

২. জাদুর ঘটনা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে এসেছে। কিন্তু সেখানে না একথা আছে যে, সে সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জামাতে শরীক হতে পারেননি, আর না আছে মুআওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) দ্বারা জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর গোসলের বয়ান।

৩. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্থতার কারণে খুশি হওয়া কিংবা তাঁর সুস্থতার সংবাদ পড়ে আনন্দিত হওয়া প্রত্যেক মুমিনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এ কথা দাবি করা যে, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা পরবর্তী যুগের মনীষীগণ সে খুশি প্রকাশের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কিংবা একে উদযাপনের দিবস ঘোষণা করেছেন, জাহালাত ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, এ দাবির সপক্ষে দুর্বলতম কোন দলিলও বিদ্যমান নেই।

www.eelm.weebly.com

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অনেক মসিবত এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নাজাত দিয়েছেন। তায়েফ ও ওহুদে আহত হয়েছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্থ করেছেন। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন, যার কারণে মসজিদে যেতে পারেননি, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্থ করেছেন। তাঁর সুস্থতা লাভের এসব আনন্দের স্মৃতিগুলোতে দিবস উদ্‌যাপনের কোন নিয়ম আছে? তাহলে আখেরি চাহার শোম্বা, যার কোন ভিত্তি নেই, তা কীভাবে উদযাপনের বিষয় হতে পারে?

৪. কোন দিনকে বিশেষ ফযীলতের দিবস মনে করা কিংবা বিশেষ কোন আমল তাতে বিধিবদ্ধ রয়েছে এমন কথা বলা কিংবা তাকে ধর্মীয় দিবস হিসাবে উদযাপন করা–এই সবগুলো হচ্ছে মুসলমানদের জন্য শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এগুলো শরয়ী দলিল ছাড়া শুধু মনগড়া যুক্তির ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা যায় না। এটি শরীয়তের একটি অবিসংবাদিত মূলনীতি। এজন্য উপরোক্ত তথ্য ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হলেও এ দিবসকে ঘিরে ওই সব রসম-রেওয়াজ জারি করার কোন বৈধতা নেই।

৫. মকসুদুল মুমিনীন পুস্তিকায় যা বলা হয়েছে তা-ও সঠিক নয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে সোমবারে। এর চার পাঁচদিন আগে তাঁর সুস্থতার জন্য যে সাত কুয়া থেকে সাত মশক পানি আনা হয়েছিল এবং সুস্থতার জন্য তাঁর দেহ মুবারককে গোসল দেওয়া হয়েছিল, তা কি বুধবারের ঘটনা, না বৃহস্পতিবারের? ইবনে হাজার ও ইবনে কাসীর রহ. একে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলেছেন। –ফাতহুল বারী ৭/৭৪৮, কিতাবুল মাগাযী ৪৪৪২, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪/১৯৩, সীরাতুন নবী, শিবলী নুমানী ২/১১৩

যদি বুধবারের ঘটনা হয়ে থাকে, তবে সফর মাসের শেষ বুধবার কীভাবে হচ্ছে? রসমের পৃষ্ঠপোষকতাকারীগণ সবাই ইন্তেকালের তারিখ বারো রবিউল আউয়াল বলে থাকেন। সোমবার যদি বারো রবিউল আউয়াল হয়ে থাকে, তাহলে এর আগের বুধবার তো সফর নয়, রবিউল আউয়ালই হচ্ছে।

তাছাড়া এ তথ্যও সঠিক নয় যে, বুধবারের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করেননি। কেননা, এরপর এক রাতে ইশার নামাযের আগে গোসল করার কথা সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। –সহীহ মুসলিম হাদীস ৪১৮ (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন, আররাহীকুল মাখতুম, সফীউদ্দীন মুবারকপুরী পৃ. ৫২৫)

www.eelm.weebly.com

আর একথাও ঠিক নয় যে, বুধবারের পর অসুস্থতায় কোনরূপ উন্নতি হয়নি, বরং এরপর আরেকদিন সুস্থবোধ করেছিলেন এবং যোহরের নামাযে শরিক হয়েছিলেন–একথা সহীহ হাদীসে রয়েছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬৪, ৬৮০ ও ৬৮১, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪১৮, আরাহীকুল মাখতূম ৫২৬, রাহমাতুল্লিল আলামীন, মনসুরপুরী

সোমবার সকালেও সুস্থবোধ করেছিলেন, যার কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. অনুমতি নিয়ে নিজ ঘরে চলে গিয়েছিলেন। –সীরাতে ইবনে ইসহাক ৭১১-৭১২, আর্‌রাওযুল উনুফ ৭/৫৪৭-৫৪৮

৬. সারকথা এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং তাঁর পবিত্র সীরাত ও সুন্নতের অনুসরণ, তাঁর জীবনাদর্শে আপন জীবন গঠন, তাঁর শরীয়তের প্রচার-প্রসার ইত্যাদি হকসমূহ, যা উম্মতের জন্য অবশ্যপালনীয়–এগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং গাফলতির এই প্রকৃত ব্যাধি সম্পর্কে অসচেতন রাখার জন্য এসব ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজের উৎপত্তি।

আল্লাহ্ তাআলা উম্মতকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং রসম ও মুনকারাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন, আমীন।

৭. ইসলামী শরীয়তে ছুটির যে নীতিমালা রয়েছে, সে আলোকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ তারিখের ছুটি থাকা ঠিক নয়।

ভুল মাসআলা

ইহরাম অবস্থায় কি চাদর বা লেপ দ্বারা পা আবৃত করা যায় না?

মিনায় দেখা গেল, এক ব্যক্তি চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন, কিন্তু তার মাথা ও পা অনাবৃত। পা আবৃত করেছিলেন, কিন্তু কয়েকজন মানুষ তাকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভাই, হালতে ইহরামে পায়ের ওপর কাপড় লাগানো মোটেও দুরস্ত নয়।

মনে রাখতে হবে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। ইহরামের হালতে পা ঢাকা যায়, তবে মোজা বা সাধারণ জুতা পরিধান করা জায়েয নয়। চপ্পল বা এ জাতীয় কোন জুতা পরিধান করা জায়েয।

মার্চ-২০০৮

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা

মায়ের মীরাসে কন্যা কি পুত্রের সমান বা দ্বিগুণ পাবে?

এক জায়গায় শোনা গেল, একজন বলছেন, 'পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র দ্বিগুণ ও কন্যা এক গুণ পেয়ে থাকে এটা ঠিক, এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে মায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা পেয়ে থাকে পুত্রের সমান।' আরেকজন কিছুটা সংশয়ের সুরে বললেন, 'না, বরং মায়ের পরিত্যক্ত সম্পদে কন্যার অংশ দ্বিগুণ আর পুত্রের অংশ হল এক গুণ।'

উপরোক্ত দু'টো ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক মাসআলা হচ্ছে পিতা-মাতা যার মীরাসই হোক, তা বণ্টনের পদ্ধতি অভিন্ন। এক্ষেত্রে পদ্ধতি সেটাই যা কুরআন মজীদে এসেছে–

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অতএব মায়ের মীরাসেও ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ।

বলা প্রয়োজন যে, এখানে শুধু উল্লিখিত ভুলটি সংশোধন করে দেওয়া হল, যা দু'জন মানুষের মুখে শোনা গেছে। এদের মতো আরও অনেকের মনেও এ ভুল ধারণা থাকতে পারে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হল। এখানে কুরআনের উপরোক্ত বিধানের উপযোগিতা ও তাৎপর্য আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে ছোট একটি দিক হচ্ছে, বিয়ের আগে ও পরে মেয়েদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এর পরও তারা স্বামীর পক্ষ থেকে মোহর, এরপর সমুদয় সম্পদের এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশের অধিকারী। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর যে প্রাপ্য রয়েছে, সেগুলো যদি তারা পূর্ণরূপে পান, তবেই তাদের ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষিত হবে। নারীর ইসলামী অধিকারগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

একটা জাহেলি রসম

বোন তার অংশ গ্রহণ করলে পিত্রালয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ

পৃথিবীর কোন কোন ভূখণ্ডে যে জাহেলি রসম প্রচলিত রয়েছে, আমাদের দেশেও কোন কোন অঞ্চলে সেটা অনুসৃত হতে দেখা যায়। রসমটা হল, বোনদেরকে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোন অংশ প্রদান না

www.eelm.weebly.com

করা। না ভাই নিজে বোনের অংশ বোনকে বুঝিয়ে দেয়, আর না বোন তা দাবি করার সাহস করে। ঈমানি কমযোরি ও সহীহ ইলমের প্রচার-প্রসার না থাকার কারণে মুসলিম সমাজেও এই জাহেলি রসম অনুপ্রবেশ করেছে এবং এতটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, ভালো ভালো 'দ্বীনদার' পরিবারেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। এমনকি (আল্লাহ্‌র পানাহ) কেউ এটাকে একটা নীতি বানিয়ে নিয়েছেন যে, মীরাস গ্রহণ করার পর তাদের আর আসা-যাওয়ার অধিকার থাকে না। আসা-যাওয়া যদি করতেই হয় তাহলে মীরাস তারা পাবে না।

অথচ বোন-ফুফিদের ব্যাপারে আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন করা একটি স্বতন্ত্র ফরয; মীরাসের অংশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মীরাসে তাদের যে অংশ নির্ধারিত রয়েছে সেটা তাদের প্রাপ্য। এর সঙ্গে আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন করার বিষয়টিকে যুক্ত করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

তারা যদি মীরাসের অংশ গ্রহণ করেন, তবে উত্তম কাজ করেছেন। এজন্য তাদেরকে মোবারকবাদ দেওয়া উচিত এবং তাদের দেখা-শোনা, আদর-আপ্যায়ন আরও বেশি করে করা উচিত।

মনে রাখা উচিত যে, মীরাসের অংশ দাবি করা বা গ্রহণ করার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, এখন আর আত্মীয়তার কোন দায়িত্ব নেই, আত্মীয়তার সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি মিলেছে–এটা শুধু চরম ধরনের ভ্রান্তিই নয়, জঘন্য ধরনের জাহেলি রসম, যার সামনে অন্য বহু রসম ম্লান হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলাই আমাদের অবস্থার ওপর রহম করনেওয়ালা।

একটা ঘৃণ্য মানসিকতা

পুত্র হলে মিঠাই বিতরণ, কন্যা হলে ...

সন্তান হলে আকীকা করা সুন্নত। তবে অনেককে দেখা যায়, তারা সন্তান লাভের আনন্দে মিষ্টিমুখ করান। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। এ কাজটিকে স্বতন্ত্র কোন মাসনুন আমল মনে করা না হলে কিংবা অপরিহার্য নিয়মে পরিণত করা না হলে এটি একটি মুবাহ কাজ। নিয়ত সহীহ হলে এতে সওয়াবেরও আশা করা যেতে পারে। তবে যদি খ্যাতি ও সুনামের জন্য হয় কিংবা সাধ্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তাহলে এতে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। এ কথাগুলো বলা হল মূল বিষয়ের ভূমিকা

www.eelm.weebly.com

হিসাবে। যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হল, অনেক মানুষকে দেখা যায় সন্তান লাভের কারণে মিষ্টি বিতরণ করেন, তবে তা শুধু পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে; কন্যা সন্তানের বেলায় মিষ্টি তো দূরের কথা, ন ভার করে চোখ-মুখ অন্ধকার করে বসে থাকে। এটা খুবই নিন্দনীয় বিষয়। এটা হচ্ছে মনের গভীরে প্রোথিত জাহেলি প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ।

সন্তান- সে পুত্র হোক বা কন্যা, আল্লাহ্ তাআলার অনেক বড় দান ও অনুগ্রহ। কাউকে আল্লাহ্ তাআলা কন্যা দেবেন, কাউকে পুত্র। আবার কাউকে দেবেন উভয়টা। কারও প্রথম সন্তান পুত্র হবে আবার কারও কন্যা। এ সবগুলো একান্তই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর পেছনে কী তাৎপর্য ও উপযোগিতা রয়েছে, তা-ও একমাত্র তিনিই জানেন। এ বিষয়ে মন খারাপ করা এবং কন্যা ও তার মায়ের দিকে বিরক্তি প্রকাশ করা অত্যন্ত নীচু আচরণ। এটা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের অবমাননা।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে জাহেলিয়াত থেকে নাজাত দিন এবং তাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আহা! পিতা-মাতা যদি তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকেই একটুখানি মূল্য দিতেন, যার পরশ তারা সর্বদা লাভ করছেন। সাধারণত এটিই দেখা যায় যে, কন্যার হৃদয়ে পিতা-মাতার জন্য ভালোবাসা অনেক বেশি থাকে এবং তারা পিতা-মাতাকে অনেক কম কষ্ট দিয়ে থাকে।

এছাড়া মুসলমানদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যেখানে তিনি কন্যা সন্তানের তরবিয়তের ওপর অনেক বড় সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি এ কারণে জান্নাতেরও সুসংবাদ শুনিয়েছেন। # এপ্রিল '০৮ঈ.

ভুল চিন্তা

ইসলামে কি কোন সংস্কৃতি নেই?

ইংরেজি শিক্ষিত অনেক ভাই, যারা আলাদাভাবে সঠিক পন্থায় দ্বীনের বুনিয়াদি ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেননি, তাদেরকে এবং অনেক সাধারণ মানুষকেও এই চিন্তাগত ভ্রান্তিতে নিপতিত দেখা যায় যে, ইসলামে আকীদাগত ও বিধি-নিষেধগত কিছু নির্দেশনা রয়েছে; কিন্তু সংস্কৃতিবিষয়ক কোন বিধান ও নির্দেশনা নেই। অর্থাৎ তারা ইসলামকে শুধু কিছু আকীদা ও

www.eelm.weebly.com

আমলের সমষ্টি মনে করে থাকেন। এ ধারণা একেবারেই ভুল। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, যার মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাহযীব। ইসলাম দ্বীন থেকে তাহযীবকে বিচ্ছিন্ন করে না। অতএব এটা সম্ভবই নয় যে, ইসলামের কোন বিশেষ তাহযীব থাকবে না এবং তাহযীব-সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা থাকবে না। ইসলামী বিধিবিধানের প্রথম দুই উৎস– কুরআন ও সুন্নাহয় ইসলামী তাহযীবের উসূল ও আহকাম, মূলনীতি ও বিধিবিধান অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরণ করে অন্যান্য বিষয় যেভাবে স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে, তেমনি তাহযীব-সংক্রান্ত বিধিবিধান, বরং ইসলামী তাহযীবের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাও স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে। ভাষা-বর্ণ-বংশ-গোত্র ও স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের তাহযীব তা-ই, যা ইসলামী তাহযীব।

এ বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিতাব 'ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম মুখালাফাতা আসহাবিল জাহীম' এবং সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর 'তাহযীব ওয়া-তামাদ্দুন' অধ্যয়ন করা ফলপ্রসূ হবে।

ভুল রসম

ফাতেহায়ে ইয়াযদহম-এর কোন শরয়ী ভিত্তি আছে কি?

রসম ও রেওয়াজে অনুরক্ত লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম নামেও একটি রসম পালন করে থাকে। 'ইয়াযদহম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'একাদশ'। অর্থাৎ রবিউস সানির এগার তারিখে কৃত ফাতেহা বা ঈসালে সওয়াব মাহফিল। বলা হয়ে থাকে, এ তারিখে বুযুর্গ-ওলী শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ইন্তেকাল হয়েছিল। তাই তাঁর ওফাতদিবস পালন করার উদ্দেশ্যে এই রসমের সূচনা করা হয়। আল্লাহ্‌র ওই বান্দারা এ বিষয়টি চিন্তা করেনি যে, ইসলামে না জন্মদিবস পালন করা হয়, না মৃত্যুদিবস, না শায়েখ জিলানী রহ. তাঁর কোন শায়েখের জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস পালন করেছেন, না তার কোন খলীফা বা শাগরিদ তা পালন করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এই ভিত্তিহীন রসম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের চিন্তা করা আর তাতে ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করা বাতুলতা মাত্র।

এদিকে মজার বিষয় এই যে, গিয়ারভীর এই রসম এ তারিখে এ জন্যই পালন করা হয় যে, এটা শায়েখ জিলানীর ওফাত দিবস।

www.eelm.weebly.com

যারা এটা পালন করে থাকে, তাদের কর্তব্য ছিল ইল্‌মে তারীখ ও আসমাউর রিজালের দু-চারটি কিতাব উল্টে-পাল্টে দেখা যে, সত্যি সত্যিই তাঁর ওফাত এগার তারিখে হয়েছে কি না?

আমরা তারীখ ও রিজালের মৌলিক গ্রন্থগুলোতে শায়েখ জিলানীর জীবনালোচনা পড়েছি। কোথাও এগার রবিউস সানির কথা নেই। আট, নয় বা দশ রবিউস সানি ৫৬১ হিজরীর কথা উল্লেখ হয়েছে।

দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ১৫/১৮৯, আলমুনতাযাম, ইবনুল জাওযী ১৮/১৭৩, যাইলু তবাকাতিল হানাবিলা, ইবনে রজব ১/২৫১, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৮/৩৯৫, শাজারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৪/২০২, তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৩৯/৬০

পরবর্তী কোন কিতাবে এগার তারিখের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা হলেও লেখক নিজেই দশ রবিউস সানির মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। –ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৭৬-৭৭

গত ১৮.০৪.০৮ঈ.-এ একটি দৈনিক পত্রিকায় দেখতে পেলাম, ফাতেহা ইয়াযদহমের প্রথাগত এক মাহফিলের জনৈক বক্তার কিছু কথা ছাপা হয়েছে। পীরে তরীকত ও আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের মহাসচিব বলে বক্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, শায়েখ জিলানী রহ. শরীয়ত ও তাসাওউফ বিষয়ের শিক্ষা পীর আবু সাঈদ মাখজুমী থেকে লাভ করেছেন। অথচ শায়েখের উস্তাদের নাম আবু সাদ মুখাররিমী, আবু সাঈদ মাখজুমী নয়। যাক এটা তো শুধু নামের ভুল, কিন্তু অবাক হলাম যখন তার বরাতেই একথাও উদ্ধৃত দেখা গেল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তিনি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।'

যদি কোন সাধারণ লোকের মুখেও এ কথা শোনা যেত, তাহলেও অবাক হওয়ার মতো ছিল। কারণ তাওহীদে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের অজানা নয় যে, জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই হাতে। এটি কোন মাখলুকের সাধ্যে নেই। থাকতেও পারে না। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে মানুষ আল্লাহ্‌র ওলী হতে পারে, কিন্তু যে বিষয়গুলোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন, সেগুলোর কেউ অধিকারী হতে পারে না।

যদি 'ফাতেহায়ে ইয়াযদহম'এর মাহফিলে এমন আলোচনা হয়ে থাকে, তাহলে তো এটা শুধু রসম-রেওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিরক ও বিদআতের প্রচারকও বটে।

www.eelm.weebly.com

এটা কি হাদীস
সালাম দিলে নব্বই নেকি আর জবাব দিলে দশ নেকি

ওপরের কথাটা বেশ প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে, এটা হাদীস কি না? আমাদের জানা মতে এ কথাটা হাদীসের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে নেই; বরং একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, সালামে শুধু 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বললে দশ নেকি, 'ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ' বৃদ্ধি করলে বিশ নেকি এবং 'ওয়া-বারাকাতুহ'সহ পুরো সালাম বললে ত্রিশ নেকি পাওয়া যায়। দেখুন, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫৩, জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৯

তাই ওই প্রচলিত কথাটির পরিবর্তে হাদীসের উল্লিখিত বিষয়টি প্রচার করা উচিত। # মে '০৮ঈ.

একটা চরম ভ্রান্তি
সুফীবাদই কি প্রকৃত ইসলাম?

ইসলাম তাওহীদ ও রিসালাত এবং দ্বীন ও শরীয়তের নাম। আকাইদ ও ইবাদত যেমন ইসলামের অংশ, তেমনি মুআমালা, মুআশারা ও আখলাক-সংক্রান্ত বিধি-বিধানও ইসলামের অংশ। ইসলামে যেমন ইবাদত-সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে, তেমনি লেনদেন, জীবন-যাপন এবং চরিত্র ও প্রবণতা-সংক্রান্ত বিধি-বিধানও রয়েছে। ওয়ায-নসীহতের বিষয় যেমন ইসলামে রয়েছে, তেমনি আমর বিল-মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদের বিধানও রয়েছে। ব্যক্তি-সংশোধন ও পরিবার-সংশোধনের বিষয় যেমন আছে, তেমনি সমাজ ও সভ্যতা, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আইন ও বিচারের বিষয়টিও রয়েছে।

আত্মশুদ্ধি তথা মানুষের ভেতরগত প্রেরণা এবং চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান যে শাস্ত্রে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তার নাম হয়ে যায় 'তাসাওউফ'।

অতএব 'তাসাওউফ' নামের বিষয়টি শরীয়তের বাইরের কোন বিষয় নয়, আবার তা পূর্ণ শরীয়তও নয়। এটি হল শরীয়তের বিধি-বিধানের একটি অংশ।

মানুষ শুধু তখনই মুসলিম হতে পারে যখন সে তাওহীদের সঙ্গে পূর্ণ শরীয়তের ওপর ঈমান আনবে এবং শরীয়তকে সমর্পিত হৃদয়ে গ্রহণ করবে।

www.eelm.weebly.com

শুধু তাওহীদ স্বীকার করে কিংবা শরীয়তের শুধু একটি অংশকে গ্রহণ করে মানুষ 'মুসলিম' হবে–এ চিন্তার কোন স্থান নেই ইসলামে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

এটিই হল ইসলামের সঠিক পরিচয়, যা কুরআন সুন্নাহয় উল্লেখ হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। আর এটি ইসলামের প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা পরম্পরায় সর্বজন বিদিত। এর বিপরীতে মুলহিদ ও ধর্মদ্রোহী শ্রেণি নিজেরা ভিন্নতর 'তাসাওউফ' প্রণয়ন করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সেটা এক আলাদা জীবনব্যবস্থা। এর মূল ভিত্তিটা হল প্রবৃত্তির অনুগামিতা এবং কর্ম ও চরিত্রগত ক্ষেত্রে বিধিবন্ধন-হীনতা। অথচ প্রতারণামূলকভাবে এই উশৃঙ্খলারই নাম তারা দিয়েছে 'তাসাওউফ'। যাতে হক্কানি সুফিয়ায়ে কেরামের নিকটে স্বীকৃত বিষয়টির সঙ্গে শুধু নামগত সাদৃশ্য দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা যায়। তবে মিথ্যা মিথ্যাই, যতই তার বেশ-ভূষা পরিবর্তন করা হোক, তার প্রকৃত পরিচয় কখনও গোপন থাকে না। যেদিন থেকে এই বিষয়টির উদ্ভব, সেদিন থেকেই কুরআন সুন্নাহর পারদর্শী মনীষীগণ তাসাওউফের আবরণ গ্রহণকারী এই প্রতারক গোষ্ঠীকে সর্বসম্মতভাবে বেদ্বীন ও যিন্দীক ঘোষণা করেছেন এবং পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এরা বাতেনি ও ইবাহি সম্প্রদায়েরই একটি শাখা।

এ যুগটা উন্নতির (?) যুগ। অতএব অতীতের বেদ্বীনি তাসাওউফও এখন উন্নতি করে পরিণত হয়েছে 'সুফীইজমে'।

প্রকৃত 'তাসাওউফ' যেহেতু শরীয়তের সবচেয়ে কঠিন অংশ– অন্তরের পরিশুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই শরীয়তের ওপর ঈমান রাখেন এমন অনেকেও এ অঙ্গন সম্পর্কে পলায়নপর মানসিকতা পোষণ করেন; কিন্তু আজকালের 'সুফীবাদ' এতই মজার বিষয় যে, সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরাও এতে আগ্রহ বোধ করেন। এমনকি আগাচৌ সাহেবকেও এ বিষয়ের একজন রসিক সমঝদার হিসাবে দেখা গেল। তার দাবি হল দ্বীন ও শরীয়ত নয়, সুফীবাদই হল প্রকৃত ইসলাম। নাউযুবিল্লাহ!

এ যুগের ধর্মদ্রোহী সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরাই যখন এ মতবাদের প্রচারক তখন এটা বোঝা কারও পক্ষেই কঠিন নয় যে, ইসলামী তাসাওউফের সঙ্গে এই সুফীবাদের কোনই সম্পর্ক নেই; বরং এটা হল ইসলামকে অস্বীকার করারই একটি পন্থা।

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত তাসাওউফ শরীয়তে মুহাম্মাদিরও শাখা এবং এই তাসাওউফের ধারক-বাহকগণ আমর বিল-মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার, জিহাদ, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রপরিচালনা, আইন ও বিচার প্রভৃতি বিভাগকে স্বীকার করেন। তারা ইসলামকে দ্বীনে তাওহীদ এবং পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের সমষ্টি মনে করেন, যার রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি।

সারকথা এই যে, আজকাল কিছু কিছু পাশ্চাত্যজীবী চিন্তাবিদ ও সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরা সুফীবাদের যে রূপ-কাঠামো পেশ করে থাকে, তার সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ইল্‌মে তাসাওউফের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রসঙ্গে গাযযালী ও রূমীর নাম ব্যবহার করাও নির্জলা প্রতারণা ও মিথ্যাচার। এই সুফীবাদকে প্রকৃত ইসলাম বলে উল্লেখ করা ইসলামকে অস্বীকার করার এক জঘন্য ও চাতুরিপূর্ণ পদ্ধতি।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা হেফাযত করুন।

এটা কি হাদীস?

'আস্‌সালাতু মিরাজুল মুমিনীন'

'নামায মুমিনের মেরাজ' কথাটা একটা প্রসিদ্ধ উক্তি। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন, কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাওয়া যায় না। তাই একে প্রসিদ্ধ উক্তি হিসাবেই বলা উচিত, হাদীস হিসাবে নয়।

এ ব্যাপারে হাদীস বলতে হলে নিম্নোক্ত কোন সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করা যায়-

'মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩

'তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে একান্তে কথা বলে, যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে।' -সহীহ্ বুখারী, হাদীস ৪২৬ # আগস্ট '০৮ঈ.

ওভাবে নয় এভাবে বলুন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের এই পরিচয় তার অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক কালেমা পাঠকারী মুসলমানের এ বিষয়টি জানা থাকা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আলকাউসারে বেশ কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আগস্ট '০৮ পৃ. ৪১ এবং জুমাদাল উখরা ১৪২৯ হি. পৃ. ৭-৮

www.eelm.weebly.com

সংখ্যায়ও এ বিষয়ে লেখা হয়েছে। এখন আমি যে কথাটি আরয করতে চাই তা হচ্ছে, উপরোক্ত বিষয় ব্যক্ত করার জন্য অনেকে নিম্নোক্ত বাক্য ব্যবহার করে থাকেন–

'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা' বাক্যটি খুবই প্রচলিত। আমি সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মরহুম (১৯০৩ ঈ.-১৯৭৯ ঈ.)-এর একজন অনুসারীকে শুনেছি, তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে কাউকে লক্ষ করে বলছিলেন, 'এ বাক্যটি আজ সবাই ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু জানেন এর প্রথম ব্যবহার কে করেছিলেন?'

কথাটা সত্য। আমাদের জানা মতে এ-বাক্যটা আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের কোন মনীষীর নয় এবং বাক্যটা আপত্তিকর। কেননা, এখান থেকে যে মর্ম নির্গত হয় তা হচ্ছে, ইসলাম শুধু একটি ব্যবস্থা ও বিপ্লবী মতবাদমাত্র কিংবা ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা এবং এ পর্যন্তই। বলাবাহুল্য, এই চিন্তাধারা কুরআন সুন্নাহর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং ইসলামের মৌলিক চেতনার পরিপন্থী। আমাদের মতে উপরোক্ত বাক্যটি সংশোধন করে এভাবে বলা উচিত যে, 'ইসলামে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা রয়েছে।' অর্থাৎ ইসলাম শুধু জীবন-ব্যবস্থার নাম নয়; বরং ইসলামের অনন্যসাধারণ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একটি এই যে, সে তার অনুসারী ও আস্থাশীলদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত ও পরিপূর্ণ সংস্কৃতি প্রদান করেছে, যার মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের যথার্থ নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে এবং যা সকল শ্রেণির ও সকল যুগের মানবতার জন্য অনুসরণযোগ্য এবং যাতে সকল শ্রেণির কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মোটকথা, নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা পেশ করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তবে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এটি ইসলামের অনেক বড় অংশ, তবে এটিই পূর্ণ ইসলাম নয়।

ভুল ধারণা

ঈদের জন্য কি সবকিছুই নতুন হওয়া মাসনুন?

সঠিক মাসআলা এই যে, ঈদের দিন বিদ্যমান কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাপড় পরিধান করবে এবং তা যেন অবশ্যই পরিষ্কার হয়। কিন্তু সমাজের প্রচলন বিষয়টিকে এমন বিকৃত করেছে যে, যেন ঈদ উপলক্ষে নতুন কাপড় পরা এবং ঘরের সবাইকে নতুন কাপড় পরানো একটি মাসনুন কাজ?

www.eelm.weebly.com

এরপর শুধু কাপড়ই নয়, বরং জুতো-মোজা, টুপি-গেঞ্জি ইত্যাদি সবই নতুন চাই। এমনকি যথাসম্ভব ঘরের আসবাবপত্রও নতুন হওয়া চাই।

মনে রাখা উচিত যে, এই ধারণা ঠিক নয়। মাসনুন শুধু এটুকু যে, ঈদের দিন গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবে, যা বিদ্যমান কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আলকাউসার সেপ্টেম্বর '০৮ সংখ্যায় ১৩-১৬পৃ. দেখা যেতে পারে।

এটা কি হাদীস?

দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার...

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন। তাঁর পরে আর কোন নতুন নবী বা নতুন রাসূল নেই। এই দু'জন এবং এঁদের মধ্যে আরও যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে। বিশেষত যাদের নাম আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের ওপর আমরা সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান রাখি যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার সত্য নবী এবং প্রিয় বান্দা। আর যাঁদের নাম ও ঘটনা কুরআন হাদীসে আসেনি, আমরা তাঁদের সম্পর্কে নাম-পরিচয়ের সুনির্দিষ্টতা ছাড়াই ঈমান রাখি।

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর।'

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হযরত আদম আ. থেকে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সর্বমোট কতজন নবী এসেছেন? আসলে এর সংখ্যা জানা অপরিহার্য নয়।

তাছাড়া এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়েতও বিভিন্ন ধরনের। তবে এ প্রসঙ্গে একটি সংখ্যা অর্থাৎ দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারও উল্লেখ করা হয়। এ সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, এ সংখ্যা কোন রেওয়ায়েতে এসেছে কি না? এসে থাকলে তা কোন কিতাবে?

www.eelm.weebly.com

আমি এটা অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। শেষে মোল্লা আলী কারী রহ.-এর 'ইক্দুল ফারাইদ ফী তাখরীজি আহাদীসি শরহিল আকাইদ'-গ্রন্থে (ক্রমিক নং ৩৭)-এ উক্তি পেলাম যে, জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেছেন-

لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ

অর্থাৎ এ কথা আমি কোন রেওয়ায়েতে পাইনি। # সেপ্টেম্বর '০৮ঈ.

ভুল চিন্তা

ওযরের হালতে কি মাসআলা নেই?

কারও কারও চিন্তার ধারাই অতি অদ্ভুত। তারা যেন মনে করেন, ওযরের হালতে মানুষ শরয়ী বিধি-বিধানের অধীন থাকে না। এজন্য তারা একটা নিয়ম বানিয়ে নিয়েছেন যে, 'ওযরের সময় কোন মাসআলা নেই।' তাদের ধারণা যেন এই যে, ওযরের কারণে মানুষ সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যায়, কোন ধরনের নিয়মনীতির অধীন সে থাকে না।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং এই চিন্তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সঠিক বিষয় এই যে, ওযরের হালতেও মানুষ শরীয়তের অধীন থাকে। মাযুর ও অপারগের জন্যও শরীয়তে বিধান রয়েছে, যা ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। ওযরের মাসায়েলের প্রসিদ্ধ শিরোনাম হল 'আররুখসা।' এই শিরোনামে স্বতন্ত্র কিতাবপত্রও রচিত হয়েছে।

তাই মুমিনের করণীয় এই যে, ওযরের বাহানায় শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে অবহেলা না করা; বরং প্রথমেই জেনে নেওয়া উচিত যে, যে বিষয়কে ওযর মনে করা হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ওযর কি না? যদি শরীয়তের দৃষ্টিতেও তা গ্রহণযোগ্য ওযর হিসাবে গণ্য হয়, তাহলে এ অবস্থায় শরীয়তের বিধান কী তা জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। ওযরকে বাহানা বানানো কিংবা সঠিক মাসআলা না জেনে অনুমানের ওপর কাজ করা–কোনটাই উচিত নয়। ইনসানের কোন অবস্থাই শরীয়তের বিধান থেকে মুক্ত নয়। তাই এ-ধারণার কোনই অর্থ নেই যে, 'ওযরের হালতে কোন মাসআলা নেই।'

হ্যাঁ, ওযর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সাধারণ অবস্থার বিধান থেকে এ অবস্থার বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে। তাহলে বলা যায় যে, 'ওযরের মাসায়েল ভিন্ন'। এমন নয় যে, ওযরের কোন মাসআলাই নেই–এই অবস্থায় যা ইচ্ছা তা-ই বলা যাবে, যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে। নাউযুবিল্লাহ!

www.eelm.weebly.com

ভুল মাসআলা

সফরের হালতে কি রোযা ভাঙার অনুমতি আছে, না না-রাখার?

শরয়ী সফরে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে পরে এই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। উত্তম এই যে, শরয়ী সফরেও এই রুখসত অনুযায়ী আমল না করে রোযার হালতে থাকা। কেননা পরে কাযা আদায় করা হলেও তো রমযানের বরকত পাওয়া যাবে না।

এই মাসআলা কেউ কেউ এভাবে বলে থাকেন, 'সফরের হালতে রোযা ভাঙা জায়েয আছে।' এভাবে বলা ঠিক নয়। কেননা, এতে ধারণা হয় যে, সফরের হালতে রোযা আরম্ভ করার পরও তা ভেঙে ফেলা জায়েয কিংবা রোযা শুরু করার পর সফরে রওনা হলে রোযা ভেঙে ফেলা জায়েয। অথচ এটা ঠিক নয়। রোযা শুরু করার পর তা ভাঙা জায়েয নয়।

ভুল ধারণা

খতম কি ইমাম সাহেবের মাধ্যমে বখশানো জরুরি?

গ্রামাঞ্চলের মসজিদগুলোতে এবং শহরেরও কোন কোন মসজিদে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেবের কাছে মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে এই আবেদন এসে থাকে যে, 'অমুক ব্যক্তি কুরআন মাজীদ খতম করেছেন, তা বখশে দেবেন।'

তাদের আবেদনের ভঙ্গি থেকে অনুমিত হয় যে, কুরআন মাজীদ খতম করার পর ইমাম সাহেবের মাধ্যমে বা কোন বুযুর্গের মাধ্যমে তা বখশানোকে তারা জরুরি মনে করেন।

এই ধারণা ঠিক নয়। কুরআন মাজীদ খতম করা অনেক বড় ইবাদত, যা মূলত একটি ইনফেরাদি ইবাদত। প্রয়োজন ছাড়া অন্যকে এ বিষয়ে অবগত করাও মুনাসিব নয়। আল্লাহ্ তাআলার জন্য পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা দেখেছেন, এ-ই যথেষ্ট। যদি এই খতমের সওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছাতে হয়, তবে মুখে বলারও প্রয়োজন নেই, শুধু মনে মনে এটুকু বললেই হবে যে, ইয়া আল্লাহ্, এর সওয়াব সকল মুসলিম কবরবাসীর আমলনামা বা অমুক অমুকের আমলনামায় পৌঁছে দিন। সওয়াব বখশানোর জিনিস নয়, যা অন্যের মাধ্যমে বখশাতে হবে। শুধু সওয়াব রেসানী অর্থাৎ সওয়াব পৌঁছে দেওয়ার নিয়ত করাই যথেষ্ট।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়

طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقُلُوْبَ

মৃতদের কেন্দ্র করে যে খাবার খাওয়ানো হয় তা অন্তর মেরে ফেলে

এটা একটা উক্তি, যার অর্থ হচ্ছে, মৃতদের ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন বা খতমে তাহলীল করা হয় এবং উপস্থিত লোকদের জন্য খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। যেহেতু ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন আমল করে তার বিনিময়ে খাবার খাওয়া বা খাওয়ানো জায়েয নয়, তাই এই খাবারের দিকে আগ্রহ লোভ-লালসার পরিচায়ক, যা অন্তরকে প্রাণহীন করে দিতে পারে। একই কথা কারও মৃত্যুর সময় যিয়াফতের খাবার প্রসঙ্গেও। যিয়াফত আনন্দের সময় করা হয়ে থাকে, দুঃখ-মসিবতের সময় নয়। এই সময় যিয়াফতের কোন বৈধতা শরীয়তে নেই। তাই এ-ধরনের খাবার নূরহীন ও বরকতহীন হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, এ-ধরনের খাবার অন্তরকে ক্লেদাক্ত করা খুবই স্বাভাবিক। তাই বুযুর্গগণ বলেছেন, মৃতের খাবার অন্তর মেরে ফেলে। এটা বুযুর্গদের উক্তি, হাদীস নয়। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা ঠিক নয়। –ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আবদুল আযীয দেহলভী ২০২

উল্লেখ্য, গরীব-মিসকীনকে আহার করানো অনেক বড় সওয়াবের কাজ এবং তা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, হালাল পয়সায় হতে হবে, নিজের সম্পদ দ্বারা হতে হবে, অবন্টিত মীরাসের সম্পদ থেকে না হতে হবে, প্রচলিত তারিখগুলোতে (তৃতীয়, দশম, চল্লিশতম দিনে, শবে বরাত ইত্যাদিতে) না হতে হবে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, কাউকে খাবার খাওয়ালে ওই সময় খতম পড়াবে না, আর যদি খতম পড়ানো হয় তাহলে খাবার খাওয়াবে না এবং কোন হাদিয়াও দেবে না।

তাছাড়া অন্যের মাধ্যমেই ঈসালে সওয়াব করাতে হবে–এরই বা কী অপরিহার্যতা? প্রত্যেকে নিজেই ঈসালে সওয়াব করতে পারে। কিছু দান-সদকা করা হল, নফল নামায পড়া হল, সূরা ইখলাস তিনবার পড়া হল, আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের ক্ষমার জন্য দুআ করা হল–এই সবগুলোই ঈসালে সওয়াব হিসাবে গণ্য হতে পারে। আল্লাহ তাআলা তওফীক দান করুন। # অক্টোবর '০৮ঈ.

www.eelm.weebly.com

মিনার জামারাগুলো কি স্মারক বা ভাস্কর্য?

আমার জানা মতে উপরোক্ত ভ্রান্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত নয়। তবে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ কথাটা লেখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা পড়ে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন।

ওই সাময়িকীতে বলা হয়েছে যে, 'মিনার জামারাগুলো হচ্ছে ভাস্কর্য। তেমনি আরাফার ময়দানে হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ.-এর সাক্ষাৎস্থলে যে স্তম্ভ রয়েছে, তাতে ছবিও রয়েছে। তাই এটাও ভাস্কর্যের মধ্যে গণ্য।'

যারা এই অসত্য কথাগুলো লিখেছেন, তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। তারা এভাবে তাদের ভাস্কর্যপ্রীতির পক্ষে সমর্থন পেশ করতে চান এবং ইসলামের নিদর্শনগুলো সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদেরকে এই ধারণা দিতে চান যে, বিষয়টা ইসলাম ধর্মেও রয়েছে! কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই এই অপচেষ্টাগুলো কখনও সফল হবে না।

মিনার জামারাগুলো ভাস্কর্যও নয়, কোন স্মারকস্তম্ভও নয়। এগুলো একটা বিশেষ স্থান নির্দেশ করার চিহ্নমাত্র, যে তিন স্থানে হযরত ইবরাহীম আ. শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, ওই স্থানগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য তিনটি স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। স্থানগুলোতে কোন প্রাণীর ছবি তো দূরের কথা, কোন জড়বস্তুরও ছবি নেই এবং এগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মারক হিসাবেও স্থাপিত হয়নি। তাহলে এগুলোকে ভাস্কর্য বা স্মারকস্তম্ভ কীভাবে বলা যায়?

যদি এগুলো ভাস্কর্যই হত তবে কার স্মরণে? শয়তানের স্মরণে কি? যে শয়তানের অপদস্থতার জন্যই ওই স্থানগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে একে ভাস্কর্য বলা কি ভাস্কর্য শব্দেরই অপপ্রয়োগ নয়?

আরাফার ময়দানে আদম-হাওয়ার (আলাইহিমাস সালাম) সাক্ষাৎস্থল হিসাবে কোন স্থান নির্ধারিত নেই এবং এমন কোন বিষয় প্রমাণিতও নয়। আরাফায় জাবালে রহমতের ওপর সাদা রংয়ের ছোট একটা স্তম্ভ রয়েছে, যা প্রতিবছর হাজার হাজার হাজী সাহেবের দৃষ্টিগোচর হয়। এতে কোন ধরনের ছবি নেই। মিথ্যাই যদি বলতে হয়, তাহলে এমন মিথ্যা কেন যে, শোনামাত্রই লোকেরা বলবে, 'সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম।' এ যে এক নির্জলা মিথ্যা।

www.eelm.weebly.com

ওই স্তম্ভ জাবালে রহমতকে চিহ্নিত করার জন্য স্থাপিত। আরাফার সবদিকেই পাহাড়। এর মধ্যে কোন্ পাহাড়টা জাবালে রহমত, যার পাদদেশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের খুতবা দিয়েছিলেন, তা যেন লোকেরা সহজেই চিনতে পারেন, তাই এই চিহ্ন সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। একে ভাস্কর্য বলে দাবি করা মিথ্যাচার ছাড়া আর কী হতে পারে?

ভুল মাসআলা

ইহরাম অবস্থায় কি মীকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়?

কারও কারও এই ধারণা আছে যে, ইহরাম বাঁধার পর হজ-ওমরা সম্পন্ন করার আগে মীকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। এই ধারণা ভুল। ইহরামের হালতেও মীকাত থেকে বের হওয়া যায়। এতে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন কেউ ইফরাদ বা কিরান হজের ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় গিয়েছেন। তওয়াফ ইত্যাদি করার পর যেহেতু হজের এখনও দেরি আছে, তাই হজের আগেই মসজিদে নববীর যিয়ারত করার ইচ্ছা করলেন। তো এতে কোন দোষ নেই। হ্যাঁ, বিনা প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে কেন যাবে? হরমের বাইরেই বা যাবে কেন?

হাদীস নয়

আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক নওশেরওঁয়ার যুগে

কার কারও মুখে শোনা যায় যে তারা–

وُلِدْتُ فِيْ زَمَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ نُوْشِيْرْوَان

এই বাক্যটাকে হাদীস মনে করেন এবং এই কথাটাকে সঠিক মনে করেন অথচ এটা একটা ভিত্তিহীন বর্ণনা। যেমন মুহাদ্দিস সনআনী প্রমুখ বলেছেন, এটা একটা মওযূ রেওয়ায়েত। এ প্রসঙ্গে হালীমী রহ. সুন্দর কথা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের ও মুশরিককে কীভাবে 'আদিল' বলতে পারেন?'

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণতা বা আদালত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ তাআলার হক ও বান্দার হক আদায় করা দুটোই এর জন্য অপরিহার্য। তাই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এবং শরীয়তের বিধান অনুসারে প্রজাসাধারণের হক আদায় করা ছাড়া ন্যায়পরায়ণ উপাধি

www.eelm.weebly.com

লাভ করার সুযোগ নেই। –আলমাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী ৪৫৪, আলমাসনু, মোল্লা আলী কারী ২০৪, কাশফুল খাফা, আজলূনী ২/৩০৮ # নভেম্বর '০৮ঈ.

ভুল ধারণা

হজে কি মহিলাদের পর্দা করতে হয় না?

মক্কায় এক ভাই বলছিলেন, তার এক আত্মীয়া বাড়িতে খুব গুরুত্বের সঙ্গে পর্দা করেন, শুধু নামের পর্দা নয়, শরয়ী পর্দা; কিন্তু হজ করতে এসে পর্দা বাদ দিয়েছেন। তার কথা হল, 'হজের সময় মেয়েদের পর্দা করা লাগে না।' অনেক দ্বীনদার মহিলা এ ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। এটা একটা ভুল ধারণা। ইহরামের হালতেও গায়রে মাহরামের সঙ্গে মেয়েদের পর্দা করা অপরিহার্য। এটা ঠিক যে, ইহরামের হালতে মুখমণ্ডলে কাপড় লাগানো নিষেধ, কিন্তু মুখে কাপড় লাগানো এবং গায়রে মাহরামের সামনে ইচ্ছা করে মুখ খোলা রাখা এক বিষয় নয়।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'ইহরামের হালতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা যখন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, তো আমরা আমাদের চাদর মাথার সামনে ঝুলিয়ে দিতাম। চলে যাওয়ার পর সরিয়ে ফেলতাম।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৮৩৩

এরপর মুখে কাপড় না লাগানোর বিধান তো শুধু ইহরামের হালতে প্রযোজ্য। উমরায় খুব বেশি হলে এক-দু'দিন এবং হজে তিন-চারদিন। (তবে যদি কেউ ইফরাদ বা কিরানের নিয়তে ইহরাম বাঁধে তার বিষয় ভিন্ন।) এই দিনগুলো ছাড়া যারা বেপর্দা চলে তাদের তো ইহরামেরও অজুহাত নেই।

তাছাড়া মদীনা মুনাওয়ারার সফরে তো ইহরামের প্রশ্ন নেই। এই সফরে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের দিনগুলোতে মুখ খুলে রাখা এবং সকল গায়রে মাহরামকে মাহরাম মনে করা অবশ্যই অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং অযথা গোনাহগার হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মোবারক সফরের পূর্ণ বরকত লাভের জন্য সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। –কিতাবুল হজ, মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী ২৮-২৯

ভুল কাজ

মাঝে অনেক ফাঁকা রেখে ইকতেদা করা

হজের সফরে একটা ভুল অনেক হাজীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা হারাম শরীফ থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে হারাম শরীফের জামাতের সঙ্গে ইকতেদা

www.eelm.weebly.com

করে। অথচ মাসআলা এই যে, মসজিদের বাইরে ইকতেদা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, কাতার মিলিত হতে হবে। কাতারের মাঝে কোন রাস্তা, নদী অথবা খালি ময়দান থাকলে ইকতেদা সহীহ হবে না। কিন্তু সেখানকার অবস্থা এই যে, অনেক সময় কিছু লোক রাস্তার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করে, মাঝে রাস্তা।

কেউ কেউ মসজিদে হারাম থেকে অনেক দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইকতেদা করে, এমনকি তাকবীরের আওয়াযও ঠিকমত শুনতে পায় না। অথচ পাশের মসজিদের তাকবীরের আওয়ায তার কানে আসছে। মনে রাখবেন, এত বেশি ফাঁকা রেখে ইকতেদা করলে ইকতেদা সহীহ হয় না। এই কারণে নামাযও সহীহ হয় না। তাই কর্তব্য হল সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাঁড়ানো কিংবা নিকটবর্তী কোন মসজিদের জামাতে শরিক হওয়া অথবা কয়েকজন মিলে নিজেরা জামাত করা। হারাম শরীফের এক নামাযে এক লাখ নামাযের সওয়াবের আশায় ভুল পন্থায় ইকতেদা করা সহীহ হবে না। এভাবে এক রাকাতেরও সওয়াব পাওয়া যাবে না।

ভুল ধারণা

হারাম শরীফে একটি গোনাহও কি লক্ষ গোনাহের সমান?

হারাম শরীফে এক ব্যক্তি অন্য আরেকজনকে বলছিলেন যে, 'হারাম শরীফের একটি গোনাহ এক লক্ষ গোনাহের সমান। এদিকেও আমাদের লক্ষ রাখা দরকার।'

মসজিদে হারামে এক রাকাত নামায এক লক্ষ রাকাতের সমান–এ কথা সহীহ হাদীসে আছে। তবে মসজিদের বাইরে ও পুরো হারাম শরীফে এই সওয়াব পাওয়া যাবে–এটা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু ওই লোকটি সওয়াবের সঙ্গে তুলনা করে গোনাহকেও এক লক্ষ বানিয়ে দিয়েছে, সেও আবার পুরো হারাম শরীফে, অথচ আল্লাহ্ তাআলা রহমান ও রহীম, তিনি বান্দার সওয়াব বাড়িয়ে দেন। একটি সওয়াবের কাজে কমপক্ষে দশটি সওয়াব দান করেন। এক রাকাতকে হাজার রাকাতের সমান করে দেন, লক্ষ রাকাতের সমান করে দেন। কিন্তু গোনাহের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি হল একটি গোনাহ একটিই গণ্য হয়। তবে একথা ভিন্ন যে, কেউ হারাম শরীফে গোনাহ করলে হারাম শরীফের সম্মান ক্ষুণ্ন করার অপরাধও তার ওপর বর্তায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এক গোনাহ করার দ্বারা এক লক্ষ গোনাহ লেখা হবে।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়

আশুরার দিন কেয়ামত হওয়া প্রসঙ্গে

আশুরা দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে, 'হাদীস শরীফে এসেছে, এই দিনে কেয়ামত সংগঠিত হবে।'

এই কথাটা ঠিক নয়। যে বর্ণনায় আশুরার দিন কেয়ামত হওয়ার কথা এসেছে, তা হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাল।

আল্লামা আবুল ফরয ইবনুল জাওযী ওই বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 'এটা নিঃসন্দেহে মওযূ বর্ণনা ...।' হাফেয সুয়ূতী রহ. ও আল্লামা ইবনু আররাক রহ.ও তাঁর ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছেন। –কিতাবুল মওযূআত ২/২০২, আললাআলিল মাসনূআ ২/১০৯, তানযীহুশ শরীআতিল মারফূআ ২/১৪৯

তবে জুমার দিন কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে। দেখুন, জামে তিরমিযী ২/৩৬২, সুনানে আবু দাউদ ১/৬৩৪, সুনানে নাসায়ী ৩/১১৩-১১৪ # জানুয়ারি '০৯ঈ.

ভ্রান্ত বিশ্বাস

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এরও কি আসমায়ে হুসনা রয়েছে?

আল্লাহ্ তাআলার অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে, যেগুলোকে কুরআন মাজীদে 'আলআসমাউল হুসনা' বলা হয়েছে। আর এ নামগুলো শুধু ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। ওহীর মাধ্যমে অনেক নাম জানানোও হয়েছে। এর মধ্যে নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে এই বিশেষ ফযীলত বিবৃত হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি এই নামগুলো আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' –সহীহ বুখারী ২/৯৪৯, সহীহ মুসলিম ২/৩৪২

কুরআন হাদীস থেকে খুঁজে বুযুর্গগণ ওই নামগুলো সংকলন করেছেন, যা জামে তিরমিযী ও সহীহ বুখারীর শরহ যেমন– ফাতহুল বারী ইত্যাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এই নামগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে সালাফ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। কুরআন হাকীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

www.eelm.weebly.com

তাই আসমায়ে হুসনা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই এবং তাঁকে ওই নামগুলো দিয়েই ডাকা উচিত। এই নামেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত এবং এসবের দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে করুণা কামনা করা উচিত।

এটি শুধু আল্লাহ তাআলারই হক। আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নাম জপা, অন্য কারও নামের ওযীফা পড়া, দূর থেকে তাকে আহ্বান করা কিংবা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বের কোন বিষয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করা, এগুলো সবই শিরক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ আমাদের অনেক কালেমা পাঠকারী ভাই উপরোক্ত শিরকি-বিদআতে লিপ্ত। তারা পীরের নামের ওযীফা পড়ে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেরা পীরের বিভিন্ন নাম উদ্ভাবন করে, কিছু তো একেবারেই আজব অর্থহীন; কিছু নাম শিরকের বাহক। এরপর এসব নামকে 'আসমায়ে পাক' নাম দিয়ে জপতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার 'আসমায়ে হুসনা'র মতো এই নামগুলোর ওযীফা পাঠ করে। কোন কোন ওযীফার কিতাবে মূর্খরা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর ১৯৯ নাম তৈরি করে লিপিবদ্ধ করেছে। ওযীফা আকারে তা পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)!

মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সব জাহেলি ও শিরকি কাজ। খোদ মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর আদর্শের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী, মুত্তাবিয়ে সুন্নত বুযুর্গ ও দাঈ ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে অসংখ্য মানুষ শিরক-বিদআত ছেড়ে তাওহীদ ও সুন্নতের দিকে এসেছে। ইসলাম গ্রহণ করেছে। অথচ তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবি করে একশ্রেণির মানুষ তাওহীদ ও ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এটা কত বড় আফসোসের বিষয়! আল্লাহ্ তাআলা উম্মতকে হেফাযত করুন। আমীন।

ভুল মাসআলা

দাড়ি লম্বা করার শরয়ী বিধান

দাড়ি ইসলামের শিক্ষা ও পরিচয়-চিহ্ন হিসাবে গণ্য। দাড়ি লম্বা করা এবং মোচ খাটো করা দ্বীনে তাওহীদের শিক্ষা, যা সকল নবীর শরীয়তে ছিল। দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠি থেকে খাটো করা নাজায়েয। যেহেতু দাড়ি রাখা সব নবীর রীতি ছিল, তাই একে 'সুন্নত'ও বলা হয়। এতে কারও কারও ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, দাড়ি লম্বা করাও অন্যান্য সাধারণ সুন্নতের মতো একটি সুন্নত। অতএব করলে ভালো, না করলেও গোনাহ নেই!

www.eelm.weebly.com

এটা একদম ভুল ধারণা। দাড়ি এমন কোন সুন্নত নয়, যা রাখা না-রাখার স্বাধীনতা রয়েছে, বরং এটি একটি 'সুন্নতে ওয়াজিবা'। অর্থাৎ সুন্নতে মুআক্কাদা থেকেও এর গুরুত্ব বেশি এবং এটি পরিত্যাগ করলে গোনাহ হয়।

দেখুন, দাড়ি কামানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট রাখা এমন এক গোনাহ, যা মানুষের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকে এবং এমন একটা গোনাহ, যা গোপন করারও কোন উপায় নেই। এটা একটা প্রকাশ্য গোনাহ, যা খুবই ভয়াবহ। এসব সত্ত্বেও দাড়ির সঙ্গে এই আচরণটা করা হয় সুন্নতের প্রতি অনীহা এবং অনৈসলামিক ফ্যাশনের প্রতি আকর্ষণের কারণে। এ অবস্থায় তো ঈমানের ব্যাপারেই শঙ্কিত হতে হয়।

ভুল ধারণা

৭৮৬ কি বিসমিল্লাহ-এর বিকল্প?

যেসব ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা মাসনুন বা মুস্তাহাব, সেসব ক্ষেত্রে অনেকেই '৭৮৬' লিখে থাকে। 'আবজাদ'এর হিসাবে এটি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর অক্ষরগুলোর সংখ্যামানের সমষ্টি। কারও কারও ধারণা যে, এই সংখ্যাগুলো লিখলে বা উচ্চারণ করলে 'বিসমিল্লাহ্' লেখার বা বলার কাজ হয়ে যায়।

এটা একটা ভুল ধারণা। মুখে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে যদি এই অংকগুলো লেখা হয়, তাহলে সেটি 'বিসমিল্লাহ্'র চিহ্ন গণ্য করা যেতে পারে; কিন্তু সরাসরি এই অংকটাকেই বিসমিল্লাহ্র বিকল্প মনে করা ভুল।

বলাবাহুল্য, একটি 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' যা সর্বযুগের উলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মধ্যে অনুসৃত ছিল, তা বাদ দিয়ে শুধু আবজাদি অংক লেখা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। # ফেব্রুয়ারি '০৯ঈ.

ভুল ধারণা

ফাতেহা কি কেরাত নয়?

কেরাত আরবী শব্দ। এর মূল অর্থ পাঠ করা। দ্বিতীয় অর্থ পঠিত বস্তু বা পঠিত অংশ। কুরআন মাজীদের যে কোন অংশ পাঠ করা হোক তা কেরাত। নামাযের প্রতি রাকাতে নামাযীকে প্রথমে ফাতেহা পড়তে হয়। এরপর ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং সুন্নত-নফল নামাযের সব রাকাতে

www.eelm.weebly.com

ফাতেহার সঙ্গে কুরআন মাজীদ থেকে আরও কিছু অংশ পাঠ করা জরুরি। আম-মানুষের ভাষায় এই পঠিত অংশ কেরাত নামে পরিচিত। তাই দেখা যায়, নামাযের ওয়াজিবসমূহের বিবরণ দেওয়ার সময় তারা বলেন– ১. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া ২. সূরা মেলানো বা কেরাত পড়া। ...

দ্বিতীয় কথাটার অর্থ হল সূরা ফাতেহার পর কুরআন মাজীদের কিছু অংশ পড়া। সেটা অন্তত সূরা কাউসার বা তার সমান বড় এক আয়াত বা আয়াতাংশ হতে হবে। যিনি এই বিষয়টিকে সূরা মেলানো বলছেন, তার উদ্দেশ্যও এই নয় যে, পূর্ণ সূরা মেলানো ওয়াজিব। তেমনি যারা 'কেরাত পড়া' বলছেন, তাদেরও উদ্দেশ্য সূরা ফাতেহাকে কেরাত থেকে খারিজ করা নয়। সূরা ফাতেহা কুরআন মাজীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাকে 'আসসাবউল মাসানী' নামে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে এটি কেরাত হবে না কেন? হাদীস শরীফে এসেছে–

وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

'যখন ইমাম পড়েন, তো তোমরা নিশ্চুপ থাক।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৪৬

অর্থ পরিষ্কার, যখন ইমাম কুরআন পড়েন তো মুক্তাদিরা নিশ্চুপ থাকবেন। তরজমায় অনভিজ্ঞ কেউ কেউ এই হাদীসের তরজমা কখনও এভাবে করেন যে, 'যখন ইমাম কেরাত পড়েন তখন তোমরা চুপ থাকবে।' এই তরজমা সূক্ষ্ম নয়। তবে একে ভুলও বলা যায় না। কেননা 'কেরাত পড়ার' অর্থ কুরআন পড়া–সে ফাতেহা হোক বা কুরআন মাজীদের অন্য কোন অংশ।

এদিকে একশ্রেণির মানুষ, যারা ইমামের পেছনে ফাতেহা পড়াকে ফরয বলেন, তারা 'কেরাত' শব্দের লোক-অর্থের দ্বারা সুযোগ নিতে চান। তারা বলেন যে, 'এই হাদীসে ইমামের কেরাত পড়ার সময় মুক্তাদিদেরকে চুপ থাকতে বলা হয়েছে, ফাতেহা পড়ার সময় চুপ থাকতে বলা হয়নি!' অথচ কুরআন হাদীসের পরিভাষায়, আরবী অভিধান ও ইলমি পরিভাষায় ফাতেহা পড়াকেও 'কেরাত' বলে। অতএব লোক-প্রচলনের সুবিধা নিয়ে উপরোক্ত কথা বলা হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন কোন কট্টর গায়রে মুকাল্লিদকে তো (নাউযুবিল্লাহ!) বলতে শোনা যায় যে, ফাতেহা তো কুরআনই নয়। অতএব ইমামের ফাতেহা পাঠকালে

www.eelm.weebly.com

মুক্তাদির চুপ থাকার প্রয়োজন নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, 'মাযহাব' রক্ষার জন্য এমনকি কুরআন অস্বীকার করাও তাদের জন্য সহজ!

কুরআন কাকে বলে এটা সবারই জানা আছে। কুরআনের প্রথম সূরা ফাতেহা এবং শেষ সূরা নাস। কুরআন খোলামাত্রই সূরা ফাতেহা চোখে পড়ে। অথচ তারা বলেন, ফাতেহা কুরআন নয়। একদিকে এই কুফরি ধারণা, অন্যদিকে হাদীস অনুসরণের দাবি!

কত ভালো হত, যদি আমাদের তাকলীদ-ত্যাগী আলেমগণ তাদের অনুসারীদের কিছু খোঁজখবর নিতেন এবং তাদেরকে এ-ধরনের অন্যায় প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন!

তাদের এটাও ভালো করে দেখা কর্তব্য যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব কুফরি মতবাদ কাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

ভুল ধারণা

দুআয়ে কুনূত কি শুধু আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈনুকা ...?

বিতর নামাযের তৃতীয় রাকাতে 'কুনূত' (কুনূতের দুআ) পড়া জরুরি। এর বিভিন্ন দুআ রয়েছে– একটি হচ্ছে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈনুকা ওয়া ...।' আরেকটি হল 'আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদাইত্ ... ।'

এ ধরনের আরও দুআ রয়েছে। যেকোন দুআ পড়া যায়; বরং কুরআন হাদীসের যেকোন দুআ পড়ার দ্বারাও কুনূতের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কেউ কেউ প্রথম দুআটিকেই একমাত্র দুআ মনে করেন। তাদের ধারণা, এটা ছাড়া 'কুনূত' আদায় হয় না।

এই ধারণা ঠিক নয়। যেকোন মা'সূর ও মাসনুন দুআর দ্বারা ওয়াজিব কুনূত আদায় হয়।

হাদীস নয়

শায়েখের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ

কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'শায়েখের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই, যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে।'

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ একে হাদীস হিসাবেও উল্লেখ করে থাকে। এই বাক্যটা কোন বুযুর্গের উক্তি, হাদীস নয়। যে রাবী একে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছে, সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।

মোটকথা, হাদীস তো কস্মিনকালেও নয়, প্রশ্ন এই যে, একে বুযুর্গের উক্তি হিসাবেও উল্লেখ করা যাবে কি না? না, যাবে না। কেননা এর দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কোন মূর্খ এ-কথা শুনে মনে করতে পারে যে, তার পীরও নবীদের মতো নিষ্পাপ ও মাসূম, নাউযুবিল্লাহ! কিংবা পীরের কথাও (নাউযুবিল্লাহ!) শরীয়তের দলিল। অথচ একজন নবীই মাসূম। কোন পীরের কথা শরীয়তের দলিল নয়। পীরের জন্য অপরিহার্য, তিনি নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করবেন এবং শরীয়ত মোতাবেক মানুষকে পরিচালিত করবেন। তা হলেই শুধু তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

হকের অনুগামী ও সুন্নতের অনুসারী পীর-মাশায়েখের সাহচর্য গ্রহণ করা অবশ্যই শরীয়তে কাম্য; কিন্তু তাদেরকে 'কান্নবী ফী কাওমিহী' বলে দেওয়া নিঃসন্দেহে 'গুলূ' ও সীমালঙ্ঘন। এটা পরিহার করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীস এই–

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

'আলেমরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার-দেরহামের উত্তরাধিকারী করেন না, তারা শুধু ইল্‌মের উত্তরাধিকারী করেন। অতএব যে ইল্‌ম গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।'

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৩৬, আরও দেখুন, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪১২, মীযানুল ইতিদাল ২/২৩৭-২৩৮, লিসানুল মীযান ৪/৩০৯, ৭/৩১৭ # মার্চ '০৯ঈ.

ইতিহাসবিষয়ক ভুল

আবু জাহেল কি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল?

আরবের মুশরিক গোষ্ঠীর নেতা আবু জাহেল। ইসলামের সঙ্গে তার শত্রুতা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ ও বেআদবি সর্বজনবিদিত। তার সম্পর্কে কোন কোন মানুষকে বলতে শোনা গেছে যে,

www.eelm.weebly.com

সেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল, যেভাবে আবু লাহাব তাঁর চাচা ছিলেন।

এটা ভুল। আবু লাহাব খাজা আবদুল্লাহর ভাই এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন; কিন্তু আবু জাহেল কোরাইশ বংশের লোক হলেও আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ছিল না। আবু জাহেলের বংশধারা এই– 'আবু জাহেল আমর ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম।' –উমদাতুল কারী ১৭/৮৪

ভুল ধারণা

খাজা আবদুল্লাহ কি ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন?

উর্দু বা বাংলাভাষায় রচিত সীরাতের কিতাবসমূহে লেখা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা নয়জন। যেহেতু পিতার বড় ভাইদেরকে 'তায়া' বাংলায় জ্যাঠা বলা হয়, তাই কারও কারও ধারণা হয়েছে যে, খাজা আবদুল্লাহ (রাসূলুল্লাহর পিতা) বয়সের দিক থেকে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন।

এই ধারণা ঠিক নয়। আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে সবার বড় হলেন হারিস। –সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ১১/৮২

ভুল মাসআলা

মাকরূহ ওয়াক্তে কি যিকির-তেলাওয়াত মাকরূহ?

যে তিন ওয়াক্তে যেকোন ধরনের নামায পড়া মাকরূহ, সে ওয়াক্তের ব্যাপারে কারও কারও ধারণা এই যে, সে সময় যিকির-তেলাওয়াত, দুআ-দরূদ পড়াও মাকরূহ। এটা সঠিক নয়। ওই ওয়াক্তগুলোতে যিকির-তেলাওয়াত, দুআ-দরূদ সবই পড়া যায়, মাকরূহ নয়।

ভুল নিয়ম

চার রাকাতের সময় না থাকলে দুই রাকাতও না-পড়া

হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, সে যেন দুই রাকাত নামায পড়া ছাড়া না বসে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৪

এই নামাযের নাম 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'। বিশেষ কিছু অবস্থা ছাড়া যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তো তার জন্য এই নামায পড়া মাসনুন। যেসব

www.eelm.weebly.com

নামাযের আগে সুন্নতে মুআক্কাদা আছে, তাতে ওই সুন্নত নামাযই তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলবর্তী হয়; কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা যখন মসজিদে জামাতে শামিল হওয়ার জন্য আসেন এবং দেখেন যে, চার রাকাত পড়ার সময় নেই, তো যোহর, আসর ও ইশা, যেগুলোতে (সুন্নতে মুআক্কাদা বা গায়রে মুআক্কাদা) চার রাকাত নামায রয়েছে, কোন নামায না পড়ে বসে যান। অথচ কখনও কখনও দুই রাকাত আদায় করার সময় থাকে। ইচ্ছা করলে তারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে পারতেন। নামাযের আগের সুন্নতের সময় না থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল ওযুও পড়া যায় না-এমন কোন মাসআলা ফিকহে ইসলামীতে নেই। এছাড়া আসর ও ইশার আগের সুন্নত চার রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, চার রাকাতও হয়, দুই রাকাতও হয়।

হাদীস নয়

আবু বকর সিদ্দীক রা. কি মিলাদ দিতেন?

কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি ফোন করে বললেন যে, জনৈক বিদআতপন্থী প্রচলিত মিলাদের সমর্থনে বলেছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নাকি প্রতি বছর মিলাদ করতেন। একবার মিলাদের জন্য তাঁর কাছে খরচপাতি ছিল না। স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলছেন, কিছু না থাকলে খেজুর দিয়েই মিলাদ কর!!

ওই ব্যক্তি জানতে চাচ্ছিলেন যে, এই রেওয়ায়েত সহীহ কি না এবং তা কোন্ কিতাবে আছে?

আমি তাকে বললাম– ভাই, এটা তো একদম তাজা বানানো গল্প। মওযু রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহেও আপনি তা পাবেন না। কে না জানে যে, প্রচলিত মিলাদ নবী-যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-যুগের শত শত বছর পরে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অনুকরণে শুরু হয়েছে। অতএব এর আলোচনা তো কোন সহীহ হাদীসের কিতাবে থাকা সম্ভবই নয়।

বিদআতিদের এই নতুন সৃষ্ট রেওয়ায়েত থেকেও বোঝা যায় যে, তাদের কাছে মিলাদ মাহফিলের সবচেয়ে বড় বিষয় হল খাবার-দাবার ও জশনে-জুলুস।

অথচ এটা সবাই জানেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর পবিত্র সীরাত আলোচনা দ্বীনের একটা জরুরি আমল, যা যেকোন সময়, যেকোন স্থানে হতে পারে। আর এর জন্য খরচপাতিরও

www.eelm.weebly.com

প্রয়োজন নেই। অতএব অর্থ না থাকার কারণে তা থেকে বিরত থাকা বা বঞ্চিত থাকার প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে নবীপ্রেমের সঠিক অর্থ বোঝার এবং তার হক আদায় করার তওফীক দান করুন। আমাদেরকে কথার উম্মত না বানিয়ে কাজের উম্মত বানিয়ে দিন, আমীন।# এপ্রিল '০৯ঈ.

আরবী ব্যাকরণগত ভুল

কিছু সংক্ষিপ্ত হাদীস আছে, যার আরবী বক্তব্য সাধারণ মানুষেরও জানা। হাদীসগুলো সহীহ, কিন্তু সেগুলোর আরবী বলতে গিয়ে অনেকেই ভুল করে থাকেন। কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছি–

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

'ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত কর, অল্প আমলই যথেষ্ট হবে।' –মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩০৬

কিছু মানুষ এই হাদীসের 'ইয়াক্‌ফিকা'র স্থলে 'ইয়াকফীকা' (মদসহ) পড়ে। এটা আরবী ব্যাকরণ হিসাবেও ভুল এবং হাদীস বর্ণনার দিক থেকেও ভুল।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

'হে লোক সকল, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সফলকাম হবে।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৫৬২

এই হাদীসের 'তুফলিহু'-এর স্থলে কেউ কেউ 'তুফলিহূন' (নূনসহ) বলে থাকেন। এটা ভুল।

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৯৬৮৯

এই হাদীসে 'দাখালাল জান্নাহ'-এর সাথে 'ফা' যোগ করে 'ফাদাখালাল জান্নাহ' বলে। এটাও ভুল।

مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ

'যে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নাম অভিমুখে বিচ্ছিন্ন হয়।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩০৫, শায়েখ শুআইব আরনাঊতের তাহকীককৃত নুসখা, মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১১৬

এই হাদীসে দ্বিতীয় شَذَّ কে কেউ কেউ شُذَّ পড়ে, এটা ঠিক নয়।

www.eelm.weebly.com

তাফসীরবিষয়ক একটা ভুল

'আবাবীল' কি কোন বিশেষ পাখির নাম?

যেসব পাখির দ্বারা কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আসহাবুল ফীল ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কা'বা রক্ষা করেছেন তাদের কথা সূরা ফীল-এ এসেছে। উক্ত আয়াত হল–

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

'এবং আল্লাহ্ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন।'

এখানে 'আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বালা'-এর বহুবচন, যার অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে। উদ্দেশ্য হল, অনেক পাখি পাঠানো হয়েছিল।

সাধারণ মানুষ মনে করে যে, 'আবাবীল' বলে ওই পাখিগুলোর নাম বুঝানো হয়েছে। এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে আবাবীল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে।

এখন কথা হল, যে পাখি দ্বারা আসহাবুল ফীলকে ধ্বংস করা হয়েছে, সে পাখির নাম কী ছিল? এ বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়নি এবং এ বিষয়ে ইতিহাসের বক্তব্যও বিভিন্ন ধরনের।

নামের ভুল উচ্চারণ

চান্দ্র পঞ্চম মাসের নামের সঠিক উচ্চারণ কী?

চান্দ্র মাসের পঞ্চম মাসের নাম জুমাদাল উলা এবং ষষ্ঠ মাসের নাম জুমাদাল উখরা, এই দুই নামের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল করে থাকেন। ভুল উচ্চারণগুলো নিচে পেশ করা হল–

(ক) জুমাদিউল আওয়াল (খ) জুমাদিউল উলা (গ) জুমাদাল আওয়াল (ঘ) জুমাদিউস সানি (ঙ) জমাদিউস সানিয়া (চ) জুমাদাস সানি।

আরবীতে এ দু'মাসের উচ্চারণ তা-ই, যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা।

এটা হাদীস নয়, কোন হাদীসের বক্তব্যও নয়

হাদীসে কি ফুল কেনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে?

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে

www.eelm.weebly.com

অর্ধেকে ফুল কিনে নিও
হে অনুরাগী!
–মহানবীর হাদীস অবলম্বনে
গুলশান-২এর চৌরাস্তার মোড়ে একটি ফলকে খোদাই করা এই পঙক্তিগুলো দেখলাম।
'মহানবীর হাদীস অবলম্বনে' একথাটি যদি সেখানে না থাকত, তাহলে এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না।
আমাদের জানামতে এটা না কোন হাদীস, না কোন সহীহ হাদীস থেকে একথা বুঝা যায়।
এ-জাতীয় বক্তব্যের কোন হাদীস প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসের কিতাবে আমরা পাইনি। # মে '০৯ঈ.

অবচেতনে ভুল চিন্তা

দেশের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে আপনজনকে পর মনে করা

মুসলিম উম্মাহ তাওহীদ ও মিল্লাতে হানীফিয়্যার মেলবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁরা দ্বীনে তাওহীদ ও শরীয়তে মুহাম্মাদির অনুসারী, যা আল্লাহ্ তাআলা আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন। এই উম্মতের একতার মূল সূত্র হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালেমায় বিশ্বাসীরা যে ভূখণ্ডেরই অধিবাসী হোক, যে ভাষা ও বর্ণেরই হোক, যে গোত্র ও সম্প্রদায়েরই হোক পরস্পর ভাই ভাই। তাদের বৈশিষ্ট্য তা-ই যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মুসলিম জাতি প্রীতি ও ভালোবাসায় এক দেহের মতো। দেহের এক অঙ্গে কষ্ট হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে।' –সহীহ মুসলিম ২/৩২১
যতদিন ইসলামী খেলাফত অটুট ছিল, ততদিন সকল মুসলিম জনপদ একই কেন্দ্রের অধীন ছিল; কিন্তু ইসলামী খেলাফত দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম জনপদগুলোকে বিভক্ত করা হল। সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল। এখন যদি এই ভূখণ্ডগত বিভক্তির দ্বারা মুসলিম উম্মাহকেও বিভক্ত করে ফেলা যায়, তবেই মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়। ইসলামের দুশমনরা এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বর্তমান অবস্থায় যদিও

www.eelm.weebly.com

প্রত্যেক দেশের সীমান্ত রক্ষাও অপরিহার্য, কিন্তু এই রাজনৈতিক বিভক্তি যে আমাদের অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, আমরা অন্যান্য মুসলিম দেশের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করি না, অন্যান্য মুসলিম দেশের বিপদ-আপদে আমাদের মনে সামান্য অস্থিরতাও সৃষ্টি হয় না–এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক চিন্তাধারাকে লালন করা। চিন্তায় ও আলোচনায় তা এ পরিমাণ চর্চা করা, যাতে পরিস্থিতির কারণে আমরা দ্বীনের মৌলিক চেতনা বিস্মৃত না হই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কালেমায় বিশ্বাসী মুসলিম যেখানেই বাস করুক, আমারই মতো সে আল্লাহ্‌র বান্দা, সে আল্লাহ্‌র যমীনেই বাস করছে। তাওহীদের বন্ধনই মুসলমানদের প্রীতি ও একতার সবচেয়ে বড় বন্ধন, সবচেয়ে দৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর হক আদায় করার তওফীক দান করুন। আমীন।

তরজমার ভুল

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ এর অর্থ কী?

পূর্ণ আয়াত সামনে না রাখার কারণে অনেককে দেখা যায়, তারা উপরোক্ত আয়াতের তরজমা এভাবে করেন, 'শুধু মুত্তাকিরাই হল আল্লাহ্‌র ওলী।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকওয়া ও পরহেযগারি ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা যায় না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌র ওলীদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে–

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

'যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।' –সূরা ইউনুস ৬৩

অতএব ঈমান ও তাকওয়ায় যে যত উঁচু মাকাম অর্জন করবে, সে তত বড় ওলী। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতাংশে এ বিষয়ে বলা হয়নি। পূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত করলে পরিষ্কার দেখা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে 'একমাত্র মুত্তাকিরাই মসজিদে হারামের অভিভাবক।' অর্থাৎ মুশরিকদের কোন অধিকার নেই মসজিদে হারামের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার এবং মুমিনদেরকে প্রবেশে বাধা প্রদান করার। এই মসজিদের ওপর তাদের কোন অধিকার নেই। একমাত্র

www.eelm.weebly.com

মুত্তাকিরাই অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী তাকওয়ার অনুসারী লোকেরাই এই মসজিদের অভিভাবক।

আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ না করে মধ্য থেকে একটি অংশ তুলে নিয়ে তরজমা ও তাফসীর করতে থাকলে এ-ধরনের ভুল হয়। কুরআন মাজীদের বিষয়ে এটা খুবই অসতর্কতা, যা পরিহার করা উচিত।

একটা ভিত্তিহীন রসম বা ভিত্তিহীন বর্ণনা

আসরের পর কিছু খাওয়া কি অনুত্তম?

একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের নিকট থেকে এ কথাটা শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, তিনি আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে কিছু খান না। আগে থেকেই তার ধারণা যে, এ সময় খাওয়া-দাওয়া করা ভালো না বা নিষেধ আছে।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শরীয়তে শুধু রোযার হালতে খাওয়া-দাওয়া নিষেধ। অন্য সময় নিষেধ নয়। তবে কেউ যদি বিশেষ কোন সমস্যার কারণে বা চিকিৎসকের পরামর্শে বিশেষ কোন সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকে, তবে সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়; কিন্তু মনগড়াভাবে দিন-রাতের কোন অংশের ব্যাপারে একথা বলা যে, এ সময় খানাপিনা থেকে বিরত থাকা উত্তম বা সওয়াবের কাজ, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের রসম-রেওয়াজ মেনে চলা শরীয়তে নিষেধ। কারও প্রয়োজন না হলে খাবে না, কিন্তু একে একটি বিধান বানিয়ে দেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

জুন '০৯ঈ.

ভুল প্রচলন

বিয়ের ইজাব-কবুলের পর সালাম-মুসাফাহা কি সুন্নত?

কারও সঙ্গে দেখা হলে সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে সালাম। সালামের স্থান কুশল বিনিময়েরও আগে। এ বিষয়টি সকলেরই জানা আছে। মুসাফাহাও সাক্ষাতের শুরুতেই করতে হয়।

এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালে বর তো মজলিসের শুরুতেই উপস্থিত হয়। আর আসার পর সালাম-মুসাফাহাও অবশ্যই করে থাকে; কিন্তু অনেক জায়গায় এই প্রচলন দেখা যায় যে, বিয়ের খুতবা ও

www.eelm.weebly.com

ইজাব-কবুল হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে সালাম দেয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহা-মুআনাকা করে। যদি সে নিজে না করে তবে কোন মুরুব্বী তাকে ইশারা করে বলে, সবাইকে সালাম দাও।

এটা অন্যান্য রসম-রেওয়াজের মতো একটা রসম। এটা সুন্নত নয়, আবার যুক্তিযুক্ত কোন কাজও নয়। ইজাব-কবুলের পর সুন্নত আমল হচ্ছে নব-দম্পতির জন্য বরকতের দুআ করা। যে দুআর বাক্য হাদীসে এভাবে এসেছে–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

–জামে তিরমিযী, হাদীস ১০৯১

ভুল মাসআলা

বিধবার অন্যত্র বিয়ে হলে সে কি আগের স্বামীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়?

কারও কারও ধারণা যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর যে মীরাস পায় তার জন্য শর্ত হল, অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। যদি কোথাও বিয়ে করে তাহলে সে আগের স্বামীর মীরাস পাবে না। নাউযুবিল্লাহ!

মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ জাহেলি চিন্তা। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী জীবিত থাকলেই সে মীরাসের হকদার হয়ে যায়। তার অন্যত্র বিয়ে হোক বা না হোক, তাতে তার মীরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না।

এ কারণে কোন মহিলাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হলে তা হবে বড় ধরনের কবীরা গোনাহ। এটা একদিকে তার পাওনা আত্মসাৎ করা, অপরদিকে শরীয়তের বিকৃতি সাধন।

আমাদের দেশে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা না করা একটা জাহেলি নিয়ম। এতে এখন আরও বড় জুলুম যোগ হয়েছে যে, অন্যত্র বিয়ের কারণে তাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَظِيْمِ

স্মরণ রাখবেন, যাদের তত্ত্বাবধানে কোন বিধবা রয়েছে, তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, বাস্তব কোন ওযর না থাকলে (সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

www.eelm.weebly.com

কখনোই কোন ওযর নয়) তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। এতে বিভিন্ন উপকারিতার পাশাপাশি মৃত সুন্নত যিন্দা করার সওয়াবও হাসিল হবে।

এটা হাদীসের দুআ নয়

মুনাজাতে মকবুলে উদ্ধৃত 'দুআয়ে ইবরাহীম' হাদীসের দুআ নয়

'মুনাজাতে মকবুল' (হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কর্তৃক সংকলিত)-এর কোন কোন সংস্করণের শেষে একটি দুআ ছাপা আছে। যার শিরোনাম হচ্ছে, 'দুআয়ে ইবরাহীম' এবং এটি প্রত্যেক জুমার সকাল-সন্ধ্যা পড়তে বলা হয়েছে।

অনেকেই 'মুনাজাতে মকবুল'-এর দুআগুলোর মতো এটাকেও হাদীসে বর্ণিত দুআ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। এটা কোন মা'সূর দুআ নয়। আর এটা 'মুনাজাতে মকবুল'-এর অংশও নয়। কোন প্রকাশক এটাকে কিতাবের সঙ্গে ছেপে দিয়েছে।

মেরাজবিষয়ক আলোচনা

কিছু অসতর্কতা

১. যেহেতু কোন কোন অবিশ্বাসী মেরাজের ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে, তাই অনেকে তাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করেন এবং মেরাজের সম্ভাব্যতা প্রমাণের প্রয়াস পান। আসলে এটা মৌলিক কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নিজ শক্তিতে আসমান ও যমীনের এই আশ্চর্য ভ্রমণ সম্পন্ন করেননি, তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং করিয়েছেন সরাসরি আল্লাহ্ তাআলা, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র, তাই কোন মুমিন কুরআন হাদীসের বিবরণের ওপর সামান্যতম দ্বিধাও করতে পারে না। এ কথাটিই হচ্ছে এ প্রসঙ্গে মূল কথা।

২. মেরাজের ঘটনা বলার সময় বর্ণনার শুদ্ধা-শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখাও একটা ব্যাপক ভুল। একশ্রেণির মানুষ যেকোন চটি পুস্তিকায় কিছু পেলে বা কোন কাহিনীকারের নিকট কিছু শুনলে তা-ই বিশ্বাস করে বসে এবং এত দৃঢ়তার সঙ্গে তা বর্ণনা করতে থাকে, যেন সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের হাদীস। এমন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

www.eelm.weebly.com

৩. কোন কোন জাহেল ব্যক্তি মেরাজের ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন আরশ আল্লাহ্ তাআলার থাকার জায়গা এবং তিনি নবীজিকে নিজের ঘরে দাওয়াত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

এই উপস্থাপনা খুবই মারাত্মক। আল্লাহ্ তাআলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আরশ তাঁর মাখলুক, স্থান ও কাল তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সত্তা স্থান-কালের সকল বন্ধনের ঊর্ধ্বে। এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের আকীদা।

মেরাজের ঘটনাকে ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে, যেভাবে সূরা ইসরা ও সূরা নাজমের আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে এবং সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

জুলাই '০৯ঈ.

একটা অন্যায় কাজ

'বিসমিল্লাহ্' ও 'দরূদ' অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ বলা ও লেখা

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে 'আল্লাহ্র যিক্র' মাসনুন। যে কাজের সূচনায় শরীয়ত যে যিক্র নির্দেশ করেছে, সে কাজের জন্য ওই যিক্রই মাসনুন। অনেক কাজে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা বা লেখার নির্দেশনা রয়েছে। শরীয়তে তা মাসনুন। বিধানগত বিচারে এটা মাসনুন বা মুস্তাহাব হলেও এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর দ্বারা বান্দা নতুন করে- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অঙ্গীকার করে। আল্লাহ্ তাআলার নেয়াতমসমূহ স্মরণ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু করে কাজের মধ্যে দুরুস্তি, খায়র ও বরকতের দরখাস্ত করে।

তাই এ আমল গুরুত্বের সঙ্গে করা চাই। আর যেহেতু এতে মাহবূবে হাকীকী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নাম রয়েছে, তাই গভীর শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সঙ্গে তা আদায় করা চাই। পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম তাজবীদ ও ইখলাসের সঙ্গে পাঠ করা চাই, শুধু রসম পুরো করার জন্য না হওয়া চাই।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে অনেককে অনেক সময় দেখা যায়, তারা 'বিসমিল্লাহ্' এমনভাবে পাঠ করে থাকেন, যেন তা একটি অতিরিক্ত কাজ। মূল কাজ হল যা শুরু করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, যারা এমন মনে করেন, তারা এই সুন্নতের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন নন।

বিসমিল্লাহকে মূল কাজের মতো গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা উচিত, বরং কোন দুনিয়াবি কাজের শুরুতে যদি 'বিসমিল্লাহ্' পড়া হয় তাহলে তা ওই কাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

www.eelm.weebly.com

'আররাহীম' শব্দে ওয়াক্ফের কারণে দীর্ঘ মদ করতে হবে। কিন্তু যদি এক আলিফ মদও না করা হয় তবে তা হবে 'লাহনে জলী'। তেমনি 'আররাহমান'-এর মীমে এক আলিফ 'মদ' করা জরুরি। অক্ষরগুলো মাখরাজ থেকে আদায় করা, বিশেষত ح ও ع সঠিক মাখরাজ থেকে আদায় করাও জরুরি।

দরূদ শরীফও অত্যন্ত বরকতপূর্ণ আমল। দুআর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দরূদ শরীফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ হিসাবে তা আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত।

দ্বিতীয়ত এর সম্পর্ক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, যাঁর হক মুসলমানদের ওপর তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি এবং যিনি আল্লাহ্ তাআলার পরে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী।

দরূদের মাধ্যমে তাঁর জন্য আল্লাহ্র দরবারে দুআ করা হয়। তাই এ আমল অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সঙ্গে আদায় করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ এক মজলিসে বারবার হলে মাসআলাগত দিক থেকে যদিও প্রতিবার দরূদ পড়া জরুরি নয়, মুস্তাহাব; কিন্তু এখানে বিষয়টি মহব্বতের। তাই–মাশাআল্লাহ্–মুসলিম উম্মাহ এই মুস্তাহাব আমলের বিষয়ে যত্নবান; কিন্তু এরপরও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও উদাসীনতার শিকার হয়ে যায়। কেউ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এমনভাবে পাঠ করে, যেন তা একটি অতিরিক্ত বিষয়, তাই এত দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে তা পাঠ করা হয় যে, কিছু অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারিতই হয় না। এটা ঠিক নয়। দরূদকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে আদায় করা উচিত।

লেখার মধ্যে তো দরূদ শরীফকে খুবই মজলুম বানানো হয়। কেউ শুধু (স.) লেখেন, কেউ লেখেন (দ.)। যেন এটা শুধু 'অতিরিক্ত' বিষয়ই নয়, একটা 'বিপদ'ও বটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

প্রশ্ন এই যে, সম্পূর্ণ দরূদ লেখা হলে কতটুকু কালি বা কাগজ ব্যয় হবে? আহা! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, এই ব্যয়টুকুই হতে পারে আমাদের সঞ্চয়।

আমাদের দেশের এমন একজন আলেমে দ্বীনের নাম আমার জানা আছে, যিনি শুধু এ-জন্য কোন প্রকাশককে তার কিতাব ছাপতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, তারা পূর্ণ দরূদের পরিবর্তে শুধু (দ.) ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য যে, এমন ব্যক্তিরাই হলেন আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

www.eelm.weebly.com

وَالأَسَفُ الشَّدِيْدُ فِيْ ذٰلِكَ عَلٰى طُلَّابِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ هٰذَا التَّسَاهُلَ قَدْ فَشَا فِيْهِمْ أَيْضًا، مَعَ أَنَّ شِعَارَهُمْ -فِيْمَا يَزْعُمُوْنَ- مَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ.

একটা অলীক 'কাহিনী'

'দুআয়ে কদহ' সম্পর্কিত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই

কোন কোন ওযীফার কিতাবে 'দুআয়ে কদহ' নামে একটি দীর্ঘ দুআ পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে যে, মেরাজের রাতে হযরত জিবরীল আ. তা নবীজিকে দান করেছেন এবং তার বহু ফযীলত উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃত বিষয় এই যে, এটা মা'সূর দুআ নয়, কেউ তা তৈরি করেছে। আর এর যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, তা একটি অলীক কাহিনী। বাস্তবতার সঙ্গে এর দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. 'আলহিযবুল আ'যম' কিতাবের শুরুতে এই 'মওযূ' বর্ণনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। শরহে নুখবার ভাষ্যগ্রন্থেও 'মওযূ' অধ্যায়ে এর সমালোচনা করেছেন।

ভুল কাজ

জানাযার প্রতি তাকবীরে আকাশের দিকে চোখ ওঠানো

ভুলের কোন শেষ নেই। কোন কোন ভুল এতই আজব হয় যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তা থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তারা তা চিন্তাও করতে পারেন না এবং এমন ভুল হতে পারে বলে বিশ্বাসও করতে পারেন না।

সম্ভবত এ-ধরনের একটা ভুল, যা কারও কারও মধ্যে লক্ষ করা গেছে এই যে, তারা জানাযার নামাযের প্রতি তাকবীরের সময় আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাদের ধারণা, জানাযার নামাযে এরূপ করা চাই।

এ ধারণা ভুল। নামাযের অন্যান্য সময়ের মতো তাকবীর বলার সময়ও দৃষ্টি যমীনের দিকে থাকবে। এ সময় দৃষ্টি ওপরের দিকে ওঠানো যেমন খেলাফে সুন্নত, তেমনি অযৌক্তিকও বটে। আর যদি এর পেছনে কোন ভিত্তিহীন বিশ্বাস থাকে, তবে তো বিষয়টা আরও মারাত্মক। # আগস্ট ও সেপ্টেম্বর '০৯ঈ.

www.eelm.weebly.com

একটা চিন্তাগত দুর্বলতা

রমযানুল মুবারকের সমাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার কারণ

রমযানুল মুবারক সমাপ্ত হলে এ জন্য আনন্দিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস দান করেছিলেন, যা ছিল খায়ের ও বরকতে পরিপূর্ণ। এ মাসের দিনের বেলায় সওম পালন এবং রাতের বেলায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের তওফীকও আল্লাহ্ তাআলা দান করেছিলেন। তাই রমযানের শেষে মুমিনের অন্তর আল্লাহ্র রহমত ও মাগফেরাতের আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা নিজ মেহেরবানিতে আমাকে ক্ষমা করেছেন। রমযানুল মুবারকের খায়ের ও বরকত নিশ্চয়ই আমাকে দান করেছেন। মুমিন তখন আল্লাহ্ তাআলার শোকরগোযারি করে, হামদ ও সানা করে এবং তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণা করে। ঈদের দিন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় ঈদুল ফিতর-এর আমলগুলো সম্পন্ন করে।

এ লেখায় যে দুর্বলতাটি উল্লেখ করতে চাই তা এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকের কথা ও আচরণে বোঝা যায় যে, মাহে রমযান যেন একটি বিপদ ছিল। শাওয়ালের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা এ বিপদ দূর হয়েছে। তাই আনন্দ। বস্তুত এই দুর্বলতার শিকার তো তারাই হতে পারে, যাদের রোযা রাখার তওফীক হয়নি। তাদের জন্য তো প্রকৃতপক্ষেই রমযান ছিল ক্ষতির মাস। কিন্তু মুমিন এ মাসের আগমনে এজন্য আনন্দিত হয় যে, এটি তার দ্বীনি ও ঈমানি তারাক্কির মাস। এজন্য একে বিপদের পরিবর্তে মহা সৌভাগ্য মনে করে এবং আগ্রহের সঙ্গে তার প্রতীক্ষায় থাকে। আর এ মাস সমাপ্ত হলে সে এ আশায় আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা তার হাসিল হয়েছে।

হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুলের সাত মনযিল

হিসনে হাসীনের বিষয়বস্তু হচ্ছে কুরআন সুন্নাহয় উল্লেখকৃত দুআ হাওয়ালাসহ একত্র করা। প্রথম চার অধ্যায়ে বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন আমল ও ইবাদতের দুআ সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণ দুআসমূহ রয়েছে, যা বিশেষ কোন সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নয়। এ অধ্যায়ের দুআগুলো ওযীফা আকারে পড়া যায়। তবে প্রথম চার অধ্যায়ের দুআ সেসব

www.eelm.weebly.com

সময় ও পরিস্থিতিতেই পড়া উচিত, যে সময় বা পরিস্থিতিতে তা পড়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ সময়ের দুআগুলো দিন রাতের সবসময় ওযীফা আকারে পাঠ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন ধরুন, কেউ যদি সকাল বেলা পাঠ করেন–

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ...

'এই সন্ধ্যায় আমরা ও গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র ...।'

তেমনি কেউ যদি সন্ধ্যায় পাঠ করেন–

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ ...

'এই ভোরে আমরা ও গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র ...।'

তা হলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনি সর্বদা ওযীফা আকারে কি এই দুআ পাঠ করা যাবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ...

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার, যিনি আমাদেরকে আহার দিলেন, পানীয় দিলেন এবং যিনি আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

তেমনি–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

অথচ এখন তার নিদ্রার সময় নয়। কিংবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى ...

অথচ এখন সে ইস্তেন্‌জা থেকে আসেনি।

মোটকথা, 'হিসনে হাসীন' কিতাবকে বিভিন্ন মনযিলে ভাগ করে ওযীফার কিতাব বানানো যুক্তিযুক্ত নয়।

'মুনাজাতে মকবুল' কিতাবের অধিকাংশ দুআ হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক দুআ, যা বিশেষ সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নয়। এ দুআগুলো মিনতি ও মনোযোগের সঙ্গে যেকোন সময় পাঠ করা যায়। সহজতার উদ্দেশ্যে 'আলহিযবুল আ'যম'-এর মতো এই দুআগুলোকেও সাত মনযিলে ভাগ করা হয়েছে। যেন প্রতিদিন এক মনযিল করে পাঠ করা যায় এবং কিতাব ও সুন্নাহয় শেখানো অধিকাংশ জামে দুআ প্রার্থনায় এসে যায়। সাত মনযিলে বিভক্ত করার বিষয়টি মাসআলাগতভাবে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি পাঠ

www.eelm.weebly.com

সহজ হওয়ার জন্য একটি বিন্যাসমাত্র। যে মনযিলে যে বারের নাম দেওয়া আছে, সেদিনই তা পড়তে হবে তা-ও অপরিহার্য নয়। তেমনি এটাও জরুরি নয় যে, একদিনে এক মনযিল পরিমাণই পড়তে হবে। সাত মনযিলে ভাগ করা এবং সপ্তাহের এক-এক দিন এক-এক মনযিল পাঠ করার কথা উল্লেখ থাকা এজন্য নয় যে, হাদীস শরীফে এই দুআগুলো এভাবে পাঠ করতে বলা হয়েছে। অতএব এ ধারণা করা যে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম করার দ্বারা শরীয়তের কোন হুকুম লঙ্ঘন হবে বা এ দুআগুলোর বরকত ও ফযীলত হ্রাস পাবে, ঠিক নয়। তবে একে নিছক একটি বিন্যাস মনে করে নিজের সুবিধার জন্য তা অনুসরণ করলে দোষের কিছু নেই।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন এ জন্য হয়েছে যে, কারও কারও প্রশ্ন থেকে অনুমিত হয়, তারা এই বিন্যাসের অনুসরণকেও সম্ভবত একটি শরয়ী হুকুম মনে করেন এবং মাসআলার দিক থেকেও এর অন্যথা অনুচিত বলে মনে করেন। অথচ প্রকৃত বিষয় তা-ই, যা ওপরে লেখা হয়েছে।
অক্টোবর '০৯ঈ.

হরম ও মসজিদে হারাম কি এক?

বাইতুল্লাহর চারপাশে যে মসজিদ তার নাম 'আলমাসজিদুল হারাম', যাতে এক রাকাত নামাযের সওয়াব লক্ষ রাকাতের সমান। পক্ষান্তরে 'হরম' হচ্ছে মক্কা মুকাররমার ওই বিস্তীর্ণ এলাকা, যার কিছু বিশেষ হুকুম ও আদব রয়েছে। যাকে কুরআন মাজীদে 'হারামান আমিনা' বলা হয়েছে। এটি বাইতুল্লাহর পুব দিকে আরাফা পর্যন্ত, পশ্চিমে হুদাইবিয়া (শুমাইসি) পর্যন্ত, উত্তরে জি'রানা ও ওয়াদিয়ে নাখ্‌লা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে শুবাইকা পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্দিকের সীমানায় চিহ্ন ও ফলক লাগানো আছে।

হরমের বাইরের অংশকে 'হিল্ল' বলে। বাইতুল্লাহ থেকে হিল্ল-এর নিকটতম স্থান হচ্ছে তানঈম, যেখানে মসজিদে আয়েশা অবস্থিত।

অনেক সময় মসজিদে হারামকে সংক্ষেপে 'হরম' বা 'হেরেম শরীফ' বলা হয়। এতে অনেকের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মসজিদে হারামের অপর নাম 'হরম'। তেমনি কেউ কেউ মনে করেছেন, হরমের গোটা এলাকাই মসজিদে হারাম। এই উভয় ধারণা ভুল। মসজিদে হারাম হচ্ছে বাইতুল্লাহর চারপাশের মসজিদের নাম, যার চতুসীমানা সবার চোখের সামনে। পক্ষান্তরে

www.eelm.weebly.com

হরমে (মক্কী) মক্কার ওই বিস্তৃত অংশকে বলে, যার সীমানা ওপরে বলা হয়েছে। বাইতুল্লাহ ও মসজিদে হারাম ছাড়াও সাফা-মারওয়া, মিনা, মুযদালিফা ইত্যাদিও হরমের সীমানার ভেতরে অবস্থিত।

এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, সওয়াবের দিক থেকে হরমের কোন অংশে কৃত নেক আমলের সওয়াব মসজিদে হারামে কৃত নেক আমলের সমান কি না। কোন কোন সালাফ গোটা হরমের এলাকাকে মসজিদে হারামের মতো মনে করেন, কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, হরমের অন্তর্ভুক্ত গোটা এলাকা মসজিদ। অন্যথায় যেসব কাজ মসজিদে করা না-জায়েয বা খেলাফে আদব তা গোটা হরমের মধ্যেও না-জায়েয ও খেলাফে আদব হত।

মনে রাখা উচিত যে, যারা গোটা হরমের এলাকাকে মসজিদে হারাম মনে করে মসজিদে হারামের জামাতে শামিল হয় না, তারা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হরমের কোন স্থানে এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায় (অথচ এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ও শক্তিশালী দলিল নেই) তবুও মসজিদে হারামের বরকত ও নূরানিয়াত, বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উত্তম প্রভাব, আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের এত বড় জামাতে শামিল হওয়ার বরকত মসজিদে হারামের বাইরে কীভাবে পাওয়া যাবে? এ জন্য মক্কায় থাকা অবস্থায় কোন বাহানাতেই মসজিদে হারামের জামাত থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

ইহরামের চাদরকেই ইহরাম মনে করা

হজ বা ওমরার সূচনা হয় 'ইহরাম' দ্বারা। হজ বা ওমরার নিয়তে তালবিয়া পাঠ করলে 'ইহরাম' সম্পন্ন হয়। ইহরামের মাধ্যমে হজ শুরু হয় এবং নির্ধারিত সময়ে চুল মুণ্ডন বা ছোট করার দ্বারা 'হালাল' হওয়া পর্যন্ত ইহরামের হালত বাকি থাকে। ইহরাম গ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'মুহরিম' বলে। ইহরামের হালতে পুরুষের জন্য পোশাকের বিধান এই যে, শরীরের কোন অঙ্গের আকারে প্রস্তুতকৃত বা সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা যাবে না। টুপি, মোজা, জামা, কোর্তা, সদরিয়া, গেঞ্জি, পাজামা, সেলোয়ার, শার্ট, প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার এবং এ ধরনের সকল পোশাক ইহরামের হালতে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এ জন্য তারা ইহরামের হালতে শুধু চাদর ব্যবহার করবেন। একটি চাদর পাজামার স্থলে অপরটি পাঞ্জাবির স্থলে। ইহরামের হালতে লুঙ্গি পরার

www.eelm.weebly.com

অনুমতি থাকলেও উত্তম হল চাদর পরিধান করা। পুরুষের জন্য ইহরামের হালতে মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করাও জায়েয নয়। এ জন্য চাদর পরিধান করা যাবে, কিন্তু এর দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না। এই দুই চাদর পাক-সাফ হওয়া চাই। সাদা হলে ভালো, নতুন হওয়া জরুরি নয়।

এই চাদর যেহেতু ইহরামের হালতের পোশাক, তাই অনেক সময় একে 'ইহরাম' বলা হয়; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ ছাড়া শুধু এই কাপড় পরলেই কেউ 'মুহরিম' হয়ে যাবে। কেননা নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ ছাড়া শুধু দুটো সাদা কাপড় পরার দ্বারা 'ইহরাম' সম্পন্ন হয় না এবং হজ শুরু হয় না।

তেমনি ইহরামের চাদরকে ইহরাম মনে করার কারণে কেউ কেউ মনে করেন, ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা যায় না কিংবা তা নাপাক হয়ে গেলে যেন ইহরামই নষ্ট হয়ে গেল। অথচ তাও নয়। ইহরামের চাদর পরিবর্তন করার এবং ধোয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। তা নাপাক হয়ে গেলেও ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না। চাদরটি ধুয়ে পাক করে নিলেই হল কিংবা তা বদলে নিলেই হল।

এই বিষয়টি এত লম্বা করে বলার কারণ এই যে, আমি নিজে অনেক ভাইকে এসব ভুল ধারণা পোষণ করতে দেখেছি, যার মূল কথা এই যে, তারা ইহরামের পোশাককেই 'ইহরাম' মনে করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই মাসআলাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে ইহরামের চাদর ব্যাগে রেখে দেয় এবং তা অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ভেতরে চলে যায়, যার কারণে জিদ্দা পৌছার আগে ওই কাপড় পাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না, অন্যদিকে বিমান বন্দরে ইহরামের হালতে পরা যায় এমন কোন কাপড়ের ব্যবস্থা করাও সম্ভব না হয়, তখন এই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় যে, 'ইহরাম' কীভাবে সম্পন্ন হবে? বরং কর্তব্য হল বিমান জিদ্দায় পৌছার ঘন্টাখানেক আগে সাধারণ কাপড় পরিহিত থাকলেও নিয়ত ও তালবিয়ার মাধ্যমে 'ইহরাম' সম্পন্ন করবে। জিদ্দা পৌছার পর লাগেজপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পরিবর্তন করে চাদর পরিধান করবে। আর ইহরামের হালতে দু-আড়াই ঘন্টা বা তার বেশি সময় জামা-পাজামা ইত্যাদি পরিহিত থাকার কারণে যে কাফফারা আসে তা আদায় করবে।

www.eelm.weebly.com

তো যাদের এই বিভ্রান্তি আছে যে, ইহরামের চাদরই ইহরাম, তারা সেই চাদর পরা ছাড়া নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করলেও ইহরাম হবে না মনে করে বিনা ইহরামে জিদ্দায় পৌছে যায়, যার কারণে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার গোনাহ যেমন হয়, তেমনি দমও ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই কর্তব্য হল হজের আগে হজের মাসায়েল পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া, যেন বিভ্রান্তি বা ভুল প্রচারণার শিকার হয়ে অযথা কষ্ট পোহাতে না হয় এবং অসচেতনভাবে হজ অসম্পূর্ণ বা বিনষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে।

হিযবুল বাহ্‌র মা'সূর দুআ নয়

হিযবুল বাহর নামে যে ওযীফাটি প্রসিদ্ধ, তাতে বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন হাদীসের বিভিন্ন দুআ বিদ্যমান থাকলেও সব দুআ কুরআন হাদীসের নয়। তাছাড়া পূর্ণ ওযীফা এভাবে তো কুরআন হাদীসে অবশ্যই নেই। এটি আবুল হাসান শাযিলী রহ. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ইলহামের মাধ্যমে লাভ করেছেন। একে কুরআন হাদীসের মা'সূর দুআর মতো গুরুত্ব দেওয়া কিংবা তার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়। তবে যেহেতু এই ওযীফায় কোন ভুল কথা নেই এবং এর অধিকাংশ শব্দ বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন হাদীসে রয়েছে, তাই ব্যক্তিগতভাবে কেউ আমল হিসাবে পড়লে তা না-জায়েযও নয়। তবে সওয়াব ও বরকত অবশ্যই মা'সূর দুআতেই বেশি। যদিও দুনিয়াতে কখনও কোন গায়রে মা'সূর দুআর ক্রিয়া দ্রুত দেখা যায়। কেননা, এটি ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ্‌র খাস বান্দারা সর্বদা বাহ্যিক ক্রিয়ার চেয়ে সওয়াব, বরকত ও নূরানিয়াতের প্রতি লক্ষ করে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, আজকাল আমাদের মাঝে যিকির ও দুআর বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের উদাসীনতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন। # নভেম্বর '০৯ঈ.

একটা উদাসীনতা

হিজরী বর্ষ ও চান্দ্রমাসের তারিখ ব্যবহারে উদাসীনতা

এ প্রসঙ্গে আলকাউসারে একাধিকবার লেখা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল দ্বীনদারদের মধ্যেও এ বিষয়ে ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কাউকে তারিখ জিজ্ঞাসা করলেই নিঃসঙ্কোচে ও কোন ভূমিকা ছাড়াই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ বলে থাকেন। যেন এটাই একমাত্র ক্যালেন্ডার। কোন

www.eelm.weebly.com

চিঠি বা লেখায় তারিখ লিখতে হলে ইংরেজি তারিখ লেখা হয়। কোন ঘটনার তারিখ বলতে হলেও তা-ই বলা হয়, এমনকি অধিকাংশ তালেবে ইলম তাদের শিক্ষাজীবনের তারিখও যদি মনে রাখে তাহলে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবেই মনে রাখে।

গত বছর মদীনা মুনাওয়ারায় শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহ্)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে চান্দ্র তারিখের পর ইংরেজি তারিখ উল্লেখ করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন–

نَحْنُ لَا نَعْرِفُ ذٰلِكَ إِنَّمَا نَعْرِفُ ...

এই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নেই।

পক্ষান্তরে অন্য এক ব্যক্তির কোন প্রশ্নের উত্তরে আমি যখন চান্দ্র তারিখ বলেছি, তখন তিনি কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ইংরেজি তারিখ বলুন।

কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরী সন-তারিখ ব্যবহারের বিষয়ে এই উদাসীনতা এখন আর সাধারণ মানুষের ভুল-ত্রুটির মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন (খাওয়াসের) বিশিষ্ট-ব্যক্তিদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে।

এটা খুবই দুঃখজনক। এই উদাসীনতা বাহ্যিকভাবে ছোট মনে হলেও তা অনেক বড় কিছু বিষয়ের ফলাফল। তেমনি এর পরিণতিও অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

ভুল মাসআলা

শিশুর জন্য কি তার বোনের দুধ পান করা নিষেধ?

এই পাতার লেখাগুলো যখন তৈরি করছি তখন এক ভাইয়ের ফোন এল যে, 'একটি শিশুর জন্মের সময় তার মা ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ্ তাআলা তার মাগফেরাত করুন এবং তাকে জান্নাত নসীব করুন এবং তার সন্তানের উত্তম প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।) এখন তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। শুধু বড় বোন তাকে দুধ পান করাতে পারে। কিন্তু এটা তো সম্ভবত জায়েয নয়? এখন তার জন্য কী করা যায়?'

আমি আরয করলাম, শিশু তার বোনের দুধ পান করতে পারে না, তা আপনাকে কে বলেছে? তিনি বললেন, সবাই তো এমনই মনে করে। আমি আরয করলাম, সবাই যদি এমন মনে করে থাকে, তবে তা প্রচলিত ভুলের অন্তর্ভুক্ত। সঠিক বিষয় এই যে, দুধ পানের মেয়াদের ভেতরে শিশুকে যে

www.eelm.weebly.com

কোন মহিলার দুধ পান করানো যায়, তিনি শিশুর মাহরাম হোন অথবা গায়র মাহরাম। তবে এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, শিশুর দুধ-মা হিসাবে দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করা আবশ্যক, ফাসেক-ফাজের নারীর দুধ পান না করানো উচিত। কেননা, শিশুর স্বভাব-চরিত্র তৈরির পেছনে দুধেরও ভূমিকা থাকে।

ভুল ধারণা

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জরুরি মনে করা

মসজিদে জামাতে নামায পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মসজিদে নববীতে জামাতে শামিল হওয়ার সুযোগ হয়ে যায় তাহলে তো নূরুন আলা নূর। কেননা, এখানে এক নামায (কম সে কম) হাজার নামাযের সমতুল্য। হজের সময় মসজিদে নববীতে উপস্থিত হওয়ার এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে গিয়ে সরাসরি সালাম আরয করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে সফরের ধারা হাজী সাহেবানদের মধ্যে রয়েছে, যা অতি উত্তম আমল; কিন্তু সেখানে অবস্থানের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন মেয়াদ নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ এটি অপরিহার্য নয় যে, সেখানে কম সে কম আট দিনই থাকতে হবে।

কোন কোন মানুষ আট দিন অবস্থানকে এত জরুরি মনে করে যে, এর জন্য নিজেকে, সফরসঙ্গীদেরকে এবং কাফেলার আমীরকে কষ্টে ফেলে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। অথচ তা শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত কোন মেয়াদ নয় যে, তা পূরণ করা এত জরুরি মনে করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমদ (৩/১৫৫) ও তবারানীতে (৫৪৪) একটি রেওয়ায়েত আছে যে, কেউ যদি এই মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ নামায আদায় করে, তাহলে সে জাহান্নামের আযাব ও নেফাক থেকে মুক্তি পাবে।

এই রেওয়ায়েতের কারণে লোকেরা আট দিন অবস্থান করা জরুরি মনে করে নিয়েছে। অথচ সনদের বিচারে তা যয়ীফ। উপরন্তু এই হাদীসের প্রসিদ্ধ মতন সেটি যা জামে তিরমিযীতে রয়েছে–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার জন্য চল্লিশ দিন জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে নামায আদায় করে, তার জন্য দুটো পরওয়ানা লেখা হয়– জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা এবং নেফাক থেকে মুক্তির পরওয়ানা।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১

www.eelm.weebly.com

অতএব স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এই ফযীলত যে কোন মসজিদে জামাতে শামিল হওয়া দ্বারা হাসিল হতে পারে।

প্রসঙ্গত ভুল না বোঝার অনুরোধ করব। ফযীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য, তা আমার জানা আছে; কিন্তু একই সাথে এটাও সত্য যে, যয়ীফ দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণ হয় না এবং কোন মেয়াদ বা পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। তাই সহজভাবে সেখানে আট দিন থাকার সুযোগ হয়ে গেলে ভালো, কিন্তু একে জরুরি মনে করা বা জরুরি বিধানের মতো এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া যে, কষ্ট ও পেরেশানিতে পড়ে যেতে হয় কিংবা পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, ঠিক নয়। প্রকৃত করণীয় হচ্ছে, হারামাইনে যতদিন থাকার সুযোগ হয়, চেষ্টা করবে যেন মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হয়।

হাদীস নয়

জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও

আরবীতে বলা হয়–

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

বাক্যটি ব্যাপকভাবে হাদীস হিসাবে বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি পরবর্তী কারও বাণী। তবে সন্দেহ নেই যে, বক্তব্যটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত। ইল্‌মে দ্বীন হাসিলের জন্য যত দূরের সফরই হোক, তওফীক হলে তা করা উচিত। ইল্‌ম অন্বেষণে কখনও মেহনত-মুজাহাদাকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তেমনি পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষার জন্যও দূর-দূরান্তে সফর করা জায়েয; বরং তা একটি পর্যায় পর্যন্ত কাম্যও বটে। এসব কিছু স্বস্থানে ঠিক আছে এবং শরীয়তের বিভিন্ন দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বাক্যটি হাদীস নয়। যদিও তা হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সনদে আবু আতিকা তরীফ ইবনে সুলাইমান নামক একজন রাবী আছে, যে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের দৃষ্টিতে মতরূক (পরিত্যক্ত)। তাকে হাদীস জাল করার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

রিজাল ও রেওয়ায়েত-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু জাফর উকাইলী লেখেন–

وَلَا يُحْفَظُ وَلَوْ بِالصِّيْنِ، إِلَّا عَنْ أَبِي عَاتِكَةَ، وَهُوَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ، وَفَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اَلرِّوَايَةُ فِيْهَا لَيِّنٌ أَيْضًا، مُتَقَارِبَةٌ فِي الضَّعْفِ.

www.eelm.weebly.com

-আম-যুআফাউল কাবীর, উকাইলী ২/২৩০, কিতাবুল মাজরূহীন, ইবনে হিব্বান ১/৩৮২, মিযানুল ইতিদাল ২/২৫৮, আলমুনতাখাব মিনাল ইলাল লিল-খাল্লাল ইবনে কুদামাহ ১২৯-১৩০, আলমাকাসিদুল হাসানা, সাখাভী ১২১ # জানুয়ারি '১০ঈ.

ভুল ধারণা

শাহজালাল রহ. ও শাহজালালের মাযার কি এক বিষয়?

বর্তমান অজ্ঞতার যুগে মানুষের বিচার-বিবেচনা এতই হ্রাস পেয়েছে যে, অশ্রুতপূর্ব কথা-বার্তা এবং অভাবিতপূর্ব ধ্যান-ধারণা কর্ণগোচর হওয়া স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবর ও মাযারের গর্হিত কার্যকলাপ এবং শিরক ও বিদআত সম্পর্কে যখন কাউকে সাবধান করা হয়, যেমন কবরে মেলা বসানো, ওরস করা, আলোকসজ্জা করা, ফুল দেওয়া, কবরের ওপর ছাদ বা ইমারত নির্মাণ করা, কবরের তওয়াফ করা, সেজদা করা, কবর কিংবা তার ওপর নির্মিত দেয়াল বা ইমারতে হাত বুলানো বা চুম্বন করা, কবরওয়ালার নিকটে প্রার্থনা, মাযারের নামে মান্নত, মাযারের উদ্দেশে সফর, নারীদের মাযারে গমন, পর্দাহীনতা, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি শিরক, বিদআত ও গর্হিত কার্যকলাপ সম্পর্কে যখন সাবধান করা হয়, তখন কিছু মানুষ বোকার মতো বলতে থাকে যে, ভাই! এসব কাজ তো শাহজালাল রহ. এবং অমুক অমুক বুযুর্গের মাযারে হয়ে থাকে। তাহলে তা না-জায়েয কীভাবে হয়? এমনিভাবে অনেকে মাযারের গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করাকে বুযুর্গদের সঙ্গে বেআদবি বলে মনে করে। তাহলে কি তারা বুযুর্গের মাযারকেই বুযুর্গ মনে করে কিংবা মনে করে যে, মাযারে শায়িত বুযুর্গেরা এসব মাযার ও মাযার-পূজার সূচনা করে গেছেন? অথবা মাযার-ব্যবসায়ী ভণ্ড এবং মাযার-পূজারী ভক্তদেরকেও তারা বুযুর্গানে দ্বীন মনে করে?!

শাহজালালের দরগায় গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত লোকেরাও কি শাহজালাল?!

এ কথা তো বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না যে, কোন ব্যক্তি নিজের কবরকে মাযারে পরিণত করতে পারে না। কবরে শায়িত ব্যক্তি কীভাবে ওই কবরের ওপর মাযার নির্মাণ করবে? অতএব বুযুর্গানে দ্বীনের কবরকে মাযারে পরিণত করা এবং তাতে বিভিন্ন গর্হিত কর্মকাণ্ড আরম্ভ করা নিশ্চয়ই পরবর্তী কারও কাজ হবে। শাহজালাল রহ.-এর কবরে এসব কাজ কারা শুরু করেছে? তাঁর কোন শিষ্য, খলীফা, সুন্নতের অনুসারী কোন বুযুর্গ? কক্ষনও না; বরং এসব তাঁর ইন্তেকালের বহু বছর পর একশ্রেণির মাযার-ব্যবসায়ী এবং সুফী-সাধনার

www.eelm.weebly.com

নামে অবাধ যৌনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পৃষ্ঠপোষক বিদআতি ও মুলহিদ গোষ্ঠীর উদ্ভাবন। তাই কেউ যদি এসব গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন এবং মাযারের পাত্র ও দর্শনার্থীদের সম্পর্কে (যারা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে বা ভুল পন্থায় যিয়ারত করে থাকে) আপত্তি করেন তা হবে ঈমানের দাবি পূরণ, যা মাযারে শায়িত ওই সব বুযুর্গগণও প্রচার করে গেছেন। একে বুযুর্গানে দ্বীনের মর্যাদা নষ্টকারী বা বিদ্বেষ পোষণকারী আখ্যা দেওয়া চরম মূর্খতা। তাঁরা বুযুর্গানে দ্বীনের অবমাননাকারী নয়; বরং তাঁদের ঈমানি ও কুরআনি শিক্ষারই ধারক-বাহক। অতএব সাবধান, মাযার ও মাযারে শায়িত বুযুর্গদের এক মনে করবেন না। অন্যথায় আপনিই হবেন বুযুর্গানে দ্বীনের অবমাননাকারী।

ভুল চিন্তা
ইসলাহে নফস এবং যিকির ও ওযীফা কি শুধু বাইয়াত হওয়া মুরীদের কাজ?

আমাদের মাঝে কত মানুষ যে জেনে-বুঝে বা নিজের অজান্তে উপরোক্ত ভুল ধারণার শিকার, তার ইয়ত্তা নেই। মনে করা হয় যে, ইসলাহে নফস তো ওই ব্যক্তির কাজ, যে কোন পীরের হাতে মুরীদ হয়েছে। অথচ কে তাকে বোঝাবে যে, এটি প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য? বাইয়াত হওয়া বা মুরীদ হওয়া তো এর অনুশীলনের জন্য। অর্থাৎ এই দায়িত্ব মুরীদ হওয়ার কারণে অর্পিত হয় না; বরং তা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের কর্তব্য। বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা পাওয়া।

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক মুসলমান কালেমা পাঠের মাধ্যমেই বাইয়াত হয়েছে এবং আখেরাতের ইরাদা রাখার কারণে সে মুরীদও বটে। প্রথাগত বাইয়াত তো উপরোক্ত বাইয়াত ও ইরাদারই নবায়নমাত্র। অতএব মুসলিমমাত্রই মুরীদ ও সালিক।

একজন মুমিনের চিন্তার স্তর এ পরিমাণ উন্নত অবশ্যই হওয়া চাই, যেন নফস ও শয়তানের এসব স্পষ্ট প্রতারণা তাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। তাই আমি নিজেকে ও আমার সহৃদয় বন্ধুদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি, তারা যেন মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী রহ.-এর পুস্তিকা 'তাসাওফ ক্যায়া হ্যায়' (তাসাওউফ কী ও কেন) বা তাঁর কিতাব 'দ্বীন ও শরীয়ত'-এ উপস্থাপিত ইসলাহি কর্মসূচি মোতাবেক কাজ শুরু করেন এবং যিকির ও দুআর ইহতেমাম করেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তওফীক দান করুন। আমীন।

www.eelm.weebly.com

একটা আশ্চর্য অপবাদ

কাফের মারা গেলে কি 'ফী নারি জাহান্নামা' বলতে হয়?

একজন ধর্ম-বিদ্বেষী ব্যক্তি সম্পর্কে শুনেছি যে, সে দ্বীনি মাদরাসা সম্পর্কে সমালোচনা করে লিখেছে, 'এসব প্রতিষ্ঠানে শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, কোন বিধর্মীর মৃত্যুর সংবাদ পেলে 'ফী নারি জাহান্নামা খালিদীনা ফীহা' বলতে হয়।'

আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাচার ত্যাগ করার তওফীক দান করুন। উপরোক্ত বক্তব্য শরীয়ত ও দ্বীনি মাদরাসা উভয়ের সম্পর্কেই মিথ্যাচার। না মাদরাসায় এই শিক্ষা দেওয়া হয় আর না শরীয়তে কোথাও এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

একজন ব্যক্তি জীবদ্দশায় কাফের হলেও তার মৃত্যু কোন্ হালতে হয়েছে তা তো গায়েবি বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। যাদের কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের সংবাদ শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তাদের বিষয় আলাদা। এ ছাড়া সাধারণভাবে কারও সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সে কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব তার মৃত্যুতে 'ফী নারি জাহান্নামা' কীভাবে বলা যায়? উপরন্তু কাফের অবস্থায় মারা গেলেও এই বাক্য পড়তে হয়–এই বিধান কোথায় আছে? কারও সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু শরীয়তেরই বিধান নয়, সভ্যতা ও শরাফতেরও অপরিহার্য দাবি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই শরাফত দান করুন, আমীন। # ফেব্রুয়ারি '১০ঈ.

একটা কুসংস্কার

বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগকে যেখানে সচেতনতার যুগ বলে দাবি করা হয়, সেই সময় এ ধরনের মারাত্মক কুসংস্কারের কথা যখন পত্রিকার পাতায় দেখি, তখন বড়ই অবাক হতে হয়। বৃষ্টির জন্য পুরো দেশজুড়ে হাহাকার উঠলে দেশের উত্তর-দক্ষিণবঙ্গে এ ধরনের একটা প্রথার কথা আমি বেশ ক'বার পত্রিকার পাতায় দেখেছি। অনাবৃষ্টির কারণে এক গ্রামের লোকেরা মিলে একটি ব্যাঙ ধরে অত্যন্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে আরেক গ্রামের একটি ব্যাঙের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় বিয়ে দেয়। এতে উভয় গ্রামের লোকেরা বিয়ের মতো

www.eelm.weebly.com

হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দ উদযাপন করে! তাদের ধারণা, এতে করে বৃষ্টি নেমে আসে। নাউযুবিল্লাহ!

বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙের কী সম্পর্ক? আর তাদের বিয়েরই বা কী তাআল্লুক? এমন হিন্দুয়ানি কুসংস্কার আদি যুগের অনেক কুসংস্কারকেও হার মানায়। আর কেউ যদি বৃষ্টিবর্ষণকে ব্যাঙের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়, তবে তা তো সুস্পষ্ট ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।'

অনাবৃষ্টি হলে কী করতে হবে, তার সুন্দর নির্দেশনা ইসলামেই বিদ্যমান। ইস্তেগফার করা, উন্মুক্ত মাঠে 'সালাতুল ইস্তেস্কা' আদায় করা, সম্মিলিতভাবে দুআ করার কথা হাদীসে এসেছে। প্রত্যেকটি হাদীস ও ফিক্‌হের কিতাবে এ-সংক্রান্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। অতএব সে নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছেই বৃষ্টি চাওয়া উচিত।

ভুল ধারণা

চাশতের নামায কি আট রাকাতই পড়তে হবে?

সে দিন একজনকে খুব আফসোসের সঙ্গে বলতে শুনলাম, সময়ে কুলোয় না, তাই চাশতের নামায পড়তে পারি না। ওযু করে আট রাকাত নামায পড়তে তো আর কম সময় লাগে না! বললাম, আট রাকাতই পড়তে হবে কেন? সে আশ্চর্য-সুরে বলল, এর কমে কি চাশত হয়?

আসলে এটা একটা ভুল ধারণা। আট রাকাতের কমেও চাশত পড়া যায়।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত চাশত পড়তেন। কখনও এর চাইতে বেশিও পড়তেন।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১৯

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া-গ্রন্থির ওপর সদকা রয়েছে। অতএব (এর জন্য) প্রত্যেক তাসবীহ সদকা হবে। প্রত্যেকটি তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সদকা হবে, প্রত্যেকটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদকা হবে, প্রত্যেকটি তাকবীর সদকা হবে, আমর বিল-

www.eelm.weebly.com

মারূফ সদকা হবে, নাহি আনিল মুনকার সদকা হবে। (অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি দ্বারা ওই সদকা আদায় করা যাবে।) আর এর প্রত্যেকটির জন্য চাশতের দু'রাকাত নামাযই যথেষ্ট হবে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭২০

অতএব চাশতের নামায কমপক্ষে দু'রাকাতও পড়া যাবে। বেশি তো পড়া যাবেই।

হাদীস নয়

যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর আর যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও...

أَوْحَى اللهُ إِلَى الدُّنْيَا، أُخْدُمِي مَنْ خَدَمَنِي، وَأَتْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ

'দুনিয়ার কাছে আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করেছেন, (দুনিয়া!) যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর আর যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও।'

দুনিয়া-বিমুখতা ও আখেরাতের জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কোন কোন মানুষ এ কথা বলে থাকেন যে, হাদীসে কুদসিতে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, হে দুনিয়া! যে ব্যক্তি আমার সেবা করে, তুমিও তার সেবা কর। আর যে ব্যক্তি তোমার সেবা করে (অর্থাৎ দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকে) তুমি তাকে কষ্ট দাও।'

এটা হাদীস নয়। কারণ এর সূত্রের মধ্যে 'হুসাইন বিন দাউদ বালাখী' নামক একজন রাবী রয়েছে, যে হাদীস জাল-করণের অভিযোগে অভিযুক্ত। –দেখুন, আলমুগনী ১/২৫৩, তানযীহুশ শরীয়া ১/৫২

তাই খতীবে বাগদাদী রহ. 'তারীখে বাগদাদ' (৮/৪৪)-এ রেওয়ায়েতটিকে জাল আখ্যা দিয়েছেন, তাঁর আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ الْحُسَيْنُ عَنِ الْفُضَيْلِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ

অন্যান্য হাদীস বিশারদও তাঁর সঙ্গে একমত।

দেখুন, ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত ২/৩২৩, শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ ২৩৮; আরও দেখা যায়, আল-লাআলী ২/৩২১, তানযীহুশ শরীয়া ২/৩০৩

উল্লেখ্য, দুনিয়ার আসক্তি ও ভালোবাসা ত্যাগ করা, দুনিয়ায় বসবাস করেও দুনিয়া-বিমুখতা আর আখেরাতের অফুরন্ত জীবনের ভালোবাসা ও তার জন্য

www.eelm.weebly.com

প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর উদ্বুদ্ধকারী কুরআন মাজীদের অজস্র আয়াত আর অসংখ্য সহীহ হাদীস তো রয়েছেই, যা একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট। এর পরও এমন ভিত্তিহীন কোন বর্ণনার পেছনে পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন, আমীন। # মার্চ '১০ঈ.

একটা নতুন রসম

প্রবল বৃষ্টি বন্ধের জন্য আযান

গত সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগে অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টির অবতরণ কামনা করে প্রচলিত একটা কু-সংস্কারের কথা লিখেছিলাম। সেদিন একজন লেখকের একটি লেখায় আরেকটি নতুন রসমের কথা পড়লাম। তবে তা বৃষ্টি অবতরণের জন্য নয়, বৃষ্টি বন্ধের জন্য। তিনি লিখেছেন–

'বৃষ্টিপাত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, ... কেউ কেউ ব্যাকুল হয়ে ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করে আযান দেওয়ার জন্য, যিনি বৃষ্টি দেন সেই আল্লাহ্ তাআলা আযান শুনে হয়তবা অনুভব করবেন তাঁর বান্দার অসহায়ত্ব, রহমত করবেন এবং ফিরিয়ে নেবেন বজ্র, বৃষ্টি, বাতাস।'

জানি না, বজ্র-বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আযান দেওয়ার' এই আমল লেখকের স্রেফ কল্পনা না বাস্তবেও কোন এলাকায় এর প্রচলন রয়েছে। হয়ত দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার চিন্তা থেকেই এই নতুন আমল।

এখানে উল্লেখ্য, সুদিনে আল্লাহ্র শোকর আদায় করা, দুর্দিনে সবর করা এবং তাঁর দেওয়া আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এই কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই শোকর, সবর ও আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রথমত ওই আমলগুলোই করা উচিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, অনাবৃষ্টি ও অতি বৃষ্টি– দু'টোই বান্দার কষ্টের কারণ। এ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহ তাআলার কাছে বৃষ্টি চাওয়ার সুন্দর নিয়ম যেমন ইসলামে রয়েছে, তেমনি অতিবৃষ্টির ক্ষতি থেকে বাঁচতে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় নেওয়ার সুন্দর শিক্ষাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

www.eelm.weebly.com

উম্মতকে দিয়েছেন। একজন মুমিনকে তাঁর শিক্ষা দেওয়া আমলের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার আশ্রয় কামনা করা উচিত।

সহীহ হাদীসে এসেছে, 'একবার মদীনায় এক সপ্তাহ একাধারে প্রবল বৃষ্টিপাত হল। অবিরাম বৃষ্টির সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে সাহাবীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন নবীজি এভাবে দুআ করেন–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الْأَشْجَارِ-

নবীজির দুআর ফলে মুহূর্তে মদীনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১০১৪

এমনিভাবে ঝড়-তুফানের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ

আর বাতাস কমে বৃষ্টি নেমে এলে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাত। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার 'হামদ' করতেন, বলতেন, এটি 'রহমত'। আরও বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا –ফাতহুল বারী ২/৬০৪, ৬০৮

অতএব হাদীসে বর্ণিত এসব দুআ, এছাড়া অন্যান্য দুআ-ইস্তেগফার বা 'সালাতুল হাজত' পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এসব বালা-মসিবত থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। কিন্তু আযান তো ইসলামের অন্যতম শেআর, যার জায়গা ও ক্ষেত্রগুলো শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত। তাই সেই নির্ধারিত জায়গাতেই এই আমল সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

হাদীস নয়

মকতবে ঈসা আ.-এর আলিফ, বা... ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া

কোন কোন বক্তাকে এই ধরনের ঘটনা বলতে শোনা যায় যে–

'হযরত ঈসা আ.কে বাল্যকালে তাঁর মা মারয়াম আ. যখন মকতবে পাঠিয়েছিলেন, তখন মকতবের শিক্ষক তাঁকে বললেন, বল, আলিফ, বা...। ঈসা আ. প্রশ্ন করলেন, আলিফ অর্থ কী? শিক্ষক ছোট ছেলের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন ঈসা আ. নিজেই শিক্ষকের

www.eelm.weebly.com

চেয়ারে বসে আলিফ থেকে শুরু করে ইয়া পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণের ব্যাখ্যা করলেন এবং প্রত্যেকটি বর্ণ থেকে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন মহিমার বর্ণনা দিলেন।'

আবার অনেক বক্তার মুখে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দেওয়ার কথাও শোনা যায়।

কিন্তু বাস্তবতা হল এ-সংক্রান্ত ঘটনা ও বর্ণনা কোনটিই প্রমাণিত নয়। যেসব বর্ণনায় এ ধরনের ঘটনা রয়েছে, তাকে হাদীস বিশারদগণ প্রমাণিত নয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন–

مَا يَصْنَعُ مِثْلَ هٰذَا إِلَّا مُلْحِدٌ يُرِيْدُ شَيْنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ جَاهِلٌ فِيْ غَايَةِ الْجَهْلِ، وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالدِّيْنِ

–আলমাওযূআত ১/৩২৮-৩৩০

হাফেয সুয়ূতী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসও তাঁর সঙ্গে একমত। আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন–

هُوَ مَوْضُوْعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى كَذَّابٌ.

–আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ৪৯৭, আরও দেখা যেতে পারে– আলকামিল ১/৩০৩, মীযানুল ইতিদাল ১/২৬৯-২৭০, লিসানুল মীযান ২/১৮১-১৮২, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/১৯, আললাআলী ১/১৭২, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৩১

এ ছাড়া সে সময় ওই এলাকার ভাষাও আরবী ছিল না যে মকতবে আরবী বর্ণমালার পাঠদান চলবে। বাল্যকাল থেকে হযরত ঈসা আ. থেকে প্রমাণিত ও সত্য আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি বা মুজিযা অনেক রয়েছে, সেগুলোই বয়ান করা উচিত। অতএব এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনার বয়ান একেবারেই পরিহার করা উচিত। # এপ্রিল '১০ঈ.

ভুল শব্দ

অকাল মৃত্যু

কম বয়সে কারও মৃত্যু হলে অকাল মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ প্রয়োগ এড়িয়ে চলা কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর জন্য 'মৃত্যু' যেমন অনিবার্য, তেমনি তার দিন-ক্ষণও নির্ধারিত। সেই নির্ধারিত সময়েই তার মৃত্যু হবে। এতে সামান্য এদিক-সেদিক হবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

www.eelm.weebly.com

'আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না। কেননা, তা সুনির্ধারিত।' -সূরা আলে-ইমরান ১৪৫

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً ۚ وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

'আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দিতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এর পর যখন তাদের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।' –সূরা নাহল ৬১

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন–

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।' –সূরা আলে-ইমরান ১৬৮

হায়াত-মওতের মালিক আল্লাহ্ তাআলা এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকাল আল্লাহ্ তাআলার নিকট সুনির্ধারিত। অতএব কেউ যদি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর মারা যায়, তবে এটুকুই তার হায়াত। তেমনি কেউ যদি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করে, তবে এই পঁচিশ-ত্রিশ বছরই তার হায়াত। তার মৃত্যু সেই সময় মতোই হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যা তার জন্য নির্ধারিত করেছেন।

এমনিভাবে একশ বছর বয়সে কারও মৃত্যু হওয়ার মানে এই নয় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত সময়কালের অধিক হায়াত পেয়েছে।

এটি অতি সহজ একটি কথা। সুতরাং কম বয়সে কারও মৃত্যু হলে সমবেদনা জানাব, মরহুমের মাগফেরাতের জন্য দুআ করব, বড় জোর বলব যে, তার তাকদীরে কত কম হায়াত লিখিত ছিল! কিন্তু এটাকে আবেগের বশে অকাল মৃত্যু শব্দে ব্যক্ত করব না।

একটা ভুল শ্লোগান

ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার

এই মুখরোচক শ্লোগানটি ইদানীং খুব শোনা যায়। একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী

www.eelm.weebly.com

তোতাপাখির মতো তা আওড়ে থাকেন। সম্ভবত তারা বলতে চান, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। অতএব সমাজ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

এই সেক্যুলার ধ্যান-ধারণা হয়ত মানবরচিত ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম ইসলামের বেলায় তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এতে অণুপরিমাণ সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের পরিষ্কার ধারণা ও অটল ঈমান থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী খেলাফত থাকা অবস্থায় সকল মুসলিম জনপদ ছিল একই কেন্দ্রের অধীন। তখন ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থাসহ ইসলামের জীবন-ব্যবস্থার বাস্তব কাঠামো ছিল প্রত্যেক মানুষের সামনে দৃশ্যমান; কিন্তু এক সময় আমাদের কৃতকর্মের কারণে ইসলামী খেলাফতের দুর্বলতার সুযোগে আল্লাহ্র দুশমনরা বিশাল মুসলিম সালতানাতকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। মুসলিম জনপদগুলো রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেলে মুসলমানরা আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দেওয়া খেলাফত-ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দুঃখজনকভাবে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর কোন ভূ-খণ্ডেই পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থা চালু নেই। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানুষের মন থেকে চিরতরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার চিত্র মুছে দিতে আল্লাহ্র দুশমনরা এসব অর্থহীন শ্লোগানের কৌশলী ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছে।

অতএব এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল মুমিন-মুসলমানের মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় শরীয়তসম্মত উপায়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বোপরি অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যদিও আমরা সাময়িকভাবে ইসলামী খেলাফতের রহমত থেকে বঞ্চিত, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামে সুষ্ঠু, সুষম ও প্রতিযুগে কার্যকর আদর্শ ব্যবস্থা রয়েছে, যা সর্বযুগে অশান্ত পৃথিবীর জন্য শান্তির একমাত্র চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে হেফাযত করুন এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন। # মে '১০ঈ.

ভুল ধারণা

ইস্তেখারার জন্য কি ঘুমাতে হয়?

কোন কাজ করার ইরাদা করলে কিংবা অত্যাসন্ন কোন বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করতে তাঁরই দরবারে কায়মনোবাক্যে বিশেষ

www.eelm.weebly.com

পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার নাম ইস্তেখারা। অর্থাৎ ইস্তেখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করে যে, আমি যা করতে চাই তাতে যদি আমার কল্যাণ থাকে, তাহলে তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং বরকত দান করুন। আর যদি তাতে কল্যাণ না থাকে, তা হলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ তা-ই আমাকে দান করুন। এটিই হল ইস্তেখারার হাকীকত।

ইস্তেখারার জন্য দুটো কাজ করণীয় বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। দু'রাকাত নামায আদায় করা এবং ইস্তেখারার প্রসিদ্ধ মাসনুন দুআটি মনোযোগের সঙ্গে পড়া। সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোন কারণে এ দুটো কাজ সম্ভব না হলে তিনবার বা সাতবার এই দুআ পড়েও ইস্তেখারা করা যায়–

اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ

–ইবনুস সুন্নী, হাদীস ৫৯৭, ৫৯৮

এর পর যে দিকে কলবের ইত্মেনান হবে আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করে সেই কাজ আরম্ভ করবে। এভাবে আমল করলে ইস্তেখারা হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এই আমল করার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। রাত বা দিনের যে কোন সময় তা করা যায়; কিন্তু অনেকে মনে করে, ইস্তেখারার জন্য ঘুমাতে হয় কিংবা রাতের বেলায় ঘুমানোর আগেই শুধু ইস্তেখারা করা যায়। আবার অনেকে মনে করে, স্বপ্ন দেখলেই ইস্তেখারা পূর্ণ হবে।

আসলে এর কোনটিই ইস্তেখারার জরুরি কোন বিষয় নয়; বরং রাত-দিনের যে সময় নামায পড়া যায় তখনই দুই রাকাত নামায ও নির্দিষ্ট দুআটি পড়ে ইস্তেখারা করে নেওয়া যায়।

হাদীস নয়
আঠারো হাজার মাখলুকাত

উপরের কথাটা লোকমুখে এতই প্রসিদ্ধ যে, অনেকের কাছে তা কুরআন হাদীসের বাণীর মতো স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু মাখলুকাতের এই নির্দিষ্ট সংখ্যা না কুরআনে আছে, না কোন সহীহ হাদীসে।

বাস্তবতা হল আল্লাহ্ তাআলা অগণিত মাখলুক পয়দা করেছেন। জলে ও স্থলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাখলুক আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের প্রমাণ। মানুষের জানার বাইরেও রয়েছে অসংখ্য মাখলুক।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ তাআলা কত ধরনের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা সহীহ্ হাদীসে বলা হয়নি। একটা 'মুনকার' বর্ণনায় এর সংখ্যা 'এক হাজার' বলা হয়েছে; কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনাটাকে মওযূ বা জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। –আলমাওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/২১৬, আলফাওয়াইদুল মাজমূআ ৪৫৮-৪৫৯

এ ছাড়া এ সংখ্যা সম্পর্কে কিছু মনীষীর উক্তিও রয়েছে। যেমন মারওয়ান ইবনুল হাকামের কথামতে সতের হাজার জগৎ রয়েছে। আর আবুল আলিয়ার অনুমান অনুযায়ী চৌদ্দ হাজার কিংবা আঠারো হাজার মাখলুকাত আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। এ বিভিন্ন সংখ্যা কিছু মনীষীর উক্তিমাত্র, হাদীস নয়। দ্বিতীয়ত তাদের বক্তব্য থেকেও অনুমিত হয় যে, নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বোঝাতে নয়; বরং আধিক্য বোঝাতেই তারা এসব কথা বলেছেন। তাও আবার অনুমান করে।

এ কারণে এর কোনটাকেই প্রমাণিত সত্য মনে করার কোন কারণ নেই; বরং এ বিষয়ে ইবনে কাসীর রহ.-এর কথাটাই মূল কথা, যা তিনি আবুল আলিয়ার পূর্বোক্ত কথাটা পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন। আর তা হল–

وَهٰذَا كَلَامٌ غَرِيْبٌ يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إِلَى دَلِيْلٍ صَحِيْحٍ

অর্থাৎ এটা এমন একটা আজব কথা, যার জন্য বিশুদ্ধ দলিলের প্রয়োজন রয়েছে। –তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৬

অতএব আঠারো হাজার নয়; বরং বলা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা অসংখ্য অগণিত মাখলুক পয়দা করেছেন, যা আমরা গুণে ও হিসাব করে শেষ করতে পারব না।

ভুল মাসআলা

রিকশা বা যানবাহনে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা কি নিষেধ?

আমাদের একজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তির মুখে তাঁর নিজের এই ঘটনা কয়েকবার শুনেছি যে, একবার তিনি রিকশায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। চালক তাঁর আখলাকে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। রিকশা থেকে নেমে বিদায়ের সময় চালক বলল, আপনার ব্যবহার আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তবে একটা কাজ আপনি ঠিক করেননি। তা হচ্ছে, আপনি রিকশায় বসে বসে কুরআন শরীফ পড়েছেন। এটা ঠিক না।

www.eelm.weebly.com

বলাবাহুল্য, এটা ওই বেচারার ভুল ধারণা। কারণ চলাফেরা, ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ সর্বাবস্থায় যিকির করতে কুরআন মাজীদে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা। # জুন '১০ঈ.

দুটো বিদআত

লাইলাতুর রাগাইব ও শবে ইস্তেফতাহ পালন

কিছুদিন আগে একটি মসজিদে 'ইসলামী পবিত্র দিনসমূহ' শিরোনামের একটি তালিকা নযরে পড়ল। সযত্নে লেখা এই তালিকাটিতে দেখলাম, রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার 'লাইলাতুর রাগাইব' আর রজবের পনেরো তারিখ 'শবে ইস্তেফতাহ'।

আসলে রজব মাস নিয়ে কোন কোন মহলে বিভিন্ন কল্পিত বিদআত ও রসমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর সমর্থনে ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জালকৃত বিভিন্ন বর্ণনাও 'মকসুদুল মুমিনীন' ও 'বার চাঁদের ফযীলত ও আমল' জাতীয় কিছু অনির্ভরযোগ্য বইয়ে পাওয়া যায়। যেমন একটা জাল বর্ণনা হল 'যারা রজব মাসে রোযা রাখে, তাদের গোনামাফির জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুমার রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুআয় মগ্ন থাকেন।'

এ রকম আরেকটা ভিত্তিহীন বর্ণনা হল 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, এর পর মাগরিব ও ইশার মাঝখানে দু'রাকাত করে (বিশেষ পদ্ধতিতে) বার রাকাত নামায আদায় করে, তার সকল প্রয়োজন পূরণ করা হয় এবং তার সকল গোনাহ মাফ করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকণা, পাহাড়ের ওযন এবং বৃক্ষের পাতার সমপরিমাণ হয়। আর কেয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ গোনাহগার জাহান্নামের উপযোগী মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।'

প্রয়োজন পূরণের কথিত এই রাতটির নামও রাখা হয়েছে 'লাইলাতুর রাগাইব'। আর বিশেষ পদ্ধতির উল্লিখিত নামাযের নাম 'সালাতুর রাগাইব'।

এমনিভাবে পনের রজবের রাত সম্পর্কিত একটি জাল বর্ণনা হল–

'এ রাতে চার রাকাত নামায বিশেষ নিয়মে আদায় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দরূদ, তাসবীহ-তাহমীদ ও তাহলীল আদায় করলে আল্লাহর পক্ষ হতে তার নিকট এক হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়। যারা ওই ব্যক্তির জন্য নেকি

www.eelm.weebly.com

লিখতে থাকেন এবং ওই রাত পর্যন্ত যত গোনাহ সে করেছে সব ক্ষমা করে দেন। অবশেষে তার কাঁধে হাত রেখে একজন ফেরেশতা বলে, তুমি নতুন করে আমল শুরু কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন ...।'

গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নতুন করে আমল শুরু করার এই বানোয়াট বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এই রাতের নাম রাখা হয়েছে 'শবে ইস্তেফ্তাহ'।

উল্লিখিত বর্ণনা ছাড়াও এ দু'রাত সম্পর্কে এ ধরনের আরও প্রচুর ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে; কিন্তু আসল কথা হল শরীয়তে 'লাইলাতুর রাগাইব' ও 'শবে ইস্তেফতাহ' নামে বিশেষ কোন রাতের অস্তিত্বই নেই।

নামে-বেনামে রজব মাসে এ বিশেষ রাত উদযাপন হচ্ছে নবউদ্ভাবিত বিদআত। কুরআন ও সুন্নাহ্য় যার কোন প্রমাণ নেই। তেমনিভাবে ওই রাত বা দিনগুলোতে কোন নির্দিষ্ট নামায-রোযা বা অন্য কোন বিশেষ আমলের কথাও ইসলামে নেই। এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনা ও রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল।

অতএব 'লাইলাতুর রাগাইব' হোক কিংবা 'শবে ইস্তেফ্তাহ' এগুলো উদযাপন করা কিংবা কল্পিত ও ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের আমল করা সবই পরিত্যাজ্য। এগুলো থেকে দূরে থাকাই একজন মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

একটা বদ-রসম

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগি করত। তাদের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। পরবর্তী সময়ে কুফর-শিরকের মতো মারাত্মক ব্যাধির বিস্তার ঘটার পেছনে মূল কারণ ছিল ছবি ও প্রতিকৃতি।

একটি সহীহ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগের বরেণ্য নেককার লোকের মৃত্যু হলে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি বানানো হত। ছবি থেকে সম্মান প্রদর্শন, তা থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ানো, তা থেকে সেজদা করাসহ ধীরে ধীরে এসব প্রতিকৃতির ইবাদত-বন্দেগি শুরু হল। আল্লাহ্র সঙ্গে তাদেরও কিছু অংশীদারত্ব জুড়ে দিয়ে তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হল।

www.eelm.weebly.com

ইসলামে শিরকের এই উৎসমুখ কঠোরভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রতিকৃতি নির্মাণ বড় ধরনের গোনাহ, সেখানে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন মনীষী ও ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং এ জাতীয় বিভিন্ন উপায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন যে কত জঘন্য অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়। এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী, যা একদিকে মানুষকে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে এসব মরহুম মানুষের (আল্লাহ্ সকল বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদের সঙ্গে রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মুআমালা করুন) সকল অবদান ও কীর্তিকে কলুষিত করা হচ্ছে।

অতএব শরীয়ত নির্দেশিত পন্থাতেই স্মরণীয়-বরণীয় মরহুম মানুষকে স্মরণ করা উচিত। এ পথেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মুক্তি ও সফলতা। অন্য কোন পথে নয়। # জুলাই '১০ঈ.

ভুল মাসআলা

বছরের শুরু-শেষের মধ্যে সম্পদের সর্বনিম্ন পরিমাণের যাকাত দেওয়া

কানাডা প্রবাসী এক ভাই জানালেন, সে দেশের কিছু ইসলামী সংগঠনের পক্ষ হতে সরবরাহকৃত যাকাতের হিসাব সহজে বের করার নকশাসম্বলিত কাগজে লেখা আছে যে, যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বছরের শুরু ও শেষ উভয় সময়ের মধ্যে সম্পদের যে পরিমাণ সর্বনিম্ন, সে হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব যাকাতদাতাকে এই সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পদের যাকাত দিতে হবে। বছরের শেষে এই পরিমাণের চেয়ে সম্পদ বেশি থাকলেও।

এটা সঠিক মাসআলা নয়। সঠিক হল যাকাত-বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সময় যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে, তার যাকাত আদায় করতে হবে; বছরের শুরুতে ও মাঝে সম্পদ কম থাকুক বা বেশি। যেমন বছরের শুরুতে মুহাম্মাদ আলী সাহেবের কাছে এক লক্ষ টাকার সম্পদ ছিল। বছর শেষে দেখা গেল তার সম্পদের পরিমাণ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। তাহলে এখন তাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের শুরু কিংবা শুরু-শেষের মাঝে সর্বনিম্ন পরিমাণের হিসাবে নয়।

এ মাসআলা হাদীস, আসার ও ফিকহে ইসলামীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে। অতএব মাসআলা দেওয়া ও প্রচার করা-সহ দ্বীনি যেকোন কাজে সবার সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

www.eelm.weebly.com

ভুল ধারণা

বিধর্মীদের 'ইয়াদাত' ও তাদের সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে কি না?

অমুসলিম প্রতিবেশী বা পরিচিত কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে না–এমন একটা ধারণা অনেকের রয়েছে। আবার অনেকে মনে করে যে, মানবিক কারণে 'ইয়াদাত' করা গেলেও সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে না।

দুটো ধারণাই ভুল; বরং প্রতিবেশী, আত্মীয় বা পরিচিত কেউ অমুসলিম হলেও অসুস্থ হলে তার 'ইয়াদাত' করা উচিত। সে ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের তাকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সম্ভাব্য সকল সেবা-শুশ্রূষা করা, উপরন্তু তাদের সুস্থতা ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করাতে অসুবিধার কিছু নেই; বরং পারিপার্শ্বিক অন্য কোন সমস্যা না থাকলে এমনটি করাই উত্তম। কোন বিধর্মী আত্মীয় বা প্রতিবেশী অসুস্থ হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখতে যেতেন এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, 'এক ইহুদি কিশোর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবীজি তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে মুসলমান হয়ে গেল।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৫৬, ৫৬৫৭

সুতরাং কোন পরিচিত অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং তার সুস্থতার জন্য দুআ করার অবকাশ আছে। সম্ভব হলে তার সামনে দ্বীনের দাওয়াতও পেশ করা উচিত। হতে পারে আল্লাহ্ তাআলা তাকে হক কবুল করার তওফীক দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবেন।

ভুল বিশ্বাস

আলোচনা চলাকালে উপস্থিত হলে কি হায়াত দীর্ঘ হয়?

অনুপস্থিত কোন ব্যক্তিকে নিয়ে কথা চলছে এমন সময় সে উপস্থিত হলে অনেককে বলতে শোনা যায় যে, তুমি লম্বা হায়াত পাবে, আমরা তো তোমার আলোচনা করছিলাম।

এ ধরনের কথা এত বেশি প্রচলিত যে, শুনে মনে হতে পারে, তা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর সঙ্গে হায়াত হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিশ্বাস। শরীয়তে যেমন

www.eelm.weebly.com

এর কোন ভিত্তি নেই, তেমনি বিবেক-বুদ্ধিও এ ধরনের অলীক ধারণা সমর্থন করে না। অতএব এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

হাদীস নয়

মাদরাসা রাসূলের ঘর

কোন কোন ওয়ায মাহফিলে এ ধরনের কথা শোনা যায় যে–

'মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর আর মাদরাসা রাসূলের ঘর।'

আবার কোন কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তা আরেকটু আগে বেড়ে এটাকে হাদীস হিসাবে এভাবেও বর্ণনা করেন যে–

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ، وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ

'মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর আর মাদরাসা আমার ঘর।'

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত কথায় দু'টি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যটি হল 'মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর'। এটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। প্রায় এর কাছাকাছি শব্দ বিভিন্ন হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ 'মাদরাসা রাসূলের ঘর' এটা কোন হাদীস নয়। কেউ এটাকে হাদীস হিসাবে বললে ঠিক হবে না। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, 'মাদরাসা' যেখানে দ্বীনি তালীম তরবিয়ত হয়, কুরআন হাদীসের শিক্ষা দেওয়া হয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা আলোচনা হয় তা নিঃসন্দেহে মুবারক স্থান। এসব স্থান ফেরেশতাগণ ঘিরে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাকীনা নাযিল হয়। অতএব ওই সব ঘরও আল্লাহ্ ও রাসূলেরই ঘর; কিন্তু তাই বলে 'মাদরাসা রাসূলের ঘর' বাক্যটিকে হাদীস হিসাবে বলার সুযোগ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বলেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। আর মসজিদ মাদরাসার মধ্যে এভাবে বিভাজনও অনুচিত। # অক্টোবর '১০ঈ.

একটা রসম

দিনের প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানানো

সকাল বেলা রাস্তায় চলাচল করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, রিকশা, সিএনজি চালকরা দিনের প্রথম উপার্জন হাতে পাওয়ার পর তাতে চুমো দেয়; গাড়ির স্টিয়ারিং, হাতল বা কোন অংশে ছোঁয়ানোর পরে বুকে ও চোখে

www.eelm.weebly.com

লাগায়। অনেককে কপালে ঠেকাতেও দেখা যায়। তেমনি কোন কোন ব্যবসায়ীও দিনের প্রথম উপার্জনকে এভাবে ভক্তি জানিয়ে থাকে।

নিজের কষ্টার্জিত অর্থের ওপর মানুষের মায়া থাকা স্বাভাবিক। 'দ্বীনে ফিতরাত' ইসলামে এ স্বাভাবিক আকর্ষণ দোষণীয় নয়; কিন্তু উপরোক্ত ছোঁয়াছুঁয়ি ও কপালে ঠেকানোর মতো ভক্তিমূলক আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানালে পরবর্তী উপার্জনের পথ সুগম হবে-এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এসব আচরণের সবচেয়ে নিন্দিত দিকটা হল উপার্জনের মাধ্যমকে অর্থাৎ গাড়ি, পণ্য বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উপার্জনদাতা মনে করা। এমনকি কারও কারও কথাবার্তা থেকে তো পৌত্তলিকতারও আভাস পাওয়া যায়।

বাস্তব কথা এই যে, এ মাধ্যমগুলো উপলক্ষ মাত্র। তাই সবকিছু ঠিক থাকার পরও সবার উপার্জন এবং সব সময়ের উপার্জন সমান হয় না। উপার্জন ও রিযিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হাতে।

তিনি কখন কাকে কীভাবে রিযিক দেবেন এবং কোন্ উপায়ে দেবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের কাজ হল হালাল উপার্জনের চেষ্টায় আল্লাহ্র দেওয়া মেধা ও শক্তি ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্র কাছে রিযিক প্রার্থনা করা। এর পর মাওলা দয়া করে বান্দাকে যা কিছু দান করেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর শোকর গোযারি করা। সর্বোপরি এ অটল বিশ্বাস রাখা যে, উপার্জন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। আর নেয়ামতের শোকরগোযারি করলে আল্লাহ্ তাআলা তা বাড়িয়ে দেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'তোমরা যদি শোকর কর তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বেশি দান করব।'

উপার্জন হাতে আসার পর এই হল একজন মুমিনের কর্তব্য। তা না করে উপার্জনের মাধ্যম এবং উপার্জিত অর্থ-কড়িকে ভক্তি জানিয়ে মাথায় ও কপালে ঠেকানো সম্পূর্ণ অর্থহীন আচরণ। এর সাথে যদি কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস যুক্ত হয় তাহলে তা যে একটি গর্হিত কাজে পরিণত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.eelm.weebly.com

একটি শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ

'রূহ' বা 'বিদেহী আত্মা'র মাগফেরাত কামনা

মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফেরাতের দুআর ক্ষেত্রে 'মরহুমের রূহ কিংবা বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা' জাতীয় শব্দ ব্যবহারের প্রচলন আছে।

মরহুমের জন্য মাগফেরাতের দুআ করা একটি নেক আমল। হাদীস শরীফে এ আমলের তারগীব দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মাসনুন দুআও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অতএব মরহুমের জন্য মাগফেরাতের দুআ করা উচিত। কিন্তু বিষয়টিকে মরহুমের রূহ বা বিদেহী আত্মার সাথে যুক্ত করার কী অর্থ?

মাগফেরাত কামনার অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলা যেন তার 'গোনাহখাতা' মাফ করে দেন–এই দুআ করা। গোনাহ যেমন মানুষের অভ্যন্তরীণ 'নফস' দ্বারা হয়, তেমনি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়। তেমনি আল্লাহ্ তাআলা না করুন– দুনিয়ার এসব গোনাহখাতার জন্য যদি আখেরাতের আযাব ভোগ করতে হয় তাহলে রূহ যেমন তা ভোগ করবে, তেমনি দেহও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা ভোগ করবে। এটিই আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর আকীদা। একইভাবে নেয়ামত, সুখ-শান্তিও দেহ-আত্মা উভয়ই ভোগ করবে। তাই দেহ বাদ দিয়ে শুধু রূহের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনার কোন অর্থ হয় না।

ভুল কথা

বিয়েতে 'কালেমা' পড়ানো

তাবলীগের একজন সাথী আমাকে বলেছেন যে, একদিন গাশতে তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাই কালেমা পড়তে জানেন? লোকটি অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে বলল, নাহ! আমি তো এখনও বিয়ে করিনি!

বিয়ের আকৃদ পড়ানোকে অনেকে 'কালেমা' পড়ানো বলে; কিন্তু এই তাবলীগী সাথীর ঘটনায় বুঝলাম, কালেমা পড়ানোর আরও অর্থ আছে।

সাধারণত কালেমা বলতে 'কালেমা তাইয়েবা' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বা ইসলামের বুনিয়াদি আকীদাসম্বলিত কয়েকটি কালেমাকেই বুঝায়। বিয়ের আকৃদের সময় এ ধরনের কোন কালেমা পড়া বা পড়ানোর নিয়ম নেই। মাসনুন খুতবার পর সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মেয়ে পক্ষের সম্মতিক্রমে খতীব ইজাব বা প্রস্তাব দেন। ছেলে 'কাবিলতু' কিংবা

www.eelm.weebly.com

কবুল করলাম শব্দ বলার দ্বারা আক্বদ পূর্ণ হয়ে ছেলেমেয়ে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়ে যায়।

এখানে কালেমা পড়ানোর কোন বিষয় নেই। তবে কাবিলতু বা কবুল করলাম শব্দটিকে যদি আরবী আভিধানিক অর্থে কালেমা বলা হয়, তবুও তো এখানে পড়ানোর কিছু নেই। যেহেতু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে, তাই বিয়ের আক্বদকে কালেমা পড়ানো না বলাই ভালো।

সবচেয়ে বড় কথা হল দ্বীন সম্পর্কে কী পরিমাণ অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থাকলে একজন মুসলমান কালেমা পড়াকে বিয়ের সময়ের বিষয় বলে মনে করতে পারে, তা ভেবে দেখা উচিত এবং এ বিষয়ে আমাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাও ভেবে দেখা কর্তব্য। # নভেম্বর '১০ঈ.

নামাযে কয়েকটি ভুল

নামাযে মনে মনে কুরআন পড়া

যেসব নামাযে আস্তে কেরাত পড়া হয়, সেসব নামাযে অনেককে দেখা যায়, মুখ-ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সূরা-কেরাত পড়েন। হয়ত তারা এই ভুল ধারণা করে আছেন যে, আস্তে আস্তে কেরাত পড়া মানে মনে মনে পড়া।

এটা ঠিক নয়। কারণ যেসব নামাযে কেরাত আস্তে পড়তে বলা হয়েছে, তার অর্থ হল নিচু স্বরে তেলাওয়াত করা। আর এতো খুবই সহজ কথা যে, মনে মনে পড়া কোনক্রমেই নিচু স্বরে পড়া নয়।

ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদি থেকেও বোঝা যায় যে, আস্তে কেরাত পড়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল এমনভাবে পড়া, যেন সে নিজে শুনতে পায়। আর সর্বনিম্ন এতটুকু তো অবশ্যই জরুরি যে, সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করা হবে এবং ঠোঁট-জিহ্বার নড়াচড়া দেখা যাবে।

একটি হাদীসে আছে যে, যোহর ও আসর নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন পড়তেন, তখন কোন কোন আয়াত সাহাবায়ে কেরামও কখনও কখনও শুনতে পেতেন। হযরত আবু মা'মার বলেন, 'আমরা হযরত খাব্বাব রা.কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীজি কি যোহর ও আসর নামাযে কুরআন পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, 'বিজ্‌তিরাবি লিহ্‌য়াতিহী' 'তাঁর দাড়ি মুবারক নড়াচড়ার দ্বারা।' –সহীহ বুখারী–ফাতহুল বারী ২/২৮৪-২৮৭

www.eelm.weebly.com

অতএব কেরাত পড়ার সময় জিহ্বা ও ঠোঁট ব্যবহার করে মাখরাজ থেকে সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করতে হবে। অন্যথায় শুধু মনে মনে পড়ার দ্বারা কেরাত আদায় হবে না।

তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা

এটা আরেকটা ভুল। ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় এ ভুল ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে বাঁধাকেই অনেকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নামাযের শুরুতে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমে মনে মনে কোন্ নামায পড়ছি–এর সংকল্প করতে হবে। এর নাম নিয়ত, যা নামায সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি।

উল্লেখ্য, মনে মনে সংকল্প করে নিলেই নিয়ত হয়ে যাবে, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

দ্বিতীয় কাজটি হল তাকবীরে তাহরীমা। অর্থাৎ স্পষ্ট উচ্চারণে 'আল্লাহু আকবার' বলা। যেহেতু এই তাকবীরের মাধ্যমে নামায বহির্ভূত সব কাজ হারাম হয়ে যায়, তাই একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। এই তাকবীর বলা ফরয। যা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

তৃতীয় কাজ হল কান পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে নাভির নিচে বাঁধা। এই কাজটি সুন্নত।

প্রচলিত পরিভাষায় 'নামাযের নিয়ত বাঁধা' এই তিন আমলের সমষ্টিকেই বোঝায়।

এখন কেউ যদি শুধু হাত উঠিয়ে তা বেঁধে নিল, কিন্তু আল্লাহু আকবার বলল না বা মনে মনে বলল, তাহলে নামাযের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবটিই আদায় হয়নি। ফলে তার নামায আদায় হবে না।

অতএব এখানেও তাকবীর স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। শুধু মনে মনে বলা যথেষ্ট নয়।

আমীন মনে মনে বলা

এটাও আরেকটা ভুল। নিয়ম হল জামাতে নামায পড়ার সময় ইমাম সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করার পর মুক্তাদি 'আমীন' বলবে। আমীন আস্তে বলা এবং জোরে বলা দু'টোই শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত; যদিও অধিকাংশ সাহাবী

www.eelm.weebly.com

ও তাবেয়ীর আমল আস্তে বলাই ছিল। তাই অনেক ফকীহ আস্তে বলাকেই উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ কোনভাবেই মনে মনে বলা নয়। 'আস্তে বলা' কিংবা 'অনুচ্চস্বরে' বলা আর মনে মনে বলা এক কথা নয়।

আমীন বলার ফযীলতপূর্ণ সুন্নতটি আদায় করার সময়ও তা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ এ তিনটি আমলের কথা বলা হল, অন্যথায় তাকবীর তাসবীহ তাশাহহুদ ও দুআর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই আমলগুলোও মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

অতএব উদাসীনতা বা অবহেলার কারণে হোক কিংবা না-জানার কারণে, সর্বাবস্থায় উল্লিখিত সব ক্ষেত্রে মনে মনে বলার ভুল পদ্ধতি সংশোধনযোগ্য।

ভুল কথা

কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম

দিনের প্রথম উপার্জনকে প্রণাম করা সম্পর্কে আগেই লেখা হয়েছে। এটা পড়ে একজন পাঠক জানালেন, বিপদাপদের সম্মুখীন হলে কোন কোন মানুষকে এ ধরনের কথাও বলতে শোনা যায় যে, 'কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম!'

বাস্তবে এটা আরেকটা গর্হিত কথা, যার কোন ধরনের ভিত্তি নেই। আর এই ভিত্তিহীন কথার ওপর নির্ভর করে দিনের প্রথম দেখা মানুষটির ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা তো মারাত্মক অন্যায়।

কারণ আল্লাহ্ তাআলাই বিভিন্ন হেকমতে বান্দাকে বালা-মসিবত দিয়ে থাকেন, যেমন দিয়ে থাকেন অসংখ্য নেয়ামত। এর সাথে প্রথম দেখা মানুষটির কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম এ ধরনের মানসিকতাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘোষণা করেছে–

لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

'রোগ লেগে যাওয়া, কুলক্ষণ, পেঁচা ও 'সাফার'–এসবের কোন বাস্তবতা নেই।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭০৭

তা ছাড়া অযথা কারও প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা গোনাহ। ইরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

www.eelm.weebly.com

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা পরিহার কর। কারণ কোন কোন ধারণা গোনাহ।' –হুজুরাত ১২

অতএব এ ধরনের অমূলক ধারণা ও অসমীচীন কথা পরিত্যাগ করা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। # জানুয়ারি '১১ঈ.

ভুল চিন্তা

তওবা করলে বা করালে কি মওত এসে যায়?

যতই তাজ্জবের বিষয় মনে হোক, দ্বীনের সহজ-সরল বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। কোন কোন এলাকার মানুষের ধারণা, তওবা করলে কিংবা তওবা করানো হলে মওত এসে যায়। তারা মনে করে, তওবা মৃত্যুর আগে করার বিষয়, এর পূর্বে নয়। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা!

এ ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত; বরং তওবা ও ইস্তেগফার মুমিন-জীবনের সার্বক্ষণিক ওযীফা।

হাদীস শরীফে এসেছে–

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে সত্তর থেকে এক শ বার তওবা-ইস্তেগফার করতেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩০৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২

কেয়ামতের আগ পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকবে। তওবা করতে বিলম্ব করা গোনাহ। আল্লাহ্ তাআলা সব সময়ের জন্যই তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। বান্দা যখন চায় তখনই তওবা করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসতে পারে। যখন মৃত্যু উপস্থিত হবে, সে সময়ের তওবা কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি নেই, তাই তওবা করতে বিলম্ব করা বড়ই ক্ষতির বিষয়। কারণ আমাদের কারও জানা নেই, কখন মৃত্যু উপস্থিত হবে। তওবা মৃত্যু নয়; বরং তা হল মুমিন বান্দার জীবন।

তওবা করা মানে হল কৃত গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, কৃত গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা না করার সুদৃঢ় সংকল্প করা। আর গোনাহ যদি বান্দার হক-সংক্রান্ত হয় তাহলে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া।

তওবার ব্যাখ্যা থেকেও বোঝা যায় যে, এটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য সব সময়ের আমল।

www.eelm.weebly.com

ভুল কথা

হাঁচি এল মানে কেউ স্মরণ করছে

কারও হাঁচি এলে বা খাওয়ার সময় গলায় কিছু আটকে গেলে বলা হয় যে, কেউ তাকে স্মরণ করছে।

বাস্তবে এটা একটা ভিত্তিহীন কথা। হাঁচি আসা ও গলায় খাবার আটকে যাওয়ার সঙ্গে কারও স্মরণ করার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা না বলা উচিত।

ঈমানবিধ্বংসী বানোয়াট কিসসা

একজন বিদআতি ওয়ায়েয হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিসসার অবতারণা করেছেন যে– (নাউযুবিল্লাহ!)

'আল্লাহ্ তাআলার নাকি একবার মানুষের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হল। তখন তিনি হযরত মূসা আ.কে আদেশ দিলেন, যাও, মানুষের গোশত নিয়ে এস। হযরত মূসা আ. অনেকের কাছে চাইলেন; কিন্তু কেউ নিজের শরীরের গোশত কেটে দিতে রাজি হল না। আশাহত হয়ে তিনি একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি পাহাড় থেকে ডাক দিল, হে মূসা! এদিকে আস। আমার কাছ থেকে গোশত নিয়ে যাও। এর পর ওই ব্যক্তি নিজের শরীর কেটে গোশতের একটি টুকরো দিয়ে দিলেন। ওই টুকরো নিয়ে হযরত মূসা আ. আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমিও তো একজন মানুষ। তুমি তো দিতে পারনি, যে দিয়েছে সে কে জান? সে আমার আবদুল কাদের জিলানী!'

পুরো কিসসা আগা-গোড়া নির্জলা মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা পানাহার-নিদ্রা ইত্যাদি মানবীয় দুর্বলতা থেকে চিরমুক্ত। ঘটনাটা এমনই বাতিল ও উদ্ভট যে, কোন মুসলমান তা উচ্চারণ করতে পারে না। কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষ এ জাতীয় কিছু বর্ণনা করে দুর্বল বোধ-বুদ্ধির অধিকারী মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করে চলেছে। অথচ এ জাতীয় কথাবার্তা শোনামাত্রই বলা উচিত, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র সত্তা। এটা সুস্পষ্ট অপবাদ।

কে না জানে, আবদুল কাদের জিলানী রহ. মূসা আ.এর কয়েক হাজার বছর পরের মানুষ, আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়

নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হয়

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

নেককার ও বুযুর্গদের আলোচনার সময় অনেককে উপরোক্ত কথাটি হাদীস হিসাবে বলতে শোনা যায়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের সিদ্ধান্ত হল এটি হাদীস নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর কোন সনদ নেই; বরং এটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. (১০৭ হি.-১৯৮ হি.)-এর উক্তি। –হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৩৫, আত্তামহীদ ১৭/৪২৯

এ কারণে মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস আল্লামা ইরাকী রহ. বলেন–

لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَرْفُوْعٌ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

'মারফূ' (সরাসরি নবীজি থেকে বর্ণিত) হাদীস হিসাবে এর কোন ভিত্তি নেই; বরং এটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর উক্তি।' –তাখরীজে ইরাকী–ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/৩২৯, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/৩৫০-৩৫১

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। –আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৬৭, আলফাওয়াইদুল মাজমূআ ২/৬২২

আরও দেখুন, আলমাওযূআতুল কুবরা, মোল্লা আলী কারী ৮৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত, তাহের পাটনী ১৯৩

তবে মূল কথাটি যেহেতু অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত। তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা না করে বুযুর্গদের উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করা উচিত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত না হলে তা হাদীস হিসাবে বলার কোন সুযোগ নেই। # ফেব্রুয়ারি '১১ঈ.

ভুল মাসআলা

দাফনের আগে ঈসালে সওয়াব ও দুআ-ইস্তেগফার নিষেধ

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে মাসআলাটা পড়ে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। কোন এক প্রসঙ্গে সেখানকার এক পার্লামেন্ট সদস্য পার্লামেন্টে এ মাসআলা বয়ান করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির দাফনের আগে তার জন্য ফাতেহাখানি ও ঈসালে সওয়াব করা যায় না।

এ বক্তব্য সঠিক নয়; বরং যাকে আমরা জানাযার নামায বলি, সেটাও মূলত মাইয়েতের জন্য মাগফেরাতেরই দুআ। বলা বাহুল্য, তা মাইয়েতের দাফনের

www.eelm.weebly.com

আগেই করা হয়। জানাযাও দুআয়ে মাগফেরাত হওয়ার কারণেই উলামায়ে কেরাম জানাযার পর পুনরায় হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে বিদআত বলেছেন। আর তা শরীয়ত কর্তৃকও প্রমাণিত নয়। হয়তবা এখান থেকেই কেউ কেউ ওই ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন যে, দাফনের আগে ঈসালে সওয়াব ও দুআয়ে মাগফেরাত করা যায় না।

কিন্তু সঠিক মাসআলা হল শরয়ীভাবে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মৃত্যুর পর হতে মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে–এমন যে কোন আমল দ্বারা সাধারণ শরীয়তসম্মত পন্থায় ঈসালে সওয়াব করা যায়।

এক্ষেত্রে দাফনের আগে-পরের কোন পার্থক্য নেই।

ভুল কথা

হাত চুলকালে টাকা আসে

কারও হাত বা হাতের তালু চুলকালে বলা হয় যে, তার হাতে টাকা বা অর্থ-কড়ি আসছে। বাস্তবে এটা একটা ভিত্তিহীন কথা। হাত বা হাতের তালু চুলকানোর সঙ্গে টাকা-পয়সা আসা-যাওয়ার কোনই সম্পর্ক নেই। অতএব এ ধরনের অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা পরিহার করা উচিত।

ভুল ঘটনা

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের দিন কা'বা শরীফে আযান শুরু

প্রচলিত আছে যে, হযরত ওমর রা. যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সে দিন থেকে কা'বা ঘরে প্রথম আযান শুরু হয়।

রাহাতুল কুলূব জাতীয় কিছু বাজারি অনির্ভরযোগ্য বইয়েও এটাকে আরেকটু চটকদার করে উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

'যতদিন পর্যন্ত হযরত আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব রা. ইসলাম আনেননি ততদিন নামাযের আযান গুহায়-গহ্বরে দেওয়া হত; কিন্তু যেদিন হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রা. ঈমান আনলেন, সেদিন তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে হযরত বেলাল রা.কে বললেন, কা'বা ঘরের মিম্বরে উঠে আযান দাও। হযরত বেলাল রা. তাঁর নির্দেশমত কাজ করলেন।'

বহুল প্রচলিত হলেও এ ঘটনাটা ভুল। কারণ বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র মতে, আযানের আদেশ এসেছিল মদীনায়, নবীজির হিজরতের পর। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৪, ফাতহুল বারী ২/৯৩-৯৪

www.eelm.weebly.com

অথচ হযরত ওমর রা. ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মক্কায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে। অতএব তাঁর ইসলাম গ্রহণের দিন কা'বা শরীফে আযান শুরুর কথা অযৌক্তিক।

তবে এই কথা সত্য, হযরত ওমর রা. ইসলাম কবুলের পর ইসলামের শান-শওকত অনেক বুলন্দ হয়। ইসলামের প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। আমরা আগে কা'বা শরীফে নামায আদায় করতে পারতাম না, যখন ওমর ইসলাম কবুল করলেন, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, ফলে তারা আমাদেরকে বাইতুল্লায় নামায পড়তে দিতে বাধ্য হল। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৮৪, ফাতহুল বারী ৭/৫৯, তবাকাতে ইবনে সাদ ৩/২৭০

হয়ত বাইতুল্লায় প্রকাশ্য নামায আদায়ের রেওয়ায়েতটিকেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে আযান দেওয়ার শব্দে বলা হয়েছে। অথচ সহীহ রেওয়ায়েতে আযানের কোন উল্লেখ নেই।

হাদীস নয়

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'যে ব্যক্তি ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তাআলা তাকে না-জানা বিষয়ের ইল্‌ম দান করেন।'

লোকমুখে এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ; কিন্তু হাদীস বিশারদদের মত হল এটা হাদীস নয়। কারণ নবীজি পর্যন্ত এর নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র নেই। যে সূত্রে এটা বর্ণিত হয়েছে, তাকে জাল সাব্যস্ত করে হাফেয আবু নুআইম রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেন–

ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هٰذَا الْكَلَامَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَوَهَمَ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ هٰذَا الْإِسْنَادَ عَلَيْهِ لِسُهُوْلَتِهِ وَقُرْبِهِ، وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَا يَحْتَمِلُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

–হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/১৫, রিসালাতুল মুসতারশিদীন ১৫৫

এই কারণে অন্য মুহাদ্দিসগণও তাদের মাওযূআত-বিষয়ক কিতাবাদিতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

দেখুন, আলফাওয়াইদুল মাজমূআ ২/৩৬৭, আলআসরারুল মারফূআ ২৩৫, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২০
অতএব উল্লিখিত কথাকে হাদীস হিসাবে উদ্ধৃত করা ঠিক নয়। # মার্চ '১১ঈ.

একটা রসম

ফাতেহায়ে ইয়াযদহম পালন

রবিউস সানির এগার তারিখে অনেককে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম (এগার তারিখের ফাতেহা) বা শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ওফাত দিবস পালন করতে দেখা যায়। এ উপলক্ষে মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয় এবং মাহফিল মজলিসের আয়োজন করা হয়।

এটা একটা কু-রসম। ইসলামী শরীয়তে জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালনের নিয়ম নেই। নবী-রাসূল, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁদের কারোরই জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস পালন করার কথা শরীয়তে নেই। তাদের জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করতে হলে তো বছরের প্রতিদিনই পালন করতে হবে। অথচ নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম তো সকল ওলী-বুযুর্গেরও আদর্শ। আর তাই বুযুর্গানে দ্বীন নিজেদের জন্মদিবস পালন করেননি বা অনুসারীদেরকে জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালনের আদেশ করেননি। পরবর্তী যুগের লোকেরা তা উদ্ভাবন করেছে।

ফাতেহায়ে ইয়াযদহম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে তারিখে 'ফাতেহায়ে ইয়াযদহম' পালন করা হয় অর্থাৎ এগার রবিউস সানি তা ঐতিহাসিকভাবে শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মৃত্যুদিবস হিসাবে প্রমাণিতও নয়। কারণ তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবিশ শায়খ আবদুল কাদির'-এ এ সম্পর্কে কয়েকটি মত উল্লেখ করা হয়েছে– রবিউস সানির নয় তারিখ, দশ তারিখ, সতের তারিখ, আঠার তারিখ, তের তারিখ, সাত তারিখ ও এগার তারিখ।

আবার কারও কারও মতে রবিউল আউয়ালের দশ তারিখ। এই আটটি মত উল্লেখ করার পর গ্রন্থকার দশই রবিউস সানিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। –ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৭৬-৭৭

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা হাফেয যাহাবী রহ. (৭৪৮ হি.)ও বলেছেন–

www.eelm.weebly.com

تُوُفِّيَ فِيْ عَاشِرِ رَبِيْعِ الْآخِرِ سَنَةَ إِحْدٰى وَسِتِّيْنَ، وَلَهُ تِسْعُوْنَ سَنَةً

'তিনি নব্বই বছর বয়সে ৫৬১ হিজরীর রবিউস সানির দশ তারিখে ইন্তেকাল করেন।' –তারীখুল ইসলাম ২৯/৬০

এ ছাড়া ইতিহাস ও আসমাউর রিজালের অন্যান্য কিতাবেও আট, নয় ও দশ তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগার তারিখ নয়।

আর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতবিরোধ না থাকলেও 'মৃত্যুদিবস' পালন করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়; বরং বছরের যেকোন দিন নেককার বুযুর্গদের জীবনী আলোচনা করা যায় এবং তাঁদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা যায়। তা না করে নির্দিষ্ট একটি দিনে জায়েয-নাজায়েয বিভিন্ন রকমের কাজকর্মের মাধ্যমে দিবস উৎযাপন– রসম ও বিদআত ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ধরনের বিদআত ও রসম পালনের মাধ্যমে খোদ শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মতো বুযুর্গ ওলীদের অবমাননাই করা হয়। আর আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টিসহ বিদআতের অন্যান্য শাস্তি তো রয়েছেই।

ভুল পদ্ধতি

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা না বলে রুকুতে চলে যাওয়া

জামাতের নামাযে ইমাম যখন রুকুতে যান, তখন অনেককে দেখা যায়, রাকাত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে একটি তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে চলে যান। এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ যে তাকবীরটি বলতে বলতে মুসল্লি রুকুতে যাচ্ছে, সেটিকে রুকুর তাকবীর বলা যায়। তাহলে তার তাকবীরে তাহরীমা তো আদায় হয়নি। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ফরয।

অতএব ইমামকে রুকুতে পেতে হলে কয়েকটি কাজ করা জরুরি। প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে একবার আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করবে। তার পর হাত না বেঁধে সোজা ছেড়ে দেবে। এর পর আরেকটি তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাবে।

সারকথা এই যে, এখানে তাকবীর দু'টি। প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা, যা নামাযের প্রথম কাজ। এই তাকবীর না বললে নামাযই হবে না। আর দ্বিতীয়টি রুকুর তাকবীর। এই তাকবীর বলা সুন্নত। কেউ যদি রুকুতে ইমামের সঙ্গে শামিল হতে চায় তাহলে তার জন্য নিয়মমাফিক এই দু'টি তাকবীর আদায় করা উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রুকুর তাকবীর তো ছাড়া

www.eelm.weebly.com

যেতে পারে, কিন্তু স্থির দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা অবশ্যই বলতে হবে। এ বিষয়ে অধিক তাড়াহুড়ো বা অবহেলা করলে নামায শুদ্ধ না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

হাদীস নয়

আযানের জবাবে পুরুষ পাবে এক লক্ষ নেকি, মহিলা দুই লক্ষ নেকি

বছরখানেক আগে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ওপরের কথাটা হাদীস কি না? কিন্তু অনেক তালাশের পরও সহীহ হাদীসের কিতাবে তো নয়ই, মওযূ ও জাল রেওয়ায়েতের কিতাবাদিতেও তার সন্ধান পাইনি। অথচ সহীহ হাদীসে আযানের জবাব দেওয়ার অনেক ফযীলত আছে। কোথাও ফযীলতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য ও আলাদা আলাদা সওয়াবের কথা চোখে পড়েনি। অতএব সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধরনের ফযীলত বর্ণনা করা উচিত নয়। # এপ্রিল '১১ঈ.

একটা কু-রসম

শ্বশুর বাড়ি প্রবেশের আগে নববধূর পা ধোয়ানো

কোন কোন এলাকায় প্রথা আছে, শ্বশুর বাড়িতে প্রথম প্রবেশের সময় ঘরের বাইরে নববধূর পা ধোয়ার আয়োজন করা হয় এবং যারা তার পা ধুয়ে দেয় তাদেরকে বখশিশ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, এই আচার পালন ছাড়া নববধূকে ঘরে তোলা অনুচিত।

এটা একটা কু-রসম। ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। পায়ে ময়লা বা ধুলো-বালি লাগলে তা পরিষ্কার করা যায়; কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পা ধোয়ানোর আয়োজন সমর্থনযোগ্য নয়। উপরন্তু এতে রয়েছে নববধূর প্রতি এক ধরনের মানসিক পীড়ন, যা একজন সচেতন নারী সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। আর কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া, সে পুরুষ হোক বা নারী, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। সাধারণ কোন অতিথির সঙ্গেও এমন আচরণ করা হলে নিঃসন্দেহে তিনি অপমানবোধ করবেন। তা হলে বাড়ির বধূ হিসাবে যাকে গ্রহণ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে এই আচরণের কী অর্থ?!

কোন মানুষকে শুধু শুধু অশুচি ও অপবিত্র মনে করার ধারণা হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু ইসলাম মানব ও মানবতাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়েছে। সত্তাগতভাবে কোন মুমিনকে অশুচি ও অপবিত্র মনে করার সুযোগ ইসলামে নেই। অতএব কোন কুসংস্কার বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়ে নববধূর পা

www.eelm.weebly.com

ধোয়ার আয়োজনও ইসলাম সমর্থন করে না। তা ছাড়া শ্বশুর বাড়ির এমন কোন আলাদা মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য নেই যে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে পা ধুয়েই প্রবেশ করতে হবে।

ইসলামের পরিচ্ছন্ন আকীদায় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের উচিত এই জাতীয় কু-রসম পরিত্যাগ করা।

দু'টো ভুল ধারণা

(ক) খাওয়ার পর বরতন ধুয়ে খাওয়া কি সুন্নত?

কেউ কেউ মনে করে যে, খাওয়ার পর বরতন ধোয়া পানি পান করা সুন্নত। এ ধারণা সঠিক নয়। হাদীস ও সুন্নাহর কিতাবে এমন কোন সুন্নতের কথা নেই। সুন্নত হল খাওয়ার পর হাত, হাতের আঙ্গুল চেটে খাওয়া এবং বরতন ভালোভাবে মুছে খাওয়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আঙ্গুল ও বরতন ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়ার আদেশ করেছেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০২২

সুতরাং আঙ্গুল ও প্লেট ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত, ধুয়ে পানি পান করা সুন্নত নয়। তবে সুন্নত ও মুস্তাহাব মনে না করে কেউ যদি প্লেট ধুয়ে পানি পান করে, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই; বরং তা মুবাহ। কিন্তু একে সুন্নত বলা ঠিক নয়।

(খ) খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা কি সুন্নত?

কোন মজলিসে দেখলাম, এক ব্যক্তি খাবারের পর অতি গুরুত্বের সঙ্গে পায়ের তালুতে হাত মুছলেন এবং সঙ্গীকেও সুন্নত বলে এতে উৎসাহিত করলেন।

আসলে এটাও সুন্নত নয়। একে সুন্নত বলা ভুল, বরং চর্বিযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে হাত সাবান বা গরম পানি দ্বারা উত্তমভাবে পরিষ্কার করে রুমাল বা তোয়ালে জাতীয় কিছুতে মুছে নেওয়া উচিত।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে রুমালে হাত না মুছে।' –মুসনাদে আহমদ ১/৩৪৬, হাদীস ৩২৩৪

যাই হোক, খাওয়ার পর পায়ের তালুতে হাত মোছা বা বরতন ধুয়ে পানি পান করা না-জায়েয নয়, তবে একে সুন্নত বলা ভুল। কোন কাজ বৈধ হওয়া আর সুন্নত হওয়া এক কথা নয়। # মে '১১ঈ.

www.eelm.weebly.com

[উল্লিখিত বিষয়টি প্রকাশের পর আলকাউসার শিক্ষার্থীদের পাতায় এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আসে, যার বিস্তারিত উত্তর ছাপা হয়। উক্ত প্রশ্নোত্তরটি নিচে যুক্ত করা সঙ্গত মনে হয়েছে, যাতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়।]

খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : জনাব, আমরা মাসিক আলকাউসারকে অন্যান্য সাধারণ পত্রিকার চেয়ে অন্যরকম মনে করি। আমরা একে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। আলকাউসার-এ কোন কিছু পড়লে অন্যদের কাছে বলতে দ্বিধাবোধ করি না। কিন্তু গত মে (২০১১ঈ.) সংখ্যায় প্রচলিত ভুল বিভাগে 'খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা কি সুন্নত?' শিরোনামে একটি লেখা নযরে পড়ল। তাতে খাওয়ার পর পায়ের নিচে ও মুখমণ্ডলে হাত মোছাকে সুন্নাত বলা ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক ভাই বুখারী শরীফের হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি–

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لاَ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ.

দেখিয়ে বললেন, জামাতে সাহাবার আমলকে কীভাবে সুন্নত বলা যাবে না? আমি অবশ্য বলেছি, সুন্নতের তো নির্ধারিত সংজ্ঞা রয়েছে। কোন হাদীসে কোন কথা থাকলেই বা সাহাবায়ে কেরাম কোন কাজ করলেই তা সুন্নত সাব্যস্ত হয়ে যায় না। তবুও বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য এবং সংশয় দূর করার জন্য আমার কয়েকটি প্রশ্ন :

১. বাস্তবেই কি বিষয়টিকে সুন্নত বলা ভুল। বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই।

২. পত্রিকায় সুন্নত বলা ভুল-এর দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে মুসনাদে আহমাদের হাওয়ালায় হযরত জাবের রা.এর হাদীস, যা মুসলিম শরীফেও রয়েছে। সেখানে হাদীসের লফয হল–

www.eelm.weebly.com

وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আলমিনহাজ-এ লেখেন–

إِنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يَحْضُرُ الْإِنْسَانَ فِيهِ بَرَكَةٌ، وَلَا يَدْرِي أَنَّ تِلْكَ الْبَرَكَةَ فِيمَا أَكَلَهُ أَوْ فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَصَابِعِهِ...

হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে যতটুকু মনে হয় আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে রুমালে হাত মোছা থেকে বারণ করেছেন, যাতে বরকত থেকে মাহরুমির কারণ না হয়। এই হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়টি বের হয় কি?।

'বরং চর্বিযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে হাত সাবান বা গরম পানি দ্বারা উত্তমভাবে পরিষ্কার করে রুমাল বা তোয়ালে জাতীয় কিছুতে মুছে নেওয়া উচিত।' অথচ এ বিষয়েরই দলিল হিসাবে হাদীসকে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

৩. সুন্নত, মুস্তাহাব, সুন্নতে মুআক্কাদা ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা এবং ওয়াজিব সবগুলোর সংজ্ঞা ও পরস্পর পার্থক্য জানালে খুশি হব।

আগামী সংখ্যায় উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

আব্দুল্লাহ, মোমেনশাহী

উত্তর : আপনার চিঠি সময়মত পেয়েছি। জানি না জবাব দিতে এত দেরি হয়ে গেল কেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আপনার ওই ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

খাওয়া শেষ করার পর প্রথম কাজ তো হাতের আঙ্গুল চেটে খাওয়া এবং পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া। খাদ্যের কোন অংশ নষ্ট না করা, খুব পরিষ্কার করে খাওয়া। এটি খাবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এরপর হাত পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। হাত পরিষ্কার করার কয়েকটি সুরত হতে পারে :

এক. একটি সুরত হল, হাত ধুবেও না এবং রুমাল দ্বারাও মুছবে না, বরং সরাসরি চেহারা, হাত ও পায়ে মুছে নেবে।

এই সুরতের কথাই সহীহ বুখারীর ওই হাদীসে এসেছে, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির তরজমা নিম্নরূপ :

'সাঈদ ইবনুল হারীস রহ. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, আগুনে রান্না করা কোন খাবার খাওয়ার পর ওযু করা কি জরুরি? জাবের রা. উত্তরে বললেন– না, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ

www.eelm.weebly.com

ধরনের খাবার তো আমরা কমই পেতাম। যখন পাওয়া যেত (হাত মোছার জন্য) আমাদের কাছে হাতের পাতা, বাহু ও পায়ের পাতা ছাড়া কোন রুমাল থাকত না। (অর্থাৎ রুমালের পরিবর্তে আমরা এগুলোতেই আঙ্গুল মুছে নিতাম।)' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫৭, কিতাবুল আত্‌ইমা, বাবুল মানাদিল

হাদীসের পূর্বাপর শব্দ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, তারা এমনটি করতেন জরুরতের কারণে। এ জন্য নয় যে, তারা রান্না করা খাবার খাওয়ার পর হাত না ধোয়াকে কিংবা রুমালে হাত না মোছাকে উত্তম মনে করতেন অথবা হাতের পাতা, বাহু ও পায়ের পাতায় হাত মোছাকে সুন্নত মনে করতেন। এ জন্য এই হাদীস থেকে আমার জানামতে কোন ফকীহ অথবা আলেম এ রকম কোন হুকুম গ্রহণ করেননি; বরং উলামায়ে কেরাম তো এ কথাই বলেছেন যে, রান্না করা খাবার খাওয়ার পর হাত রুমাল ইত্যাদিতে মুছে নেওয়া উচিত। বরং প্রয়োজনে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

রুমাল ইত্যাদিতে হাত মোছার কথা তো সহীহ বুখারীর আলোচ্যহাদীস থেকেও বুঝা যায়। তাছাড়া এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসও আছে। আল কাউসারের প্রচলিত ভুল বিভাগে মুসনাদে আহমাদের বরাতে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি যেমন আপনিও বলেছেন সহীহ মুসলিমেও আছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৩৩ [১৩৪] কিতাবুল আশরিবা, বাবু ইস্‌তিহ্‌বাবি লা'কিল আসাবি') এ হাদীসটি তো এ অর্থে একেবারেই সুস্পষ্ট।

কাযী ইয়ায ইবনে মূসা রহ. সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদীসের অধীনে লিখেছেন–

وَفِيْهِ جَوَازُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ بِالْمِنْدِيْلِ وَهٰذَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- فِيْمَا لَمْ يَحْتَجْ فِيْهِ لِغَسْلٍ مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ غَمْرٌ وَلُزُوْجَةٌ مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ إِلَّا الْغَسْلُ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ فِي التَّرْغِيْبِ فِيْ غَسْلِهِ أَوِ الْحَذَرِ مِنْ تَرْكِهِ.

অর্থাৎ এই হাদীস থেকে খাওয়ার পর রুমাল দিয়ে হাত মোছা 'মুবাহ'–এ কথা প্রমাণিত হয়। (অর্থাৎ আঙ্গুল চেটে খাওয়ার পর হাত শুধু মুছে নিলেও তা জায়েয হবে।) কিন্তু এটা ওই সময়, যখন ধোয়া ছাড়াই শুধু মুছে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যথায় খাবার যদি এমন হয় যে, খাবারের দাগ, তৈলাক্ত ও আঠালোভাব এবং গন্ধ হাতে-মুখে লেগে থাকে, যা ধোয়া ছাড়া পরিষ্কার হয় না, তবে তো হাত ধুয়ে নেওয়াই উচিত। এ কথাটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে। –ইকমালুল মু'লিম, কাযী ইয়ায ৬/৫০১

www.eelm.weebly.com

এরপর কাযী ইয়ায রহ. নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হাতে চর্বি লেগে থাকা অবস্থায় সেটি না ধুয়ে ঘুমিয়ে গেল, পরে এর কারণে তার কোন ক্ষতি হল, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫২, কিতাবুত তআম, বাবুন ফী গাসলিল ইয়াদ মিনাত তআম, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৫৬৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৫২১

তো বুঝা গেল, সহীহ বুখারীর উল্লিখিত রেওয়ায়েতে জাবের রা. নিজের এবং নিজ সাথীদের যে আমলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি একটি মুবাহ আমল। যা তারা করতেন পানির স্বল্পতার কারণে এবং রুমাল ইত্যাদি সাধারণভাবে সহজলভ্য না হওয়ার কারণে। এ জন্য নয় যে, তারা এটিকে সুন্নত মনে করতেন।

দুই. দ্বিতীয় সুরত এই যে, প্রথমে রুমাল ইত্যাদি দিয়ে হাত মুছে নেবে। তারপর ধুবে। ধোয়ার পর হাত শুকানোর জন্য আবার হাত মুছবে বা মুছবে না। এ সুরতটিও জায়েয। এটি নিষেধ হওয়ার কোন দলিল নেই।

তিন. তৃতীয় সুরত এই যে, প্রথমে পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে। তার পর রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মুছবে।

হাত ধোয়ার কথা তো হাদীসে এসেছে। কিন্তু ধোয়ার পর রুমাল ইত্যাদি দিয়ে হাত মোছার কথা কোন হাদীসে বা আসারে এসেছে কি না, তা আমার খুঁজে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে এটি মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ» ٦ : ٣٦ وَ«الدُّرِّ الْمُنْتَقَى شَرْحِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ» ٤ : ١٨١ مِنَ الْآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

চার. চতুর্থ সুরত এই যে, প্রথমে পানি দিয়ে হাত ধুবে। এরপর হাতে লেগে থাকা আর্দ্রতা দ্বারা চেহারা ও পা মুছবে।

এ সুরতটি আমাদের দেশে কিছু মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে। এটিও মুবাহ আমল। তবে একে সুন্নত মনে করা ভুল। আলকাউসার-এ মূলত এই সুরতের কথা বলাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্ণনার অস্পষ্টতার কারণে মনে হচ্ছে, এতে

www.eelm.weebly.com

প্রথম সুরতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে এটি উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ আমাদের দেশে এ সুরতটি প্রচলিত নয় যে, হাত ধোয়া ছাড়াই চেহারা ও পায়ে মুছে নেবে।

যা হোক, এই চতুর্থ সুরত অর্থাৎ হাত ধোয়ার পর ভেজা হাত চেহারা ও পায়ে মুছে নেওয়া এটিও মুবাহ; সুন্নত নয়। কারণ এটি সুন্নত হওয়ার কোন দলিল নেই।

তবে মেশকাত শরীফের ২য় খণ্ডে হাদীস ৪২৩৩-এ জামে তিরমিযীর হাওয়ালায় একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ আছে। তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সারীদ' খাওয়ার পর পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়েছেন। এরপর হাতের আর্দ্রতা দ্বারা চেহারা, বাহু ও মাথা মুছেছেন। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৬৪, কিতাবুল আতইমা, বাবুত তাসমিয়া আলাত তআম

কিন্তু রেওয়ায়েতটি প্রমাণিত নয়। ইমাম তিরমিযী নিজেই একে غَرِيْبٌ বলেছেন।[১] ইমাম বুখারী বলেছেন– لَا يَثْبُتُ অর্থাৎ হাদীসটি সাবেত নয়। –দ্রষ্টব্য আত্তারীখুল কাবীর ৫/৩৯৪, আয-যুয়াফাউস সগীর ২১৭ নং তরজমা

যদি রেওয়ায়েতটি 'সাবেত' হত, তারপরও এ থেকে শুধু উল্লিখিত আমলের মুবাহ হওয়া এবং খেলাফে সুন্নত না হওয়াই প্রমাণিত হত। এর সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হত না। বিষয়টি ইলমে উসূলুল ফিকহের أَفْعَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অধ্যায়ে আলোচিত উসূল ও কাওয়ায়েদের আলোকে স্পষ্ট।

(وَلَوْ كَانَ كُلُّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً عَلَى مُصْطَلَحِ عِلْمِ الْفِقْهِ، فَانْظُرُوا الْأَحَادِيْثَ الْمَرْوِيَّةَ فِيْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ فَقَطْ، وَتَفَكَّرُوْا كَمْ فِيْهِ مِمَّا لَمْ يُحْكَمْ بِسُنِّيَّتِهِ مَعَ ثُبُوْتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَكَمْ فِيْهِ مِمَّا لَا يُرْتَابُ فِيْ كَوْنِهِ مُسْتَحَبًّا وَلٰكِنَّنَا غَافِلُوْنَ عَنْهُ، مَعَ إِصْرَارِنَا عَلَى سُنِّيَّةِ مَسْحِ الْوَجْهِ بِبَلَلِ الْكَفَّيْنِ،

---

[১] এখানে ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ ইবারত হল–

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفَضْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلَاءُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

উল্লেখ্য, হাদীসের রাবী আলা ইবনুল ফযল এবং তার শায়েখ ওবায়দুল্লাহ উভয়ে যয়ীফ রাবী। মনে রাখতে হবে, ইমাম তিরমিযী যখন কোন হাদীস সম্বন্ধে শুধু 'গরীবুন' বলে মন্তব্য করেন, এর সঙ্গে সহীহ বা হাসান শব্দ যুক্ত না করেন, তখন সাধারণত তাঁর উদ্দেশ্য হয় বর্ণনাটি যয়ীফ বা মালুল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা।

www.eelm.weebly.com

وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا لَا شَكَّ فِيْ عَدَمِ كَوْنِهِ سُنَّةً مَقْصُوْدَةً وَأَدَبًا عَامًّا، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، قَالَهُ الرَّاقِمُ.)

আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনার ইশকাল হল হয়েছে। বাকি যে ইস্তেলাহগুলোর ব্যাপারে আপনি জানতে চেয়েছেন, আপনি নিজেই এগুলো উসূলে ফিকহের বিশদ ও দালিলিক কিতাবসমূহে মুতালাআ করে আসাতেযায়ে কেরামের নিকট থেকে হল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তওফীক দান করুন। আমীন। সুযোগ হলে বান্দার রিসালা 'তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' নতুন সংস্করণে ইত্তেবায়ে সুন্নতের আলোচনা মুতালাআ করে নিতে পারেন। আশা করি ফায়েদা হবে।

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
২৯-০৩-১৪৩৬ হি.
বুধবার, রাত ৩ টা
মাসিক আলকাউসার, মার্চ '১৫ঈ. পৃ. ৪৪-৪৫

তওবার জন্য কি ওযু জরুরি?

একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি কলামে লেখা হয়েছে–

'গ্রামের প্রচলিত বিশ্বাস, তওবা পড়ানো হলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তওবা পড়ানোর জন্য মুন্সী আনা হল। সাফিয়া বিবি বললেন, না গো! আমি তওবার মধ্যে নাই। তওবা করতে হইলে ওযু করা লাগবে। শইল্যে পানিই ছোঁয়াতে পারি না, ওযু ক্যামনে করব।

সাফিয়া বিবির মনে হয়তো ভয় ঢুকে গিয়েছিল, তওবা মানেই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু চান না ...।'

কলামটির উদ্ধৃত অংশে কয়েকটি ধারণার উল্লেখ রয়েছে। এক. তওবা করলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ইতিপূর্বে এ বিভাগে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। ওই লেখায় বলা হয়েছিল যে, তওবা মানে জীবনের অবসান নয়; বরং তওবা মানে গোনাহমুক্ত নতুন জীবন লাভ। দুই. তওবার জন্য ওযু লাগে। এটাও ভুল ধারণা। তিন. তওবা নিজে করার বিষয় নয়; বরং এর জন্য মুন্সী ডাকতে হয়। এই ভুল ধারণাগুলোর মূল কারণ অজ্ঞতা ও জাহালত। তওবা কাকে বলে তা জানা থাকলে এসব ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টি হয় না। এখানে তওবা সম্পর্কে কিছু কথা বলা হল।

www.eelm.weebly.com

তওবা মানে গোনাহ ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং অন্তর থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা হল আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন।

বান্দার যখন গোনাহ হয়ে যায় তখন তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা-ইস্তেগফার করা। অপরাধটি হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকসম্পর্কিত হলে চারটি কাজ করতে হবে, তা হলে তওবা পূর্ণাঙ্গ হবে– ১. গোনাহ ছেড়ে দেওয়া। ২. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ৩. ভবিষ্যতে এ ধরনের গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। ৪. কোন ফরয-ওয়াজিব ছুটে গিয়ে থাকলে মাসআলা অনুযায়ী তার কাযা-কাফফারা আদায় করা।

আর অপরাধটি যদি হয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক-সংক্রান্ত তা হলে আরও একটি কাজ করতে হবে। যার হক্ব নষ্ট করা হয়েছে তার হক্ব আদায় করে কিংবা ক্ষমাগ্রহণ করে দায়মুক্ত হওয়া। এভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য কান্নাকাটি ও অনুতাপের অশ্রু ফেলার নামই তওবা।

আল্লাহ তাআলার দরবারে রোনাযারি ও ক্ষমাপ্রার্থনা নিজের ভাষায়ও করা যায়, তেমনি হাদীস শরীফে তওবা-ইস্তেগফারের যে দুআগুলো আছে সেগুলো পড়েও তওবা-ইস্তেগফার করা যায়।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যে কথাগুলো বোঝা যায়, তা এই–

এক. তওবা করা তারই দায়িত্ব, যে গোনাহ করেছে। নিজের গোনাহের জন্য নিজেকেই অনুতপ্ত হতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে হবে; যদিও আল্লাহ তাআলার কোন নেক বান্দার কাছ থেকে তওবা-ইস্তেগফারের নিয়ম জেনে নিয়ে তার বলে দেওয়া শব্দ উচ্চারণ করেও তওবা করা যায়। কিন্তু তওবার জন্য এটা জরুরি নয়। তাই তওবা নিজে করা যাবে না, কারও মাধ্যমেই করাতে হবে–এই ধারণা ঠিক নয়। অপরদিকে তওবার ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তগুলো পালন না করে শুধু কারও বলে দেওয়া তওবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেই তওবা হয়ে যায় না। তওবা হল মুমিন-জীবনের সার্বক্ষণিক আমল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও দিনে সত্তর থেকে একশ বার ইস্তেগফার করতেন বলে হাদীসে এসেছে।

দুই. আরও বুঝা গেল যে, তওবার জন্য ওযু অপরিহার্য নয়। তবে কেউ যদি সালাতুত তওবা বা তওবার নামায আদায় করতে চায়, তা হলে অন্যান্য নামাযের মতোই তাকে ওযু করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যদি কেউ কোন গোনাহ করে ফেলে, এর পর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নামাযে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে গোনাহ মাফ চায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন। এর পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

(তরজমা) 'এবং তারা সেসব লোক, যারা কখনও কোন মন্দ কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর কে আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে গোনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃত-কর্মের ওপর অবিচল থাকে না।' –সূরা আলে-ইমরান ১৩৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০০৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৯৫

তবে সাধারণ তওবার জন্য ওযু জরুরি নয়। অতএব তওবাকে মৃত্যু মনে করা, ওযু ছাড়া তওবা হয় না কিংবা অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য ইত্যাদি হচ্ছে কিছু ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা। তওবা কী, তা জানা থাকলে এ জাতীয় ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ্।

হাদীস নয়

মেরাজে নবীজির সাতাশ বছর লেগেছিল

মেরাজ সম্পর্কে এক ওয়ায়েযকে বলতে শুনেছি যে, 'তাতে নাকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশ বছর সময় ব্যয় হয়েছিল।' আরেক ওয়ায়েয এ কথাটা বললেন আরও চটকদার করে। তার ভাষায়–

'ইন্তেকালের সময় যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল ও মালাকুল মওত হাজির হল, তখন তিনি মালাকুল মওতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন এলে? আল্লাহ তাআলা তো আমাকে নব্বই বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তখন জিবরীল বললেন, আপনার জীবনের সাতাশ বছর তো মেরাজের রাতেই অতিবাহিত হয়ে গেছে!'

উপরোক্ত বর্ণনার কোন ভিত্তি আমরা পাইনি। মেরাজের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর কোথাও বলা হয়নি যে, মেরাজে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কুরআন মাজীদ এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি একটি রাতে

www.eelm.weebly.com

সংঘটিত হয়েছিল। তাতে পুরো রাত লেগেছিল, নাকি রাতের কিছু অংশ, না চোখের পলকেই ঘটে গিয়েছিল, তা সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসে এও নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগৎকে স্থির রেখেছিলেন কি না।
অতএব মেরাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনার সময় এসব অমূলক কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া খুবই নিন্দনীয় এবং সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কোন দায়িত্বশীল ও আমানতদার ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ্ তাআলার পরিষ্কার আদেশ–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না।'
এরপরও শুধু অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে বলা, বিশেষত মানুষের সামনে বর্ণনা করা বড়ই অন্যায়। উপরন্তু তা যখন হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন তো এর ভয়াবহতা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন। # জুন '১১ঈ.

হাদীস নয়
একটি জনপদের ওপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার করে উড়ে যায়, আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে

বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখকের লেখায় এমন কথা পড়েছি। তিনি লিখেছেন–
'ইফতারির সময় রোযাদারদের কাছে আকাশ আজ অন্যান্য সন্ধ্যার তুলনায় অনেক বেশি লাল বলে মনে হয়, গাঢ় ও গম্ভীর সেই রঙ দেখে কারও কারও মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ, এ রকম তাঁরা শুনেছে, একটি জনপদের ওপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার করে উড়ে যায়, আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে।'
কিন্তু এ ধরনের কোন রেওয়ায়েত আমরা পাইনি যে, কোন জনপদের ওপর পবিত্রতার আলামতস্বরূপ আকাশ শহীদের রক্ত ধারণ করে। বরং এ ধরনের কথার কোন যৌক্তিকতাও নেই।

অতএব যে কোন দায়িত্বশীল লেখকের উচিত, কোন কিছু লেখা বা বলার আগে তার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করে নেওয়া। কারও থেকে শুনে, কোন বাজারি বইয়ে পড়ে কিংবা কোন কিছু কল্পনা করে তাকে রেওয়ায়েতের মতো করে

www.eelm.weebly.com

লিখে দেওয়া কোন দায়িত্বশীল লোকের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন।

ভুল চিন্তা

কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা কি নিষেধ?

অনেকে মনে করে, কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা ঠিক নয়। এতে নাকি আঙ্গুল পচে যায়।

এটা একটা ভিত্তিহীন কথা। জীবিত মানুষের দিকে যদি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যায়, তাহলে কবরের দিকে ইশারা করলে দোষ হবে কেন? শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন বাধা নেই। আর এ কারণে কারও আঙ্গুল পচে গেছে–এমন কোন নজিরও নেই। অতএব এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলা ও বিশ্বাস রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ভুল তথ্য

সুরমা কি তুর-এর তাজাল্লি থেকে সৃষ্টি?

সুরমার বিষয়ে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, হযরত মূসা আ. যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার তাজাল্লিতে পাহাড় ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। সেই ভস্মিভূত পাহাড় থেকেই সুরমার উৎপত্তি ও ব্যবহার।

এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সুরমা একটি খণিজ দ্রব্য। এর সঙ্গে তুর পাহাড়ের কোন সম্পর্ক নেই। মূসা আ.এর আল্লাহ্কে দেখার ইচ্ছা এবং তুর পাহাড়ের মূল ঘটনাটি সত্য। কুরআন মাজীদে এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। (সূরা আরাফ ১৪৩) কিন্তু কোথাও এই ঘটনার সঙ্গে সুরমাকে জড়িয়ে দেওয়ার কথাটার সামান্যতমও উল্লেখ নেই। অতএব এ ধরনের কথা পরিহার করা জরুরি।

ভুল ধারণা

কষ্টের সংবাদ দিয়ে না গেলে কবরে বৃক্ষ জন্মায় না

একজন সাহিত্যিক একটি বইয়ে লিখেছেন, 'আমরা উত্তর বিনা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে চাই না। কী তোমার কষ্ট, তুমি আমাদের বল সাহেবচান্দ, আমরা শুনেছি, মানুষের কষ্টের সংবাদ না দিয়ে যারা কবরে যায় তাদের কবরে কোন বৃক্ষ কোনদিন হয় না।'

www.eelm.weebly.com

উক্ত শোনা কথাটা ভিত্তিহীন। কুরআন হাদীসে এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া এটা স্বাভাবিকও নয়।

মানুষের মনে নানা দুঃখ-কষ্ট থাকে। মৃত্যুর আগে কাউকে না কাউকে এসব দুঃখ-কষ্টের কথা বলতেই হবে তা অপরিহার্য নয়। শরীয়তও এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। বরং এমন সব কথা, যা অন্যের মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে কিংবা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে তা না বলাই ভালো। অতএব কারও মনে এ ধরনের অলীক কথা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস থাকলে তা পরিহার করা চাই। # সেপ্টেম্বর '১১ঈ.

ভুল ধারণা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় কি দর্জি ছিল না?

কয়েকদিন আগে এক ভাই ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তো জানতাম, সাহাবীগণ কাপড় কোন রকম শরীরে বেঁধেই পোশাকের কাজ সারতেন। হঠাৎ ওই দিন একজন বললেন–

'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাকি একটি জুব্বা ছিল। আমার কাছে বড় আশ্চর্য মনে হল যে, সে যমানায় আবার দর্জি কোথায় ছিল? জুব্বাই বা কীভাবে তৈরি হবে!'

তাকে উত্তরে বলা হল, এ ধারণা ঠিক নয়। দর্জি পেশা অনেক আগ থেকেই আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও ছিল। এটি একটি বাস্তব ইতিহাস। তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসেও বিষয়টি উদ্ধৃত আছে। বুখারী শরীফ, বুয়ূ' অধ্যায়ে হাদীস ২০৯২-এ সে যুগের এক দর্জির আলোচনা রয়েছে।

ভুল তথ্য

মুনাজাতে মকবুল-এ যা কিছু ছাপা হচ্ছে সবই কি থানভী রহ.-এর সংকলন?

মুনাজাতে মকবুল হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর একটি সুন্দর সংকলন। এতে হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন জামে তথা ব্যাপক অর্থবহ দুআসমূহ একত্র করা হয়েছে। এতে হযরতের মূল অবলম্বন ছিল ইমাম ইবনুল জাযারী রহ.এর 'আলহিসনুল হাসীন' এবং মোল্লা আলী কারী রহ.-এর 'আলহিযবুল আ'যম'।

www.eelm.weebly.com

সংকলনটি ব্যাপকভাবে মকবুল হওয়ায় অনেক প্রকাশক তা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, কোন কোন প্রকাশক এতে এমন অনেক ওযীফা যোগ করে দিয়েছেন, যা হাদীসে বর্ণিত নয়। এমনকি অর্থ ও মর্মের দিক থেকেও আপত্তিকর।

অনেকের ধারণা– মুনাজাতে মকবুলের সঙ্গে যত কিছুই ছাপা হয়ে থাকে, সব কিছুই থানভী রহ.-এর সংকলন বা তার পক্ষ থেকে অনুমোদিত।

মনে রাখবেন, বিষয়টা এমন নয়। মুনাজাতে মকবুল সমষ্টিতে শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হযরতের সংকলন বা তাঁর পক্ষ থেকে অনুমোদিত :

১. সাত মনযিলের আরবী মুনাজাতে মকবুল।
২. উর্দু কাব্যে সাত মনযিলে তার অনুবাদ।
৩. মসনবি থেকে নির্বাচিত ফার্সি কাব্যের দুআসমূহের সাত মনযিল।
৪. হিযবুল বাহর।

তবে হিযবুল বাহর-এর শুরুতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা মা'সূর বা বর্ণিত নয় এবং এর আমলের সীমারেখাও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

এ চারটি বিষয় ছাড়া অন্য যা কিছু বিভিন্ন প্রকাশনায় এ সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তা থানভী রহ.-এর সংকলন নয়। ওগুলোর যথার্থতা আলেমদের কাছে জেনে নেওয়া জরুরি।

ভুল ধারণা
যফর আহমদ উসমানী রহ. কি শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর ভাই?

প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিইনি। পরে বেশ কিছু মানুষকেই এ রকম বলতে শুনেছি, হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. (১৩১০ হি.-১৩৯৪ হি.) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. (১৩০৫ হি.-১৩৬৯ হি.)-এর সহোদর ভাই। কথাটা ঠিক নয়।

প্রথমজন হলেন হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর ভাগ্নে। যাঁর আব্বা মাওলানা লতীফ আহমদ। তাঁর বাড়ি থানাভবন। আর দ্বিতীয়জনের আব্বা হলেন মাওলানা ফযলুর রহমান। তাঁর বাড়ি দেওবন্দ। থানভী রহ.-এর সঙ্গে তাঁর এ জাতীয় কোন সম্পর্ক ছিল না।

www.eelm.weebly.com

হাদীস নয়
লেনদেন কর অপরিচিতের মতো আর তোমাদের পারস্পরিক আচরণ যেন হয় ভাইয়ের মতো

تَعَامَلُوْا كَالأَجَانِبِ، وَتَعَاشَرُوْا كَالإِخْوَانِ

বিভিন্ন হাদীসের শিক্ষার আলোকে কথাটি কোন বিজ্ঞজন বলেছেন। কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেনদেনের ক্ষেত্রে তার সাধারণ নিয়ম-কানুন যথাযথ পালন করা উচিত। নতুবা বিভিন্ন সময় পেরেশানিতে পড়তে হয়। আর লেনদেনের সকল বিধি-বিধান ও পারস্পরিক হকগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া তো মাসআলার দিক থেকেই জরুরি। বন্ধুত্ব বা অন্য কোন সম্পর্কের কারণে এতে শিথিলতা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

তবে যাই হোক, উপরোক্ত উক্তিটি হাদীস নয়। প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসগ্রন্থে এটি পাওয়া যায়নি। এটি হয়ত কোন মনীষীর বাণী, যা পরবর্তী সময়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আরবী প্রবাদ বাক্যসমূহের একাধিক সংকলনে তা উল্লেখ আছে। যেমন– মাজমাউল আমসাল, মায়দানী ৭৭০ # অক্টোবর '১১ঈ.

ভুল মাসআলা
আত্তাহিয়্যাতুর শুরুতে কি আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?

কিছুদিন আগে এক দ্বীনি ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আমি তো মনে করতাম যে, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদির শুরুতেও আউযুবিল্লাহ্-বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব!! তার মতো অন্য কেউ হয়ত এই ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকবেন, তাই এ বিষয়ে লিখছি।

মনে রাখা উচিত যে, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ বা দুআর শুরুতে চাই তা নামাযের ভেতর হোক বা বাইরে, আউযুবিল্লাহ্ অথবা বিসমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে আউযুবিল্লাহ্ বা বিসমিল্লাহ্ পড়তেই হয় না। এ দু'টো জিনিস তো তাকবীরে তাহরীমার পর সানা শেষ করে পড়তে হয় এবং নামাযের বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে পড়তে হয়।

ভুল মাসআলা
প্রত্যেক মুসল্লির কি সানার পর আউযুবিল্লাহ্-বিস্‌মিল্লাহ পড়তে হয়?

অনেককে দেখা যায়, তারা প্রত্যেক মুসল্লির জন্য সানার পর আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ পড়াকে সুন্নত মনে করেন।

www.eelm.weebly.com

অথচ এই ধারণা ঠিক নয়। আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ শুধু ওই সব মুসল্লির জন্য সুন্নত, যারা সূরা ফাতেহা পাঠ করেন। যেমন- ইমাম ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী)। ইমামের পেছনে ইকতেদা করার কারণে যেহেতু মুক্তাদিকে সূরা ফাতেহা পড়তে হয় না, তাই সে আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ও পড়বে না।

একটা ভিত্তিহীন ঘটনা

হে নূহ! কিশতি ভেঙে ফেল

জনৈক কাহিনীকার ওয়ায়েযকে বলতে শুনেছি-

'নূহ আ. তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে কিশতি থেকে অবতরণ করার কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করলেন, হে নূহ! এখন তো এই কিশতির প্রয়োজন নেই। তাই এটি ভেঙে ফেল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এটিকে তো আমি নিজ হাতে বানিয়েছি। এখন কীভাবে ভেঙে ফেলব। আমার তো কষ্ট হবে। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, তোমার বদ-দুআর কারণে তো আমি আমার সৃষ্টিকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি। তা হলে ভেবে দেখ, আমার কতটা কষ্ট হয়েছে? তারা তো আমারই হাতে গড়া সৃষ্টি ছিল!'

অসার ও ভিত্তিহীন এই ঘটনা শুনিয়ে সে লোকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, আল্লাহ তাআলার কোন সৃষ্টি কাফের-মুশরিক হলেও আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালোবাসেন, তার প্রতি দয়া করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, এ ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর সহীহ কোন সূত্র কিংবা নির্ভরযোগ্য কোন উদ্ধৃতিও নেই। এটা সম্পূর্ণ মনগড়া একটা ইসরাইলি বর্ণনা।

সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ হয়েই তো আল্লাহ্ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এমনকি শেষ নবী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই ধারার সমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত নবী বানিয়েছেন। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আসমানি কিতাব আলকুরআনুল কারীম এবং এর কার্যত ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা হাদীস ও সুন্নাহ এবং তাঁকে প্রদত্ত শেষ শরীয়ত সবকিছুর হেফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার এ সকল দূতের উপহাস করে, তাদের দাওয়াত কবুল করে না এবং কুফরিতে

www.eelm.weebly.com

লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তার কোন ভালোবাসা থাকে না; বরং সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ক্রোধের পাত্র। কুরআন সাক্ষী যে, কাফেরদেরকে নূহ আ.-এর বদদুআ করা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ীই ছিল। বিষয়টি এমনও নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করতে চাননি, শুধু নূহ আ.-এর খাতিরে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

আবার এমনও নয় যে, নূহ আ. ওই কাফেরদের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে বদদুআ করেছিলেন। তিনি তো সাড়ে নয়শ বছর তাদেরকে দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা সম্ভাব্য সকল পন্থায় দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। কিন্তু হঠকারিতার কোন প্রতিষেধক তো কারও কাছেই নেই! নূহ আ. সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ কেউ মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, তাদের বিরুদ্ধে নূহ আ.-এর বদদুআ আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছানুরূপই ছিল। আর সেসব কাফেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তাদের হঠকারিতা, অহংকার, আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে উপহাসের কারণে ধ্বংস করেছেন।

وَقَدْ أَشَارَ الذَّهَبِيُّ إِلَى قِصَّةِ كَسْرِ السَّفِينَةِ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالِ، وَأَنَّهَا مُنْكَرَةٌ بَاطِلَةٌ، وَلْيُرَاجِعِ الطُّلَّابُ كِتَابَ «إِرْشَادِ الْقَارِيِّ إِلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» لِلْمُفْتِي رَشِيدِ أَحْمَدَ. ص ٤٢٢-٤٢٣.

নাম সঠিকভাবে বলা ও লেখা

কারও নাম হুবহু বলা ও লেখা উচিত। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। নাম সংক্ষিপ্ত করতে হলে তার জন্যও স্বতন্ত্র নীতি ও আদব রয়েছে, সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী আমল করা উচিত।

আজকাল অনেককে বলতে শোনা যায় যে, তারা আহসানুল ফাতাওয়ার মুসান্নিফকে মুফতী আবদুর রশীদ বলেন। অথচ তাঁর নাম রশীদ আহমদ। আবার কেউ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর নামের সঙ্গে মুফতী শব্দ যোগ করে সুপরিচিত এই ফকীহকে অপরিচিত বানিয়ে দেয়। তারা জানে না যে, হযরতের নামের সঙ্গে মুফতী শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কেননা, তিনি মুফতী নন, উস্তাযুল মুফতীন ওয়াল-ফুকাহা (মুফতী ও ফকীহগণের উস্তাদ) ছিলেন।

তেমনিভাবে অনেককে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নাম মাহমুদুল হাসান লিখতে দেখা যায়। অথচ তাঁর নাম মাহমুদ হাসান, আলিফ-লাম ছাড়া।

www.eelm.weebly.com

এ দিকে কিছু লোককে দেখলাম, তারা আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) ও আহসানুল ফাতাওয়ার গ্রন্থকার মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ. (১৩৪১ হি.-১৪২২ হি.) দুজনকে একই ব্যক্তি মনে করেন। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। # নভেম্বর '১১ঈ.

ভুল মাসআলা

কুরবানীর শরিক সংখ্যা কি বেজোড় হওয়া জরুরি?

কিছু লোককে বলতে শোনা গেছে, যে পশুতে সাতজন শরিক হতে পারে তাতে শরিকের সংখ্যা বেজোড় হওয়া জরুরি। সুতরাং একটি গরুতে এক, তিন, পাঁচ বা সাতজন শরিক হতে পারবে। দুই, চার বা ছয়জন শরিক হতে পারবে না।

এটা বিলকুল গলত কথা। একটি গরু যেমন এক ব্যক্তি একা কুরবানী করতে পারে, তেমনি দুই থেকে সাত পর্যন্ত যে কোন সংখ্যক শরিক একত্র হয়েও কুরবানী করতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। তেমনি শরিকের সংখ্যা জোড় না হয়ে বেজোড় হওয়ার মাঝেও এমন আলাদা কোন ফযীলত নেই, যার কারণে চার শরিকের স্থলে পাঁচ শরিক বা ছয় শরিকের স্থলে সাত শরিক একত্র হয়ে কুরবানী করতে উৎসাহ দেওয়া যায়।

একটা অবাস্তব দাবি

বাস্তবেই কি তাঁরা শিয়াদের ইমাম?

যেসব ফেরকা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে তাদের মধ্যে শিয়া অতি প্রাচীন ফেরকা। খোদ শিয়ারাও অনেক দল-উপদলে বিভক্ত। বর্তমানে ইসনা আশারিয়া শিয়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাদের জনসংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। এদেরকে ইমামিয়া শিয়াও বলা হয়।

তাদের একটা গলত আকীদা হচ্ছে আকীদায়ে ইমামত। তাদের মতে, হযরত আলী রা. থেকে হযরত হাসান আসকারী রহ. ও তাঁর পুত্র পর্যন্ত মোট বারজন সম্পর্কে তাদের দাবি এই যে, এঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত ইমাম। তাঁরা শুধু নবীগণের মতো মাসূমই নন; বরং এমন মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী, যে পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন ফেরেশতা এবং কোন নবী-রাসূলও পৌঁছাতে পারেন না ...!

www.eelm.weebly.com

এ কথা খোদ রুহুল্লাহ খোমেনির কিতাব 'আলহুকুমাতুল ইসলামিয়া'-তেই আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সরাসরি কুফরি আকীদা। কোন মুসলমান এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে না।

আমি এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হল, হাসান আসকারী রহ.-এর পুত্রের অন্তর্ধানের যে ঘটনা, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট একটা কাহিনী।

আর আলী রা. থেকে হাসান আসকারী রহ. পর্যন্ত এগারজন সম্পর্কে শিয়াদের প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে অনেকেই তাঁদেরকে সত্যি সত্যি শিয়াদের ইমাম ও নেতা মনে করেন। এটা ঠিক এ রকম, যেমন অনেক লোক ঈসা আ.কে বর্তমান খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের আদর্শ মনে করে।

অথচ বাস্তবতা হল, না খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা আ.-এর আদর্শ গ্রহণ করেছে, না শিয়ারা উপরোক্ত ইমামদের আদর্শের অনুসরণ করেছে; বরং তারা তো নিজেদের আবিষ্কৃত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আচারের অনুসারী। শুধু মানুষকে প্রতারিত করার জন্য ওই সব ইমামগণের নাম তারা ব্যবহার করে থাকে। তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষার সঙ্গে শিয়াদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা তো শিয়াদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড এবং তাঁদের রসম-রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। নিচে ওই এগারজন মহান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল :

১. আলী ইবনে আবি তালেব রা. (হিজরতপূর্ব ২৩-৪০ হিজরী)
২. হাসান ইবনে আলী রা. (৩-৪৯ হি.)
৩. হুসাইন ইবনে আলী রা. (৪ হি.-৬১ হি.)
৪. যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন রহ. (৩৮-৯৪ হি.)
৫. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলবাকের রহ. (৫৬-১১৪ হি.)
৬. জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আসসাদেক রহ. (৮০-১৪৮ হি.)
৭. মূসা ইবনে জাফর আলকাযেম রহ. (১২৮-১৮৩ হি.)
৮. হযরত আলী ইবনে মূসা আররেজা রহ. (১৪৮-২০৩ হি.)
৯. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলজাওয়াদ রহ. (১৯৫-২২০ হি.)
১০. আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলহাদী রহ. (২১৪-২৫৪ হি.)
১১. হাসান ইবনে আলী আলআসকারী রহ. (২৩২-২৬০ হি.)

এঁদের মধ্যে প্রথমজন তো খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম ছিলেন।

www.eelm.weebly.com

পরের দুজনও সাহাবী এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের দৌহিত্র ছিলেন। কোন সাহাবী কখনও কোন বাতিল ফেরকার ইমাম হতে পারেন না।

কোন বাতিল ফেরকা যদি তাঁদের কারও অনুসারী হওয়ার দাবি করে তাহলে সেটা হবে নির্জলা মিথ্যা।

হযরত যাইনুল আবেদীন, বাকের ও জাফর সাদেক–এই তিনজন তাবেয়ী ছিলেন। মূসা কাযেম তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। বাকি পাঁচজন তাবে-তাবেয়ীগণের শাগরেদের তবকার ছিলেন।

এঁরা সবাই ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আদর্শের অনুসারী। শিয়াদের আবিষ্কৃত বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কও তাঁদের ছিল না।

এ ছাড়া তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিয়াদের বাতিল মতবাদ ও কর্মকাণ্ড থেকে সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের এ-বিষয়ক কিছু বক্তব্য খোদ শিয়াদের কিতাবেও রয়েছে।

সুতরাং ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, না শিয়ারা ওই সব ব্যক্তিবর্গের অনুসারী, না তাঁরা (আল্লাহ্ মাফ করুন) শিয়াদের মিথ্যা ও বাতিল আকীদাকে সহীহ মনে করতেন। সুতরাং ওই সব বিষয় তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হক বোঝার ও হককে গ্রহণ করার তওফীক দান করুন, আমীন। # ডিসেম্বর '১১ঈ.

সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com